বাংলা আবৃত্তি সমীক্ষা

তত্ত্ব — তথ্য — প্রয়োগ

বাংলা একাডেমী ॥ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

ডিসেম্বর, ১৯৭১

প্রকাশক ঃ

ফজলে রাব্বি

পরিচালক

প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ

বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রণে ঃ

বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা

উৎসর্গ :

বাংলা আবৃত্তিকে
স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পরূপে
প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সংশ্লিষ্ট
সকলের উদ্দেশে

॥ বিষয়সূচী ॥

॥ চিত্রসূচী ॥

বাংলা আবৃত্তির পঞ্চ দিক্‌পাল



মধুসূদন দত্ত



শিশিরকুমার ভাদুড়ী



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



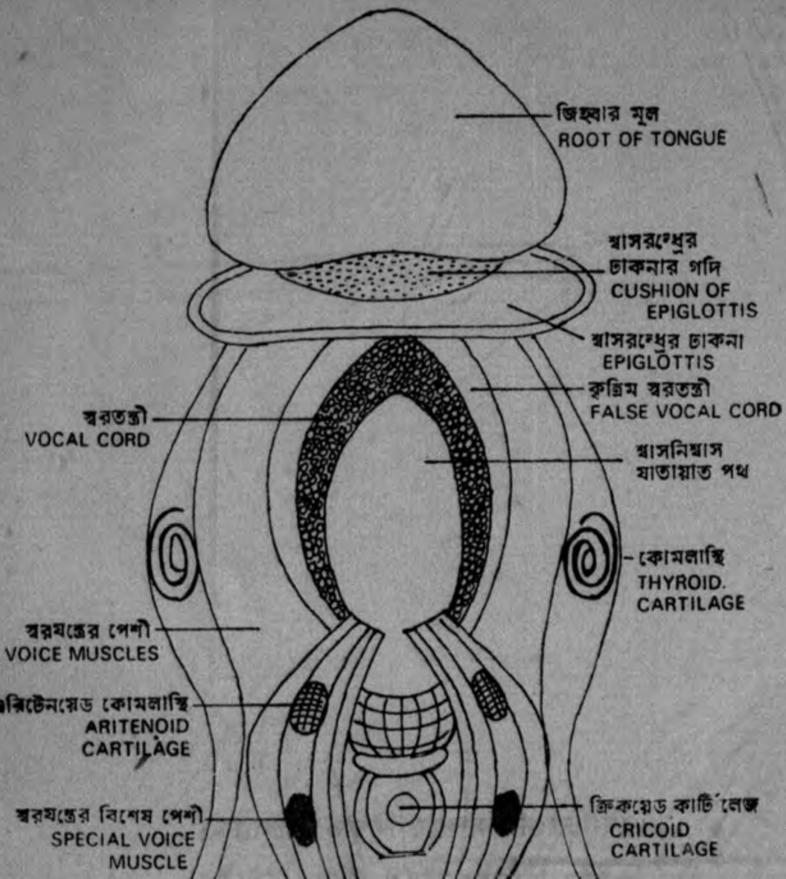
গিরিশচন্দ্র ঘোষ



শম্ভু মিত্র

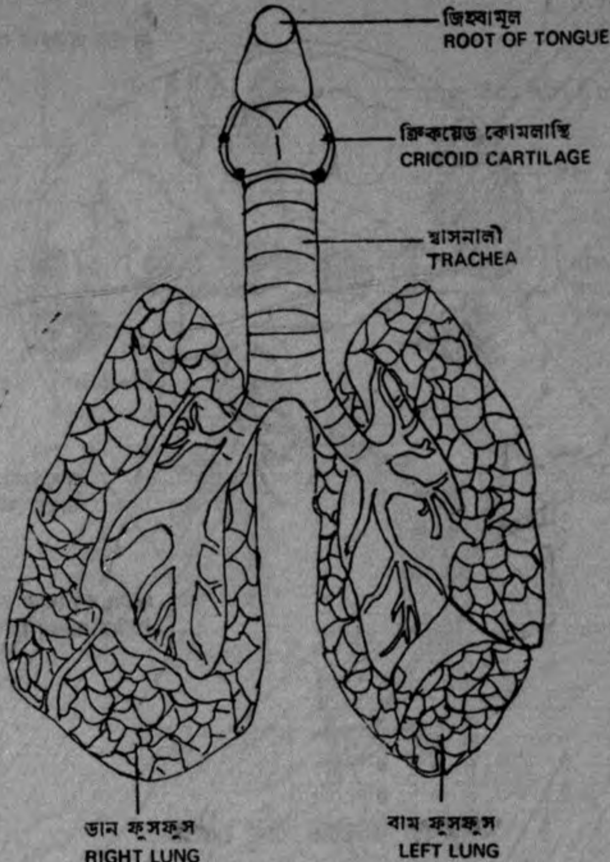
রেখাচিত্রগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা
গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে।

চিত্র—১



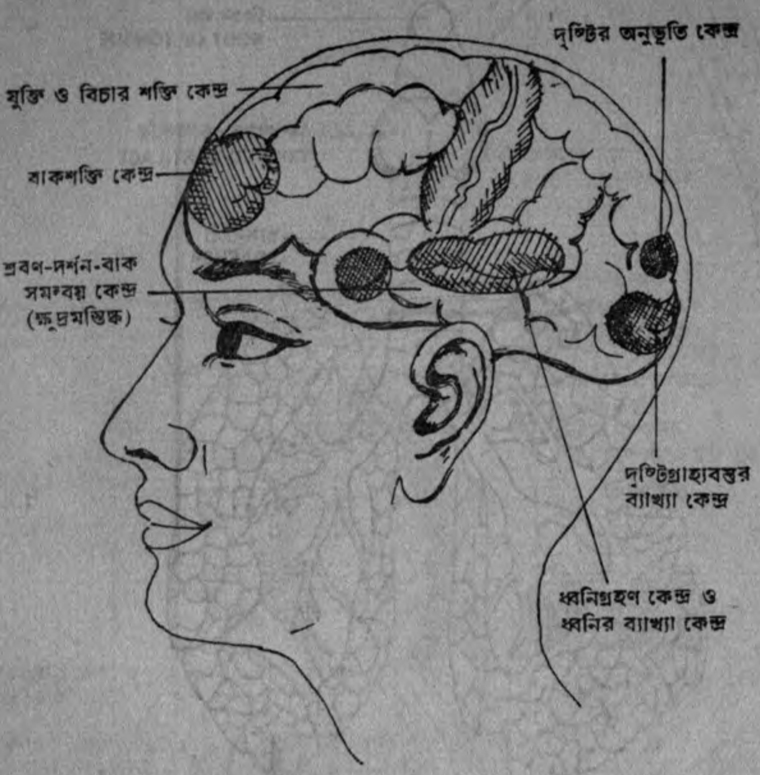
মানুষের বাকযন্ত্র

চিত্র—২



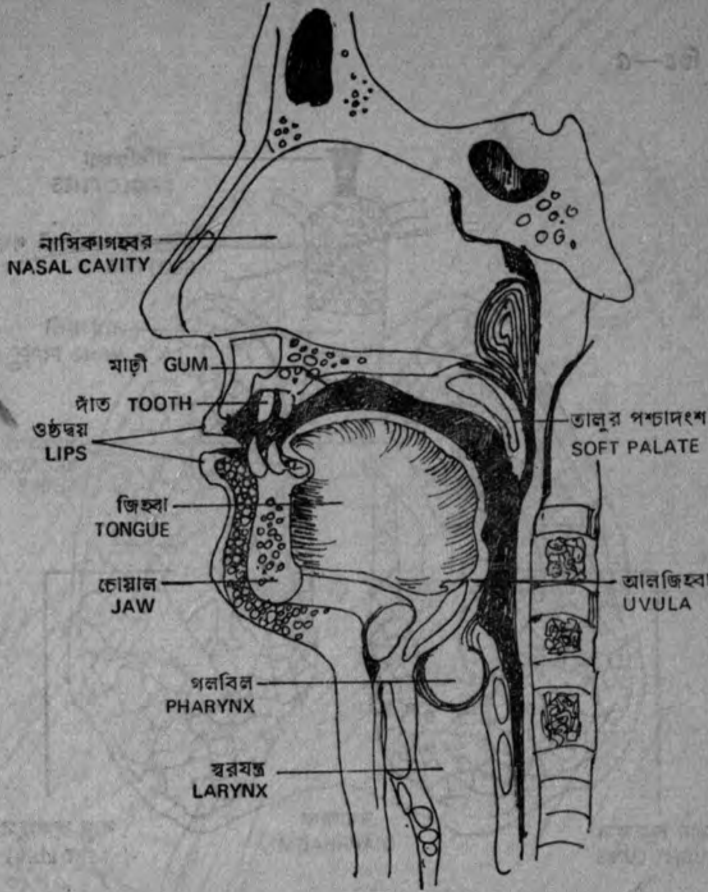
মানুষের শ্বাসযন্ত্র

চিত্র—৩



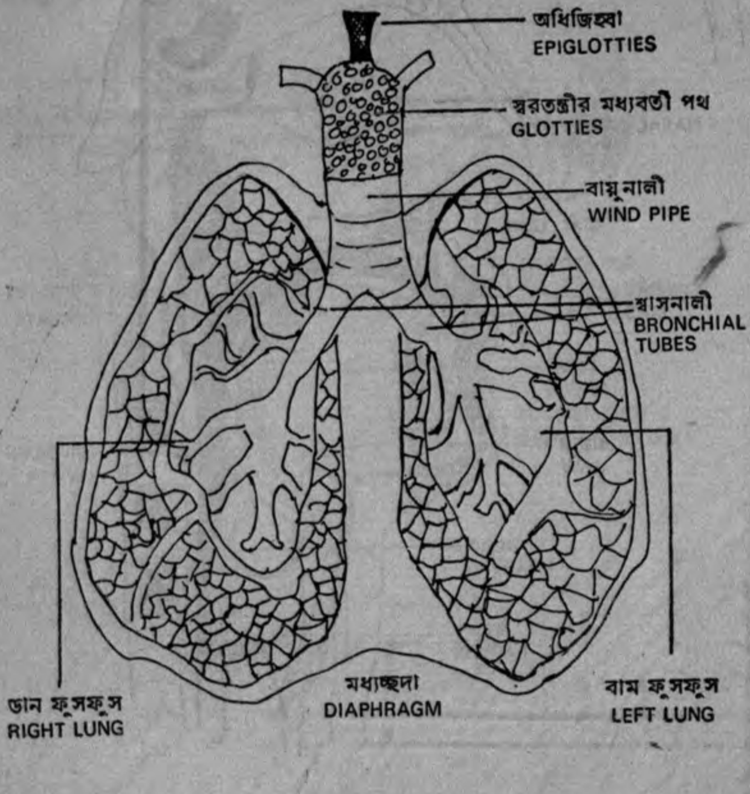
মানুষের মস্তিষ্কে স্নায়ু কেন্দ্র

চিত্র—৪



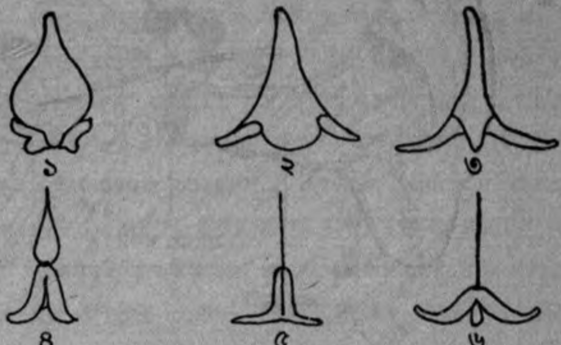
মানুষের মুখমণ্ডলে বাকযন্ত্রের অংশ

চিত্র—৫


অধিজিহ্বা
EPIGLOTTIES
স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথ
GLOTTIES
বায়ুনালী
WIND PIPE
শ্বাসনালী
BRONCHIAL TUBES
ডান ফুসফুস
RIGHT LUNG
মধ্যচ্ছদা
DIAPHRAGM
বাম ফুসফুস
LEFT LUNG

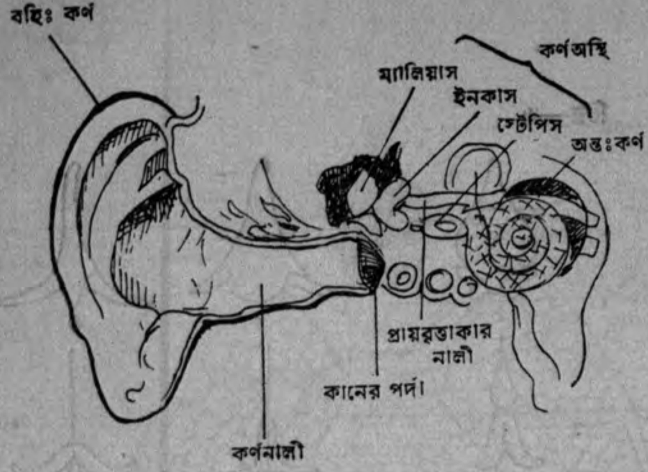
বাকপতাঙ্গ

চিত্র—৬



বাকধ্বনির মধ্যবর্তী পথের বিভিন্ন ধরণ

চিত্র—৭



বহিঃকর্ণঃ বায়ুমাধ্যমের শব্দ → কানের পাতা → কর্ণকুহর ↓

মধ্যকর্ণঃ ম্যালিয়াস → ইনকাস → স্টেপিস ↓

ডিম্বাকার পর্দা ↓

অন্তঃকর্ণঃ ককলিয়া ← এণ্ডোলিম্ফ ← পেরিলিম্ফ

↳ মেনসরি নার্ভ → অডিটরি নার্ভ ↓

শ্রবণ এলাকা (মস্তিষ্ক)

মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়

প্রথম ভাগ

পূর্বকথন (ক) সভ্যতার আদিযুগ থেকে বিভিন্ন দেশে ও কালে আবৃত্তির রূপরেখা ও গঠনবৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

সভ্যতার আদিযুগে কৌমচেতনায় সমাজবদ্ধ মানুষের সংস্কৃতিচর্চা ছিল সর্বজন-শ্রাব্য, সর্বজনবেদ্য, সর্বজনভোগ্য—অর্থাৎ প্রকৃত অর্থেই সর্বজনীন। সমষ্টি-দায়বদ্ধ মানুষ যা কিছু আহার্য এবং বাসযোগ্য, কর্ষণযোগ্য, আকর্ষণযোগ্য অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে বস্তু বা বিষয় আবিষ্কার করেছে তা এককভাবে কখনই চিন্তনীয় বা গ্রহণীয় হয়নি। প্রতীক প্রথা (টোটেম) নিষেধ-প্রথা (ট্যাবু), অলীককল্পনামণ্ডিত আচারানুষ্ঠান, মিমেশিস বা সচেতন অনুকরণ, অনুষঙ্গিচিন্তাজাল (কম্প্লেক্স্), ইন্দ্রজাল, পৌরাণিক শিল্পকলা, প্রিমিটিভ্, কেভ্-আর্ট, রক্-আর্ট, নৃত্যসঙ্গীত ইত্যাদি সাঙ্কেতিক-চিত্রময়-বাঙ্ময়-স্বরময় বর্ণনা কিম্বা প্রকাশবাণী সব কিছুই সামষ্টিকচেতনার অভিপ্রকাশরূপে গ্রাহ্য হয়েছে, মর্যাদামণ্ডিত হয়েছে। কারণ, মানুষের চেতনা তার সামাজিক অবস্থানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে যুগে যুগে দেশে দেশে। এ বিষয়ে ইতিহাসে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। সাম্যবাদী কৌমচেতনার সামাজিক বিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিজীবনায়ন যখন ব্যক্তি-জীবনায়নে রূপান্তরিত হয়েছে তখনও কিন্তু শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রকাশক কোনো এককজন নয়, পরন্তু সমবেতজন। হয়তো কোনো একক স্রষ্টা ছিলেন কিন্তু তিনি নামহীন থেকে বহুজনমধ্যে সঞ্চারিত হয়ে নামময়—বাঙ্ময় হয়ে উঠেছেন। বিবর্তনের অনিবার্যতায় আদিগোষ্ঠিজীবনের কোনো এক ধ্বনি প্রথমে হয়েছে মুদ্রাময় ইঙ্গিত এবং তারো অনেক পরে লিপি-ধর্মী বাক্-সমষ্টি। এই বিচরণ ও সম্প্রচারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উদ্ভিদজগতে যেমন মাটিকে মায়ের মতো আশ্রয় করে নীরবে এবং নিঃশব্দে সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি প্রাণিজগতেও জগৎ ও জীবনের সব কিছু আকর্ষণ-বিকর্ষণ করেও সমাজবদ্ধ মানুষ তার মাতৃসমা পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করেছে চৈতন্যের গহনলোক —যে চৈতন্যের চিন্ময়রূপই ক্রমে ক্রমে বাঙ্ময়-সঙ্গীতময়-আনন্দবেদনাময়রূপে রূপায়িত ও প্রকাশিত হয়ে মানুষের মৌলিক চিন্ময়সত্তাকেই সৃষ্টিশীল করে তুলেছে—যা ক্রমশ সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতরতার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধতম হয়ে ওঠায় তন্নিষ্ঠ।

আমরা জানি, পৃথিবীর সব ভাষাতেই অনুকরণমূলক যুক্তশব্দ বা অনুকারশব্দ আছে। যেমন ডিঙ্-ডঙ, বো-ও, টিক্-টাক্, জিগ্-জাগ্, পিটার-প্যাটার। এই অনুকার-শব্দগুলি মানবিক এবং ভাষার বিষয়বস্তুর অন্যতম প্রধান উৎস। এগুলি পুনঃপ্রতিরূপ

করা অর্থাৎ শব্দগুলি সাধারণত এক অক্ষরের একটিমাত্র উপাদান দ্বারা গঠিত, স্বরধ্বনির হেরফের করে পুনর্বার বলা। "আদিম, পাহাড়ে-প্রান্তরে পশুপালকের সম্ভাষণের 'ও-ও-হো-ই-ই' ডাক যা পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভিন্-পাহাড়ের কোনো একটি মনকে হয়ত দোলা দিয়ে যেত, চমকে উঠে কান-খাড়া করে দিয়ে তাকাত হরিণের পাল, সেই ডাক সভ্য ও সংক্ষিপ্ত হয়ে দেখা দিল এই-ওই বা ঐ ডাকে। প্রথম বিস্ময়ের বা আনন্দের আ-কার বক্রবিষম পাথরের এবড়ো-খেবড়ো চাঁই থেকে সুষমরূপ নিল ভদ্র-রুচির ভাস্কর্যের ঘায়ে। সেই প্রথম সম্ভাষণের উচ্চারণ থেকে সম্ভাষণ-আপ্যায়নের মসৃণ রূপায়ণ পর্যন্ত এই পথ প্রসারিত। বড় মনোজ্ঞ এই বিচিত্র পথ।" অর্থাৎ সভ্য-মানুষের প্রথম আবিষ্কার, জানা-অজানা, শ্রুত-অশ্রুত সুর এবং ক্রমিক বর্ণ, শব্দ, বাক্য, অলঙ্করণ, চিত্রব্যঞ্জনার পরম্পরাগত আবিষ্কার ঘটেই চলেছে।

সুতরাং, মানুষের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিবর্তনের জটিল পথের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যান পরিহার করে আমরা যদি তথ্যগত প্রামাণ্য নিদর্শনগুলির কয়েকটি উদাহরণ অনুধাবন করি তাহলে বোধহয় আলোচ্য বিষয়ের আদিরূপরেখাগুলিকে বোধ্যরূপে নিবেদন করা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সম্ভব হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনই সর্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দ-তরঙ্গিত প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল। আর আকস্মিক শোক থেকেই রামায়ণের আদিশ্লোকের উৎপত্তিকথা তো সর্বজনবিদিত। আড়াই হাজার থেকে পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন গ্রীক নাটকের যে কয়েকটির অস্তিত্ব ও পরিচয় বর্তমানে অবহিত হওয়া সম্ভব সেগুলির মধ্যে ছন্দোবদ্ধ 'কোরাস' সংলাপ-গুলি সমবেত আবৃত্তিরই প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে উল্লেখ্য। হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে শেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটক যা দাঁড়ায় কোরাস বাদ দিয়ে যে কোনো প্রাচীন গ্রীক নাটকের দশা তার চেয়ে করুণ ও অবাস্তব হবে। গ্রীক নাটকের লিখিতরূপ অনেক পরের ব্যাপার—মুখে মুখে গুরুশিষ্যপরম্পরায় ইস্কাইলাস-সোফোক্লেস-ইউরিপিডিস্, এ্যারিস্টোফেনিসের যে সমস্ত নাটকের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলির প্রযোজনায় প্রযোজককে সবচেয়ে বেশী চিন্তিত করে কোরাস-চরিত্রগুলির রূপায়ণ। ইস্কাইলাস-সোফোক্লেসের কোরাস-চরিত্রে একসঙ্গে পঞ্চাশজন পর্যন্ত শিল্পী অংশগ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। সুতরাং, পরবর্তীকালে তা নিয়ে সমস্যা তো হতেই পারে। এই কোরাস-চরিত্রগুলি আমাদের দেশের যাত্রাগান-যক্ষগান-নৌ-টঙ্কী-তামাসা প্রভৃতি বিভিন্ন লোকনাট্যের 'বিবেক' চরিত্রের সমধর্মী বা কিছুটা সমতুল্য বলা চলে। প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন ঋক্‌বেদের এবং পরবর্তীকালের সাম-যজু-অথর্ব-বেদের শ্লোকগুলি সুরসহ আবৃত্তি করা হোতো। এই বিদ্যাও ছিল গুরুমুখী অর্থাৎ

গুরুশিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখে বাহিত হোতো। অবশ্যই বৈদিক আবৃত্তির ধরণধারণ-রীতিনীতি পরবর্তীকালের সংস্কৃত কবিতা বা শ্লোকের আবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। বিদগ্ধজনের মতে প্রাচীন চীনদেশে লাউৎজে ও তাঁর শিষ্য কনফুসিয়াসের দর্শনশাস্ত্রও লোকপরম্পরায় শ্রুতি-স্মৃতিদ্বারা রক্ষিত হয়েছে বিশেষ এক ধরনের আবৃত্তি-প্রক্রিয়ায় এবং পরবর্তীকালে পর্বতগাত্রে তক্ষণ-প্রক্রিয়ার সুপ্রয়োগে। মিশর ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার কাব্যসাহিত্যও আবৃত্তি করা হোতো কিম্বা গীত হোতো বলে জানা গেছে। আমাদের দেশে বৈদিকযুগপরবর্তী বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের বিশেষ স্বর-তাল-লয়-ভঙ্গিতে আবৃত্তি করার কথা পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ বৈদিক শ্লোক ও পরবর্তীকালের সংস্কৃত-কবিতা আবৃত্তির বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করা যায়।

ঋগ্বেদ :

ওঁ। অগ্নিম্ ঈলে। পুরঃ হিতম্। যজ্ঞস্য দেবং। ঋত্বিজম্। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

আবৃত্তি করার সময় উচ্চারণে **Pendulus Movement (Clock wise and Anti-clock-wise)** রক্ষা করাই নিয়ম ; যদিও পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ ইত্যাদি অনেক রীতিই বৈদিক শ্লোকাবৃত্তির সময় অনুসৃত হোতো বলে জানা যায়।

[ঋগ্বেদে মোট এগারো রকমের পাঠ আছে—সংহিতাপাঠ, পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ, মালাপাঠ, লেখাপাঠ, শিখাপাঠ, ধ্বজপাঠ, দণ্ডপাঠ, রথপাঠ এবং ঘনপাঠ। বৈদিক সংস্কৃত সাহিত্যে স্বর-এর স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাই এ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ছিল স্বরের যথাযথ জ্ঞান ও প্রয়োগ বোধ না হলে বেদপাঠ অশুদ্ধ হবে। উদাত্ত (Acute or Raised Accent), অনুদাত্ত (Grave Accent) ও স্বরিত (Circumflex Accent)—এই তিন প্রকারের স্বরপ্রয়োগরীতি প্রচলিত ছিল। এগারো প্রকারের পাঠ-রীতির মধ্যে উদাহরণস্বরূপ একটি রীতির (পদপাঠ) উল্লেখ করা যায় : এতে প্রত্যেকটি ঋক্-এর প্রত্যেকটি পদ বা শব্দ সন্ধিবিচ্ছেদ করে স্বতন্ত্ররূপে এবং সমাসবদ্ধ পদকে বিভক্ত করে পাঠ করা হোতো। যেমন—

অগ্নিম্ ঈলে পুরঃ হিতম্।
যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্॥
হোতারম্ রত্ন-ধাতমম্॥]

লেখার পদ্ধতি জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও দু'হাজার বছরেরও বেশী সময় পর্যন্ত ঋক্‌বেদের শ্লোকাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়নি মুখ্যত একটি কারণে—লেখাপড়ার চেয়ে আবৃত্তির উৎকর্ষতা। তাইতো ঋষিকবি বলেছেন—

"আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।"—সকল শাস্ত্রেই আবৃত্তি বোধ বা

ভাবগ্রহণশক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। স্বভাবতই, পণ্ডিতগণ মনে করতেন লেখ্যরূপে বৈদিকসাহিত্যের সব কিছু ধরা যায় না।

কণ্ঠস্বর, স্বরপরিবর্তনপ্রক্রিয়া, সুরের টান, হ্রস্ব-দীর্ঘ-অর্ধমাত্রার উচ্চারণের ঝোঁক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি শুধুমাত্র আবৃত্তিতে রক্ষিত হয়। সেজন্যই প্রায় দু'হাজার বছর পর্যন্ত বেদের কবিতা কাগজে কলমে বিধৃত হয়নি। কণ্ঠে কণ্ঠে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। আবৃত্তির এতটা মূল্যের জন্যই বেদের সময় থেকে আবৃত্তি বৈদিক শিক্ষার একটা বিশিষ্ট অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। যাতে একটি অক্ষরও পড়ে না যায় অথবা বিকৃত না হয় তার জন্যে বেদের কবিতা নানান ছাঁদে আবৃত্তি করা হোতো। এই সব ছাঁদের নাম ছিল 'পাঠ'। আবার আঠারো মাত্রার মন্দাক্রান্তা ছন্দে কালিদাসের মেঘদূতম্ আবৃত্তি কিন্তু বৈদিক শ্লোক আবৃত্তির Pendulus রীতি অনুযায়ী হয় না, হলে শুনতে আদৌ ভাল লাগে না।

কালিদাসের 'মেঘদূতম্'এর
"কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকারঃ প্রমত্তঃ।
শাপেনাস্তং গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ ॥" কিম্বা 'রঘুবংশম্'-এর
"দূরাদয়শ্চক্র নিভস্যতন্বী তমালতালিবনরাজিনীলা।
আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশেধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥"

শ্লোকের আবৃত্তি বিশেষ সুরে, উদাত্ত-অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে, স-শ-ষ, হ্রস্বদীর্ঘ-স্বর, ন-ণ এবং অন্যান্য নিয়মাবলী মেনেই (ছন্দমঞ্জরীর) করতে হবে এবং বলাই বাহুল্য আবৃত্তির অনুষঙ্গগুলি প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্ন সুর ও লয়ের নির্দিষ্ট নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হবে। অবশ্য আমার এই মন্তব্যকে কেউ যেন 'ব্যাকরণের জন্যই শিল্পসাহিত্য' উক্তির সমার্থক কিছু ভেবে না বসেন। আসল কথা হোলো—প্রত্যেক আবৃত্তিবিষয়েরই একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মনিষ্ঠতা আছে বা থাকে এবং বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন যে থাকা উচিত।

বৌদ্ধশাস্ত্রের স্তোত্রগুলি পালিভাষায় লেখ্যরূপ পায়। পালিতে শুধুমাত্র 'স'-এর ব্যবহার হয়, 'শ' ও 'ষ' নেই। 'ণ' অচলিত। বুদ্ধের পঞ্চশীলের লেখ্যরূপ হোলো—

"পানং ন হানে।
ন চ দিন্নমাদিয়ে।
মুসা ন ভাসে।
ন চ মজ্জপোসিয়া।
ন চ কামেসু মচ্ছিচারা ॥"—এই পঞ্চশীল কিম্বা বুদ্ধ-সঙ্ঘ-ধর্ম-শরণমন্ত্রের আবৃত্তি-

রীতি কিছুটা একঘেয়ে স-ঋ-গ-ম হয়ে পঞ্চম-এর মধ্যে আবর্তিত হয় অর্থাৎ একটি সপ্তকও এর পরিসর (Range) নয়।

আবার চার্চে ক্যারোল-সঙ্গীতের আবৃত্তির ধরণধারণের সঙ্গে অতি অবশ্যই স্বাতন্ত্র পরিলক্ষিত হবে বাইবেলের—"To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill and a time to hail. A time to love and a time to hate ; a time of war and a time to peace.—" নীতিবাক্যের আবৃত্তিতে। [একইভাবে উল্লেখ করা যায় মধ্যযুগে শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট নাটকের "To be or not to be…" স্বগতোক্তি অংশটি গত চারশো বছর ধরে কত বিখ্যাত অভিনেতা কত বিচিত্র নাটকীয় রীতিতেই না এটি আবৃত্তি করেছেন।]

আবার মূল আরবী কিম্বা ফারসীভাষার অনুবাদে আল্-কুরান্ কিম্বা আল্-হাদিস-এর সূত্রগুলি আবৃত্তি করা হয় জলদমন্দ্রস্বরে সুসমন্বিত সুরারোপের আধারে। তেমনি ভোরের আজান-এর যে সুর-ধ্বনি যে কোনো মানুষের দেহমনে পবিত্র-প্রশান্ত আনন্দানুভূতির সঞ্চার করে তা উপযুক্তভাবে অনুশীলনসাপেক্ষ।

উদাহরণ-বাহুল্য পরিহার করেও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তথাকথিত সভ্য-সমাজের বাইরে আদিবাসী ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর লোকসমাজের নানান ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও শব্দ-ধ্বনি-সঙ্গীতময় আবৃত্তির বহুবিচিত্র প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

আমরা জানি, ব্যক্তি বা সমষ্টিমানুষের ভয় থেকে ভক্তি এবং আচার-সর্বস্ব ভক্তি থেকেই পৃথিবীর নানান দেশে দেবদেবীর কল্পনার অনুষঙ্গ রূপে নানান ধর্মবোধের সূচনা হয়। এই ধর্মবোধের মুখ্যত দুটি বিভাগ—প্রথমটি অন্ধ আচারসর্বস্বতা বা আচরণের দিক। দ্বিতীয়টি ধর্মবোধের বিভিন্ন প্রকাশের সামাজিক তাৎপর্যমণ্ডিত প্রয়োগকর্ম—যা কৃষ্টি (কর্ষণা শব্দ থেকে) বা সংস্কৃতি অভিধায় অভিহিত হয়েছে। ধর্মবোধের প্রায় অভিন্ন অর্থে সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে তো বটেই, পরবর্তী পর্যায়-গুলিতেও সামাজিক মানুষের আচরণের ধরণধারণগুলি তার কার্যকরী অভিজ্ঞতার নিরীখে সংগঠিত হয়েছে। একেই কলাচর্চা বা সংস্কৃতিচর্চা বলা যায়। যদিও বিবর্তনের বহু ধাপ পেরিয়ে মানুষের সংস্কৃতির সংজ্ঞাকে সাম্প্রতিককালে সংজ্ঞায়িত করা যায়—মানুষের চলমান সংগ্রামী জীবনের প্রত্যক্ষকল্প রসরূপ।

জর্জ টমসন তাঁর Human Essence গ্রন্থে (বঙ্গানুবাদ —সৌরেন বসু) প্রাসঙ্গিক বিষয়ের যে বক্তব্য রেখেছেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"শ্রমসঙ্গীত বা কর্মসঙ্গীত কোন্ ধরনের সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত দৈহিক শ্রমের নির্দেশজ্ঞাপক অনুসঙ্গ, যেমন নৌকা বাওয়া, ভারী জিনিস তোলা, জালটানা, ফসলকাটা, তাঁতবোনা প্রভৃতি। এর দুটি ভাগ আছে—(সকলে মিলে) ধুয়া ধরা এবং (তৎক্ষণাৎ) মুখে মুখে রচনা করা।

ধুয়া বা শ্রমকালীন চিৎকার (বোল) এক অসংবদ্ধ আওয়াজ যা ঠিক কাজেরই সময় শারীরিক শক্তি ব্যবহারে করা হয় এবং একই ধরণে বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে স্বরযন্ত্রের অন্তর্দৈহিক নড়াচড়ার প্রতিবর্ত ছাড়া আর বেশি কিছু নয়, যদিও এটি একই সাথে দুটি কাজ করার সচেতন উদ্দেশ্যে প্রভাবিত। এর সরলতম রূপের সময়ে এতে দুটি বা তিনটি অক্ষর থাকে। নৌকার মাঝি-মাল্লারা আওয়াজ দেয়—'ও-আপ্!' প্রথম অক্ষরটি প্রস্তুতির সঙ্কেত, দ্বিতীয় শব্দটি দাঁড়ে জোর দেওয়ার মুহূর্তের। তিন শব্দের তৃতীয় শব্দটি শিথিলতার জন্য থামার প্রয়োজনে—যেমন ভোল্গার নৌকা বাওয়ার গানে—'এ-আক্-নিয়েম্'। মুখে মুখে বাঁধা শ্রমচিৎকারের মাঝখানে গাওয়া হয়ে থাকে সুসংবদ্ধ এবং পরিবর্তনমূলক নিজেদের কাজ সম্পর্কে শ্রমিকদের মনোভাব। যেমন—দক্ষিণ আফ্রিকার পাথরভাঙার গানে :

ওরা অত্যাচারী—এ-হে,
ওরা নিষ্ঠুর—এ-হে,
ওরা নিজেরাই কফি খায়—এ-হে,
দেয়না তো আমাদের একটুও—এ-হে।

এইভাবে শ্রমচিৎকারের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে দ্বিতীয় অক্ষরের যে সম্পর্ক, মুখে মুখে বানানো গানের সাথে সাময়িকভাবে তার সেই একই সম্পর্ক। সঙ্গীত উদ্ভূত হয়েছে (সমবেত) চিৎকার থেকে, ঠিক যেমন এই চিৎকার জন্মলাভ করেছে কাজের (শ্রম) মধ্য থেকে। ...এই প্রসঙ্গে চীনদেশের একটি উদাহরণ (নবম শতাব্দী) :

ঘরের থেকে হাজার মাইল দূরে
দরকারে ঐ বিশটি বছর ধরে।
আগের গানের একটি শব্দগুচ্ছে
তোমার চোখে অশ্রুবারি ঝরে॥

—এই ধরনের কবিতা সারা বিশ্ব জুড়ে রয়েছে।

সঙ্গীত হিসাবে বিশ্লেষণ করলে চতুষ্পদি হচ্ছে দুটি শব্দগুচ্ছে—ভাগ করা সঙ্গীতময় বাক্য, যার প্রত্যেকটিতে দুটি সংখ্যা আছে। দুটি শব্দগুচ্ছ একে অন্যের ঘোষণা ও উত্তর হিসাবে আছে। প্রথমটি দ্বিতীয়টিতে নিয়ে যায় এবং দ্বিতীয়টি প্রথম থেকে উদ্ভূত। যুক্তভাবে তারা একটি রূপকমিলন প্রস্তুত করে, যা এসেছে

শ্রম-সঙ্গীতের দুটি অংশের মিলন থেকে; একেই সঙ্গীতবিদ্‌রা দ্বৈত-রূপ এ-বি বলে থাকেন।”

সুতরাং, সভ্যতার আদিযুগ থেকে মানুষের সংস্কৃতিচর্চায় সুর-ধ্বনি-বাক্‌-লিপি-কাব্য প্রভৃতির বিভিন্ন আবেগময় জ্ঞাত-অজ্ঞাত সুরসমন্বিত আবৃত্তি ছিল এবং আছে। বিভিন্নদেশে বিভিন্নকালে বিচিত্র অনুষঙ্গসহ এই আবৃত্তি কখনো ধর্মীয় বিষয়কে, কখনো শ্রম বা কর্মকে কেন্দ্র করে রচিত এবং সম্প্রচারিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। যদিও, গ্রীক নাটকের দেববাদ-নির্ভর নিয়তিবাদ প্রচারক কোরাস-এর আবৃত্তির সঙ্গে প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য অতি অবশ্যই ছিল পরবর্তীকালের বৈদিক মন্ত্রোচারণে, লাওৎজের তাও-বাদ ব্যাখ্যানে, বৌদ্ধ স্তোত্রগানে, ভোরের আজানধ্বনিতে, বাইবেলের নীতির ধ্বনিময় উচ্চারণে কিম্বা দক্ষিণ আফ্রিকার পাথরভাঙা গানের শ্রম-সঙ্গীতের যান্ত্রিক ছন্দপ্রয়োগে। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন ধর্মের স্তোত্র-মন্ত্রাদির যে উল্লেখ করা হোলো তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিছক অনুসরণসর্বস্বতা নয়, পরন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মানবিক কর্মৈষণার রসরূপ, কারণ মানুষের যুগযুগান্তের কল্যাণৈষণা আচারসর্বস্ব ধর্মবোধকে মনের মাধুরী মিশ্রণে শিল্প ও সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবনায়ণের ঐশ্বর্যে রূপান্তরিত করেছে। আর একটি উদাহরণ উল্লেখের মধ্য দিয়ে আলোচ্য প্রসঙ্গের উপসংহার পর্বে প্রবেশ করা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আদিবাসী উপজাতি কিম্বা প্রচলিত নানান ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মগ্রন্থাদিতে জগৎসৃষ্টির যে উপাখ্যান বা ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় তা মোটামুটিভাবে এক হলেও গঠন ও বর্ণনরীতিতে স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনা সূচিত করে। এবং বলাইবাহুল্য, একটিই কারণ এবং তা হোলো—আদিম মানুষের জগৎ সম্পর্কে ধারণা তার সামাজিক সম্পর্কের ধারণার মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিল।

এবার দেখা যাক আবৃত্তির সংজ্ঞা বা তার প্রয়োগ সম্পর্কে দেশে-বিদেশে ধ্যান-ধারণা বা রূপরেখার পরিচয়বাহী চিত্রটি কেমন।

আমাদের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রসমূহে যে চৌষট্টি কলাবিধির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে দুটি হোলো—‘সংপাঠ্য’ এবং ‘মানসী কাব্যক্রিয়া’। সংপাঠ্য-র অর্থ হোলো এমন বিষয় যা সম্যক্‌ভাবে পাঠ করা যায়—যার সোজাসুজি অর্থ দাঁড়ায় বর্তমান আবৃত্তি বা **Recitation**। শ্রোতার উপযুক্ত পরিতোষণের জন্য বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ পাঠ কিম্বা জ্ঞাপনের জন্য উদ্দেশ্যমূলক পাঠ—এই দুটিই উক্ত শব্দে সূচিত হয়। আবার এর অর্থ সম্মিলিত বা দুজনে মিলে পাঠও বোঝায়। কামসূত্রম্‌ গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার যশোধর বলেছেন—পূর্বনির্ধারিত ব্যক্তি একটি গ্রন্থপাঠ করবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন একইভাবে সহযোগিতা করে যাবে। ‘কাব্যক্রিয়া’ নামে কলাবিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, তারও প্রকৃত অর্থ হোলো—উত্তম কাব্যপাঠ। টীকাকার এর ব্যাখ্যায়

বলেছেন—মাত্রা, সন্ধি, সংযোগ, অসংযোগ, ছন্দ, বিন্যাস সঠিকভাবে অনুসরণ করে পাঠ করাকে কাব্যক্রিয়া বলে। টীকাকারের মতে—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষাকেও এই পঠনক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট করে তোলা প্রয়োজন। এছাড়া পাঠক্রিয়ায় ছন্দজ্ঞান তো অত্যাবশ্যক।

সুতরাং 'আবৃত্তি' কলাটি অবশ্যই কোনো সাম্প্রতিককালে সৃষ্ট প্রয়োগবিজ্ঞান নয়, অন্তত দু'হাজার বছরেরও পূর্ব থেকে যে এর চল ছিল তার প্রমাণ শ্রুতি বা বেদ। তখন থেকেই অভিনয়ক্রিয়ার সঙ্গে আবৃত্তিকলা সম্পৃক্ত থাকলেও কিছুটা স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই ছিল। অভিনেতারা যখন আবৃত্তি করেন তখন যদি কাব্যাংশ তাঁদের অভিজ্ঞতার আয়তনে (বিশেষ বিশেষ রসের প্রকাশ-পারঙ্গমতার নিরীখে) এসে পড়ে তাহলে তাঁরা অবশ্যই কৃতকার্য হন, নচেৎ আবৃত্তিতে প্রয়োজনীয় রসসঞ্চারে ব্যর্থ হন। আবৃত্তির টেক্‌নিক অভিনয় থেকে স্বতন্ত্র, আবৃত্তিকারকে কাব্যের সমস্ত দিক পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হয়। কারণ কাব্যে যতগুলি রস প্রস্ফুটিত হয়েছে তার সবগুলিই তাঁকে একক প্রচেষ্টায় শুধুমাত্র কণ্ঠসম্পদের দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং তার দ্বারা কাব্যের সামগ্রিক **effect** শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। একজন অভিনেতার দায়িত্ব শুধু তাঁর সংলাপকে পরিব্যক্ত করা কিন্তু আবৃত্তিতে আরো অধিক কিছু সংযোজিত হয় যা কাব্যের গ্রন্থনকার্যকে নির্বহ করে তুলেছে। সুতরাং পঠনকাজ যদি সুচারু ও সুললিত না হয় তাহলে কবিতাশ্রবণ শ্রোতাদের কাছে একঘেয়ে মনে হবে। অতএব আবৃত্তিকারের সাহিত্য তথা কাব্যবোধ অভিনেতার চেয়ে অনেক বেশী সক্রিয় ও গভীর হওয়ার প্রয়োজন। আবৃত্তি মূলত **subjective,** আমাদের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত, আর অভিনয় মুখ্যত **objective,** যা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত, সুতরাং আবৃত্তিকারকে কিছু পরিমাণে অন্তত বুদ্ধিজীবী হতে হবে কারণ তাঁকে কবি অনুসারী হয়েও একজন স্বতন্ত্র স্রষ্টা হয়ে উঠতে হয়। ড. অরুণকুমার বসু তাঁর এক পত্র-নিবন্ধে অন্যান্য দেশে আবৃত্তির সংজ্ঞা সম্পর্কে ধ্যানধারণার আলোচনা করেছেন সুন্দরভাবে। ষোড়শ শতকের শেষদিকে রোম নগরে অর‍্যাটোরি অফ্‌ সেন্ট ফিলিপনরি নামে একটি খৃষ্টীয় প্রতিষ্ঠানে বাইবেলের বক্তৃতামূলক গদ্য-পদ্যাংশ সমবেত কণ্ঠে অভিনয়রীতিবর্জিত পদ্ধতিতে আবৃত্তি করা শেখানো হোতো। ঐ সময় থেকেই কাব্যপাঠ কিম্বা কাব্য-আবৃত্তির ইতিহাস সংগ্রহ করা আরম্ভ হয়। মধ্যযুগের ইংরেজিতেই প্রথম রি-সাইটেন শব্দ পাওয়া যায় (আবৃত্তি অর্থে না হলেও বিবৃত করা অথবা কিছু বলা অর্থে)। মধ্যযুগের ফরাসীতে সমার্থক শব্দ হোলো রি-সাইতের,—যার মূল লাতিন শব্দ হোলো রি-সাইতারে (লাতিন ভাষাতে 'তারে' যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ সংগঠিত হয়) যার অর্থ হোলো মন থেকে বা স্মৃতি থেকে কোনো কিছু

বলা। ইতালীয় ভাষায় 'রিসাইতেতিভো' সমার্থক শব্দ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—ইংরেজি বিশেষ্য শব্দ 'রিসাইটেশন' এবং ধাতুরূপ 'রিসাইট' কয়েক শত বৎসর পূর্ব থেকেই প্রচলিত আছে—যার অর্থ স্মৃতিনির্ভর পাঠ বা উচ্চারণ। অক্স্‌ফোর্ড ডিক্‌স্‌নারীর ভাষায়—"to repeat or utter aloud (something previously composed, heard or learned by heart)"—বা সম্প্রতি আরো সুনির্দিষ্ট অর্থে—"to repeat to an andienec (a piece of verse or other composition) from memory and in an appropriate manner", অর্থাৎ পূর্বরচিত পূর্বশ্রুত অথবা পূর্বজ্ঞাত কোনো কবিতা বা অন্য কোনো রচনার উচ্চকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি—এই ছিল অর্থ। গ্রীক নাটকের কোরাস চরিত্রগুলিতে আমরা এই ক্রিয়ার কথা জেনেছি। সুতরাং এই যে স্মৃতিনির্ভর পাঠনক্রিয়া বা আবৃত্তি বা Recitation—এর প্রচলন প্রাচীন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সময়ে ছিল। ইংরেজি ভাষায় ষোড়শ শতক থেকে Recite ক্রিয়াপদটির বিভিন্ন ব্যবহারের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক :

(১) All other kinds of poems......were only rccited by mouth : 1589 A.D.

(২) I recite some Heroic lines of my own : 1709 A.D.

(৩) The dialogue was neither sung in measure, nor declaimed without Music, but recited in simple musical tones : 1789 A.D.

'Recite' ধাতুরূপটির আরো অনেক প্রয়োগ ছিল বলে জানা যায়। Oxford Dictionary-তে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া আছে। এছাড়া ইংরেজ কবি মিলটন ১৬৪১-এর এক লেখায় বলছেন—"Wise and artful recitations sweetened with eloquent and graceful inticements"—কণ্ঠস্বরের মাধুর্য দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্‌বোধিত করার জন্য স্মৃতিনির্ভর কাব্যপাঠনবিদ্যা পাঠের ব্যবস্থা তখন যে চালু ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি আরব্য উপন্যাসের ইংরেজি সংস্করণে বলা হয়েছে Thus, on the first night of the thousand and one, Shahrazad commenced her recitations—এখানে কোনো কবিতা পাঠের কথা নেই বটে কিন্তু মনোরম ভঙ্গিতে গল্প বলা বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু Recitation যে বক্তৃতা নয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট করে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক গ্রন্থে বলা হচ্ছে—There were recitations and lectures in a spacious Council-room. আমেরিকান সাহিত্যে উনিশ শতকে Recitation অর্থে বোঝানো হয়েছে—The repetition of a prepared lesson

or exercise, an examination on something previously learned or explained.

সুতরাং প্রাচীনকালে দেশে-বিদেশে আবৃত্তি যে স্মৃতিনির্ভর পাঠনবিদ্যা ছিল—সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মহাকবি গ্যয়টের আবৃত্তি প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য দিয়ে পূর্বকথন (ক) অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করা যাক। তদানীন্তন জার্মানীতে ভাইমার থিয়েটারের ভারপ্রাপ্তরূপে বেশ কিছু নিয়মকানুন তৈরী করেন গ্যয়টে। আবৃত্তি ও অভিনয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল: "আবৃত্তি বিশেষ ধরনের কথন। এটি একেবারে আপ্লুত হওয়া গদগদকণ্ঠের বক্তৃতা নয়, আবার একেবারে শান্ত, নির্লিপ্ত ভাষণও নয়—এ দুয়ের মাঝামাঝি-স্বরের উত্থান-পতন-যুক্ত বাচনপ্রথা। কবির আদর্শ এবং কাব্যের বিষয়বস্তুর নানা রসগত পার্থক্য আবৃত্তি-কারের মধ্যে যে যে ভাবের সৃষ্টি করে সেই ভাব সে তার কণ্ঠস্বর দিয়ে প্রকাশ করে। এর জন্য তার নিজের স্বভাব অথবা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করতে হয় না।"

পূর্ব কথন-(খ) পূর্বকথন-(ক)-এর পরিপ্রেক্ষিতে দশম থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ের বাংলা সাহিত্যের (বিশেষ করে কাব্যের) আবৃত্তি-উপযোগিতার বিশ্লেষণ।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের লেখ্যরূপের বয়স প্রায় হাজার বছরের। বাংলা লেখ্যরূপের পূর্বে কথ্যরূপের নির্দিষ্ট গঠন-প্রকৃতি জানা না গেলেও তা যে অবশ্যই ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের লেখ্যরূপের প্রাচীনতম নিদর্শন। সংস্কৃতভাষায় রচিত মূল পুঁথি 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ' একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ। আলো-আঁধারি ভাষা বা সন্ধ্যাভাষায় রচিত (খানিক বোঝা যায়, খানিক বোঝা যায় না) তেইশজন পদকর্তা রচিত পঞ্চাশটি চর্য্যার বিষয়বস্তু—বৌদ্ধ সহজিয়াতত্ত্ব, মহাযানীযোগ ও তন্ত্রসাধনার মতাবলী।

পূর্বকথন (ক)-এর প্রেক্ষিতে দশম থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কালের বাংলা কবিতার আবৃত্তি-রূপরেখা নির্ধারণে স্বভাবতই চর্য্যাপদের আরো কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা আবশ্যক।

প্রথমত, চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ঃ পুঁথিতে মাত্র পঞ্চাশটি চর্য্যার পরিচয় থাকলেও পরবর্তীকালের বৈষ্ণবপদাবলী-শাক্তপদাবলী মঙ্গলকাব্যের ন্যায় বৌদ্ধগীতিকাধারা দশম-দ্বাদশ শতকে যে বাংলাভাষায় বিশাল বৌদ্ধসাহিত্যভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়েছিল তার অসংখ্য প্রমাণপঞ্জীসহ ব্যাখ্যা করেছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. কোডিয়ার প্রমুখ দেশী-বিদেশী মনীষিবৃন্দ। সুতরাং পরবর্তীকালের পদাবলী সাহিত্যের আদর্শস্থানীয় হল চর্য্যাপদ।

দ্বিতীয়ত, বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের প্রাচীনতম রূপের সন্ধান চর্য্যাপদেই পাওয়া যায়। চর্য্যার প্রথম পদটি (লুইপাদ রচিত, পটমঞ্জরী রাগে গেয়) পয়ার ছন্দের কবিতার আদর্শ নিদর্শন :

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল ॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥

সাধারণত কবি জয়দেব বিরচিত গীতগোবিন্দের রচনাকে পয়ারের আদর্শ বলা হয় কিন্তু চর্য্যাগুলি জয়দেবের আবির্ভাবের আগে রচিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। স্বভাবতই কোনো কোনো পণ্ডিতজন মনে করেন প্রাচীনতার নিদর্শনরূপে এবং বাংলায় সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলে চর্য্যাপদেই বাংলাছন্দের আদিরূপের সন্ধান পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ গীতগোবিন্দে চর্য্যার ছন্দের অনুকরণপ্রয়াস উল্লেখ্য :

(চর্য্যাপদ—২৮ থেকে)

২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ২

উ চা উ চা / পা ব ত তঁহি / ব স ই স ব রী / বা লী।

২ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২ ২

মো র ঙ্গি পী চ্ছ / প র হি ণ স ব রী / গি ব ত গু ঞ্জ রী/মা লী॥

(গীতগোবিন্দম্)

২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২

ধী র স মী রে / য মু না-তী রে / ব স তি ব নে ব ন- /মা লী।

২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২

পী ন প য়ো ধ র- / প রি স র - ম র্দ ন-/ চ ঞ্চ ল - ক র যু গ- / শা লী॥

ত্রিপদীর উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য :

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ
লীলে পার করেই॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী
বাটত ভইল উছারা।
সদ্‌গুরু পাঅ পসাএঁ জাইব
পুণু জিণউরা॥

এমনকি ত্রিপদীছন্দে রচিত বৈষ্ণবকবিতায় ধ্রুবপদত্রয়ের—

"সই কে বলে পীরিতি ভাল।
কালার সহিত পীরিতি করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল॥"

সন্ধান ও চর্য্যাতে পাওয়া যায় ৪১তম পদে—

"অকট জোহআরে, মা কর হাথ লোহ্না।
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝসি
তুটই বাষনা তোরা॥"

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে চর্য্যাপদরচনায় অক্ষরসমতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য না দেওয়ায় ছন্দের দোষ কিছু কিছু আছে।

তৃতীয়ত, চর্য্যাতে অপভ্রংশ গাথার প্রভাব সুপরিস্ফুট, যেমন কিনা পরবর্তী-কালে রচিত গীতগোবিন্দে সংস্কৃতের।

চতুর্থত, আমরা জানি, অক্ষরের (syllable) সংখ্যা দ্বারা বিবিধ ছন্দের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন—চতুর্দশপদী। চর্য্যাতেও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে :

দশাক্ষরাবৃত্তিঃ

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥ (চর্য্যা — ৪৯)।
বিন্দুণাদ ণ হিএঁ পইঠা।
আণ চাহন্তে আণ বিণঠা ॥
জথা আইলেসি তথা জান।
মাঝ থাকী সঅল বিহাণ ॥ (চর্য্যা—৪৪)।

মাইকেল মধুসূদন বাংলাভাষায় চতুর্দশপদাবলীর প্রবর্তকরূপে পরিচিত কিন্তু কোনো কোনো পণ্ডিতজন মনে করেন বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে, এমনকি চর্য্যাপদে চতুর্দশপদে কবিতারচনার অজস্র নিদর্শন আছে। প্রাচীনতম রূপের নিদর্শন হোলো দশম ও পঞ্চাশতম চর্য্যা।

[দশম চর্য্যা। রাগ—দেশাখ। রচয়িতা—কাহ্ন-পাদ।]

নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মণ নাড়িআ ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ ॥
এক সো পদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরনা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া ॥
তুলো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী ॥
সরবর ভাজিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ ॥

পূর্বেই বলা হয়েছে অক্ষরসমতার দোষ চর্যাপদে আছে তাছাড়া, সন্ধ্যা-ভাষায় রচিত হওয়ায় অনেক পদের অর্থ সহজবোধ্য নয়। কিন্তু চতুর্দশপদাবলীর প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে এটিকে অস্বীকার করার তো কোনো অবকাশ নেই, আর অর্থবোধগম্যতার ক্ষেত্রে পণ্ডিতজনের টীকা তো অলভ্য নয়। যেমন উল্লিখিত দশম চর্যাটির প্রাপ্য মমার্থ হোলো—ডোমজাতীয় লোকেরা অস্পৃশ্যরূপে সমাজে বিবেচিত হয় এবং তারা সাধারণত নগরের বাইরে অবস্থান করে। এ রীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে মহাসুখস্বরূপিণী পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা বা নির্বাণ দেবীকে ডোম্বী আখ্যায় অভিহিত করে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। নৈরাত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় বলে অস্পৃশ্যা ডোমজাতীয়া। কাহ্নপাদ বা কৃষ্ণাচার্য বলছেন—ওগো নৈরাত্মা ডোম্বি, গুরুর উপদেশে এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে রূপাদি বিষয় সমূহের বাইরে তুমি অবস্থান করো, এবং যাঁরা সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নয় এরূপ যোগিগণের চপলচিত্তকে তুমি কেবলমাত্র স্পর্শ করেই চলে যাও। অর্থাৎ তাঁরা তোমার আভাসমাত্র জানতে পারে কিন্তু তোমাকে আয়ত্ত করতে পারে না। অর্থাৎ একমাত্র সহজিয়াপন্থীরাই নির্বাণরূপ মহাসুখের অধিকারী হয়, অন্য কেউ নয়। সুতরাং বক্তব্য হোলো—পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের তো বটেই এমনকি রবীন্দ্রনাথের "অতো চুপিচুপি কেন কথা কও ওগো মরণ, হে মোর মরণ। ওগো একী প্রণয়ের ধরণ" ইত্যাদি আবৃত্তিগুলির অর্থও কি খুব সহজসাধ্য!

তাছাড়া, পদগঠনরীতিতেও বিভক্তিপ্রকরণের অনেক নিয়মই চর্যায় পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বাংলার কোনো কারকে কোনো বিভক্তিই একবচনে ব্যবহৃত হয় না—যা চর্যাপদে পরিদৃশ্যমান। আধুনিক বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী লিঙ্গ-ব্যবহারের কঠোর নিয়ম নেই কিন্তু চর্যাপদে অপভ্রংশ ভাষার কঠোর প্রভাবে লিঙ্গের বিশিষ্টতা অধিকাংশক্ষেত্রে রক্ষিত হয়েছে। সমান সবর্ণে সন্ধিপদ দীর্ঘ হয়, এই সূত্রানুযায়ী গঠিত সমস্ত পদের দৃষ্টান্ত চর্যাতেও পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলার মত দুই প্রকারে কারক গঠিত হয়—(১) বিভক্তিযোগে, (২) ভিন্ন শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহারে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের একটি মাত্রই উদ্দেশ্য এবং তা হোলো—প্রাচীনতম বাংলা-লেখ্যপদের (চর্যাপদ) রচনাগত রূপ-রীতিতে গুরুমুখীবিদ্যানুযায়ী আবৃত্তি-প্রবহমানতার প্রামাণ্য উপকরণগুলিকে উদ্‌ঘাটন করা। কারণ, ধর্মসাধনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত চর্যাপদের বিষয়বস্তু হলেও সুর এবং অনুভূতির প্রকাশগুণে এগুলি গীতিকবিতার অসাধারণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত এবং উপস্থাপিত হয়েছে। চর্যাগুলির স্বাভাবিক গতি, সঙ্গীতমুখরতা, স্ব-প্রাকৃতিক অবয়বের ব্যঞ্জনায় আবৃত্তির আদর্শ বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিককালে জয়দেব-প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে দু'একজন উড়িষ্যার পণ্ডিত প্রশ্ন তুললেও জয়দেবের বাঙালীত্ব সম্পর্কে সঠিক প্রমাণপঞ্জীর বহুবিধ নিদর্শনের অভাব নেই। এবং বাংলাসাহিত্যের প্রাচীনযুগের (যার চরিত্রলক্ষণরূপে দেববাদনির্ভর মানবিক ধর্মসাধনাকে চিহ্নিত করা যায়) সর্বশ্রেষ্ঠ কবিব্যক্তিত্বরূপে জয়দেব সর্বজন-স্বীকৃত বলা চলে। বস্তুতপক্ষে, 'পদাবলী' শব্দের উৎস হোলো—জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী-পদটি। বাংলাসাহিত্যের শুধু আদিযুগেই নয়, সমগ্র মধ্যযুগেও পদাবলী সাহিত্যই সামাজিক মানুষের ধর্মজীবনায়নের মঙ্গলগীত বা যোগারূঢ় সঙ্গীতরূপে পরিগৃহীত ও পরিকীর্তিত হয়েছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'আমরা' কবিতায় বলেছেন—

"বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্তকোমল পদে।
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চনকোকনদে ॥"

আদিযুগের একমাত্র সার্থক পদাবলী-রচয়িতা জয়দেবের কাব্যের একটি মাত্র বিষয়বস্তু হোলো—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। বস্তুতপক্ষে, বাংলাসাহিত্যে ও দর্শনে রাধাতত্ত্বের সর্বপ্রথম প্রকাশ ও প্রচার জয়দেবের রচনাতে। সহজ-সুন্দর সুললিত রীতিতে রচিত জয়দেবের দশাবতারস্তোত্র একই সঙ্গে আবৃত্তি ও সঙ্গীতযোগ্য আদর্শ পাঠ। ঠিক তেমনি তাঁর রচিত মাঙ্গলিকী স্তোত্র :

"শ্রিত-কমলা-কুচমণ্ডল, ধৃত-কুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল
জয় জয় দেব হরে ॥ ১
দিনমণি-মণ্ডল-মন্দন, ভব-খণ্ডন,
মুনিজন-মানস হংস।
জয় জয় দেব হরে ॥ ২
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন, জন-রঞ্জন,
যদুকুল-নলিন-দিনেশ
জয় জয় দেব হরে ॥ ৩
মধু-মুর-নরক বিনাশন, গরুড়াসন,
সুরকুল-কেলি-নিদান
জয় জয় দেব হরে ॥ ৪
অমল-কমল-দললোচন, ভবমোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান
জয় জয় দেব হরে ॥ ৫

—শুধুমাত্র ভক্তজনের

গেয় গীতই নয়, কাব্যরসিক, ছন্দপ্রিয় সাহিত্যরসপিপাসু শিল্পী পাঠকের নিকটও প্রিয় এবং আদর্শস্থানীয় আবৃত্তি-পাঠ বটে। আর যদিও রাধাকৃষ্ণের বহুবিচিত্র লীলার একটিমাত্র অংশ বসন্তরাস রূপায়িত হয়েছে জয়দেবের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি 'গীতগোবিন্দম্'-এ তবু নাটকীয় ভঙ্গিময় এই সম্পূর্ণ গীতিকাব্যেই পরিপূর্ণ ও সার্থকরূপেই পাওয়া যায় অসাধারণ বাগ্‌নিদগ্ধ শিল্পীকে। জয়দেবের এই সৃষ্টির সার্থক অনুকরণও আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেন নি। রচনার ভাষা মুখ্যত সংস্কৃতধর্মী হলেও আবেগ ও আবেদনে সর্বজনীন বাঙলা ও বাঙালীর স্ব-ভাবের এত সুন্দর ও সার্থক প্রকাশ অন্য কাব্যে শুধু পাওয়া যায় না নয় পরন্তু পরবর্তীকালের সমস্ত লীলাবিষয়ক পদাবলী সাহিত্যের আদর্শ-উৎস্বরূপ। তাই, বাংলা আবৃত্তির ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশ-ভঙ্গির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসমুখরূপে জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ স্মরণীয়।

জয়দেবের পূর্বেও বাঙলাদেশে সংস্কৃতে বা অপভ্রংশে রচিত পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্য ছিল বলে পণ্ডিতজনেরা মনে করেন, কারণ 'রাগাত্মিকা' শব্দটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব্যের হলেও ভাবটি প্রাচীন এবং এই ভাবের ব্যাপক ও পরিপুষ্ট ধারা বাঙলাদেশে প্রবাহিত না থাকলে রচিত গীতগোবিন্দের ভাব-পিণদ্ধতা সম্ভবত বাঙালীর নিকট সর্বাত্মক স্বীকৃতি ও আপ্যায়নলাভ করত না।

জয়দেব থেকে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির ব্যবধান প্রায় তিন শতকের। যদিও বিদ্যাপতি মিথিলার মানুষ এবং তাঁর রচনার ভাষা মৈথিলী, তবু কাব্যরসিক বাঙালীর কাছে স্ব-ভাবে ও রচনাকৃতিতে সদৃশ ও সমসাময়িক কালের প্রায় সমবয়সী দুই কবি-প্রতিভা 'বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস' একই সঙ্গে শুধু উচ্চারিত হন নি, স্বীকৃত এবং আদৃতও বটে। যেমন, চণ্ডীদাসের বসতি বীরভূমের নান্নুরে কিম্বা বাঁকুড়ার ছাতনায়—এই বাদবিসম্বাদে ইতিহাসবেত্তারা তর্কে বহুদূর যেতে রাজি হলেও সাধারণ কাব্যপ্রিয় বাঙালীর কাছে আদর-উৎসাহ-আগ্রহের বিষয় হয় তাঁর অসাধারণ পদাবলী। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি রচিত অনুপম অসংখ্য পদাবলীর উদ্ধৃতি-উল্লেখ বাহুল্যবোধে পরিহার করে শুধুমাত্র গীতময়তা ও আদর্শ-ত্রিপদী-ছন্দের কাব্যাস্বাদনের স্বাদুতা (এবং আবৃত্তিযোগ্যতা) প্রমাণের জন্য চণ্ডীদাসের একটি পদের শেষাংশটুকু স্মরণ করছি :

"বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাড়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা।
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।

চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে ॥"

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের চৈতন্যপূর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা। এঁরা ছাড়া, শিবায়ণকাব্যের রচনার সূচনাও ঘটে চৈতন্যপূর্বযুগে। শিবায়ণ বা শিবমঙ্গলের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ প্রয়োজনীয় কারণ শিবায়ণ-রচনিকাতেই বাংলাগদ্যের আদিরূপ বিধৃত আছে। স্বভাবতই বাংলাগদ্যপাঠ এবং আবৃত্তি করার ব্যাপারে বিষয়টি ঐতিহাসিকতার দিক থেকে স্মরণযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের জীবন ও সাধনা বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগকে শুধু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিতই করেনি (বাংলাসাহিত্যের সমগ্র মধ্যযুগকেই অনেকে শ্রীচৈতন্যনামাঙ্কিত করে থাকেন) পরন্তু অসাম্প্রদায়িকবোধ, সাম্যচেতনা, সমন্বয়ী মানসিকতা এবং সর্বোপরি ধর্মে-সমাজে (এমনকি রাজনীতিতে) সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর ও কার্যকরী ভূমিকা পালনে তৎপরতার প্রবর্তক, পথপ্রদর্শক এবং মূর্তিমান আদর্শ চরিত্ররূপে আজো শ্রীচৈতন্য বাঙলা ও বাঙালীর কাছে অদ্বিতীয় মানুষরূপে স্বীকৃত এবং বন্দিত। শ্রীচৈতন্যকে অবলম্বন করে শুধু বাঙলাভাষায় নয় অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতে যত জীবনী-সাহিত্য, নাটক, কাব্য ইত্যাদি রচিত হয়েছে পৃথিবীতে আর কোনো ব্যক্তিমানুষ সম্ভবত (যীশুখ্রীষ্টের কথা মনে রেখেই বলা যায়) সে পর্যায়ে পৌছান নি। শ্রীচৈতন্যের সমকাল থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত জীবনী ও পদাবলী সাহিত্যের যে কূলপ্লাবী মহাধারা প্রবাহিত হয় তা কাব্যরসিক বাঙালীর কাছে আজো মহাসম্পদ শুধু নয়, প্রেরণারও উৎসস্বরূপ। এক কথায় বলা যায়, এ যুগের গীতিকবিতাগুলি মান ও রসমাধুর্যে শুধু বাংলাসাহিত্যের নয় সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেরই সম্পদবিশেষ। বাহুল্যবোধে উদাহরণ-উদ্ধৃতি পরিহার করছি।

আর আমরা তো জানি, গীতিকবিতা কথাটির অর্থ গান ও কবিতার সংমিশ্রণ। ইংরাজি সাহিত্যে একে বলা হয় Lyric (সঙ্গীতমূলক কবিতা বীণাযন্ত্রের বা Lyre সহযোগে গীত হোতো বলে নামকরণ হয়—Lyric)। আসলে কবিরা মনের ভাবকে প্রকাশ করেন শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের মনোহারী রূপের অলঙ্করণে। বিশিষ্ট কাব্য-সমালোচক এ্যাবারকোম্বে তাঁর 'The Idea of Great Poetry' গ্রন্থে বলছেন :

"I will call it compendiously 'Incantation', the power of using words so as to produce in us a sort of enchantment, and by that I mean a power not merely to charm and delight, but to kindle our minds into unusual vitality, exquisitely aware both of things and of the connections of things".

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ প্রেরণাব্যতিরেকে শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারাপ্রবাহও বাঙলা-বাঙালীর কাব্য ও সঙ্গীত রসধারায় মূল্যবান অবদান যুগিয়েছে, যেমন কিনা চট্টগ্রামের আল-ওয়াল ও রোসাঙ্-এর কবিসমাজের সহজ-সরল কিন্তু হার্দ্র কাব্যসম্পদের কথা আমরা ভুলতে পারি না।

বাংলাসাহিত্যের মধ্যযুগের আলোচনায় ছেদ টানার পূর্বে কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য সম্পর্কে অল্প কিছু বক্তব্য নিবেদন অবশ্য প্রয়োজনীয়। ঈশ্বর গুপ্তকে বাংলাসাহিত্যের 'জেনাস্' বলা হয়। গ্রীকদেবতা জেনাসের (যাঁর নাম থেকে জানুয়ারী মাসের উৎপত্তি) দুটি মুখের একটি গতদিনের দিকে, অপরটি অনাগত দিনের দিকে। ঈশ্বর গুপ্তও তেমনি বাংলাসাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলের কবি। তাঁর কবিপ্রতিভার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয়। আবৃত্তিযোগ্যতার বিচারে তাঁর সেই কবিতাগুলিই উল্লেখ্য যাদের নিরাবরণ ভঙ্গিতে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কিন্তু সুপরিচিত বিষয়সমূহে (যেগুলি কাব্যের রাজদরবারে সাধারণত ছাড়পত্র পায় না) অসাধারণ কাব্যমহিমা আরোপিত হয়েছে। 'আনারস', 'এণ্ডাওয়ালা তপ্‌সা মাছ', 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য', 'পাঁঠা' প্রভৃতি কবিতাগুলির সৌন্দর্য যেন সদ্য খনি থেকে তোলা সোনা। উদাহরণস্বরূপ "পাঁঠা" কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হোলো—

"রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি গলে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গখাড়া ছাড়াছাড়া লোমেলোমে ঝোপ॥
... ...
চারিপায়ে ছাঁদ দিয়া তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোকা গন্ধ শুঁকে॥
শুধু যার পেট ভ'রে পাঁঠারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি কাছে থাকে বাঁধা॥
সাদাকালা কটারূপ বলিহারি গুণে।
শতপাত ভাত মারি ভ্যাভ্যা রব শুনে॥"

কবিতাটিতে শুধু ছাগমাংসের প্রতি কবির আসক্তিই নয়, পাঁঠার রূপমহিমা, অবয়ব-বিন্যাস, কণ্ঠস্বর সমস্তই সহজ সরল কিন্তু নিখুঁতরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যা সু-আবৃত্তির দ্বারা অনাবিল কৌতুকরসসৃষ্টিতে অসাধারণ সার্থকতালাভ ঘটাবে। বর্ষা-

ঋতুবিষয়ক ঈশ্বর গুপ্তের নয়টি কবিতা আছে। এর মধ্যে "বর্ষা" শীর্ষক কবিতাটিতে ঋতুপতি বর্ষা-রাজের রূপ-বর্ণনা অপূর্ব :

গগনের সিংহাসনে, বসিলেন হৃষ্টমনে
তিমিরের মুকুট মাথায়।
পবন প্রবল অতি, পূর্বদিকে করে গতি—
দিবানিশি চামর দোলায় ॥
... ...
সবুজ মেঘের দল ঢলঢল ছলছল,
হতবল প্রবল অনিলে।
স্থিরচক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাবা গায়,
আস্তিন হয়েছে তার ঢিলে ॥
সোনার দামিনী হার, গলায় দুলিছে তার,
আহামরি কত শোভা তায়।
শেফালিকা প্রস্ফুটিত অতিশয় সুশোভিত,
জরির লপেটা জুতা পায় ॥

—আবেগ-ঋদ্ধ বর্ণনার মধ্যে 'সাটিনের কাবা গায়', 'জরির লপেটা জুতা পায়' ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ রসিকতা প্রস্ফুটনে কবিতার পাঠকের চেয়ে আবৃত্তিকারের দায়িত্ব যে অনেক বেশী তা বলাই বাহুল্য।

পূর্বকথন-(গ) : **পূর্বকথন-(খ) এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পরূপে বাংলা আবৃত্তির গঠমানতার ইতিবৃত্তের রূপরেখা।**

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নবজাগরণের জোয়ারে বাংলাসাহিত্যের আধুনিক যুগেরই সূচনা হোলো না, আধুনিক বাঙলাকাব্যের বিচিত্রগামী ধারাপথেরও উৎসমুখ উন্মুক্ত হতে শুরু করল। এর একটা কারণ অতি অবশ্যই শিক্ষিত বাঙালীর ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও স্বাঙ্গীকরণ মানসিকতা। ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের পথিকৃৎ তরুণ কবি অধ্যাপক ডিরোজিওর উদাত্ত-অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি শুধুমাত্র হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরই নয়, সে যুগের সকল শিক্ষিত বাঙালীকেই আকর্ষণ করেছিল, উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করেছিল ইংরেজি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ক্লাসিক কবিতার ধ্বনিমাধুর্য, ছন্দপ্রকরণ ও শিল্পব্যঞ্জনার স্বাঙ্গীকরণপ্রয়াসে। স্বল্পায়ু ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের একই গুণবত্তা ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় কাব্যপাঠে ও কবিতা-আবৃত্তির বুদ্ধিদীপ্ত, মননভূয়িষ্ট ও হার্দ্রপ্রয়াসে বাঙালী শিক্ষিতজনদের একই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ও অন্যান্য সমৃদ্ধ সাহিত্যের নবমূল্যায়নসহ রসাস্বাদনে উন্মুখ ও তন্নিষ্ঠ করে তোলে। অধ্যাপক রিচার্ডসন বিশ্বাস করতেন উপযুক্তভাবে কবিতা-আবৃত্তি দ্বারাই কবিতার প্রকৃত তাৎপর্য ও সৌন্দর্য শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তে সঞ্চারিত করা যায়, নিছক কবিতাপাঠে এ কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি বলতেন—"কবিতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার উর্ধ্বে তুলে দিতে পারে। জগতের পরিচিত সাধ-আহ্লাদের অতীত এক চিরন্তন অভিনব আনন্দস্বর্গে উন্নীত করতে পারে। এ যেন এক ধরনের ধর্মই—কবিরাই প্রকৃতির পুরোহিত।"

তথাকথিত নাস্তিক রিচার্ডসনের (এবং তার পূর্বে ডিরোজিওর) এই কাব্য-ধর্মবোধ বাঙলায় পরবর্তী প্রজন্মের অন্তরে রোপণ করে ছিল বাঙলাকবিতার শিল্পসম্মত আবৃত্তিবোধের বীজ। এবং বলাইবাহুল্য, এই শিল্পসম্মত আবৃত্তিবোধবীজ যাঁর কণ্ঠে প্রথম অঙ্কুরিত হল তিনি সর্ব-অর্থে বিদ্রোহীকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সুতরাং, সঙ্গীতানুষঙ্গবিচ্ছিন্ন, বলিষ্ঠ কাব্যাবয়বসমৃদ্ধ এবং উচ্চাদর্শ ও আবেগ-অভিব্যক্তি-সমুজ্জ্বল বিষয়ালঙ্কারে সুসমন্বিত বাঙলাকাব্যরচনার প্রকৃত ভগীরথ হলেন মাইকেল মধুসূদন। স্বল্পায়ু সৃষ্টিজীবনে (মাত্র দশ/বারো বছরের) বহুমুখী উচ্ছল ও উদ্দীপ্তপ্রয়াসে অমিত্রাক্ষর ছন্দ, নাটক, প্রহসন, গীতিকবিতা, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্যের আদর্শে

মেঘনাদবধকাব্য, সনেট প্রভৃতির দ্বারা আমাদের সাহিত্যসংস্কৃতির ভাণ্ডারকেই সমৃদ্ধ করেন নি, আবৃত্তির আধুনিক রীতিনীতির রূপরেখার সঙ্কেতসূত্রও নির্দেশ করে গেছেন তিনি। সুতরাং, বিভিন্ন ভাষার কাব্য-আবৃত্তিতে সুনিপুণ শিল্পী মধুসূদনকে বাঙলার প্রথম আবৃত্তিশিল্পরুচির অগ্রদূতকবি অভিধায় অভিহিত করা সর্বার্থে বিধেয় বলে মনে হয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনিব্যঞ্জনাই বাঙলা কবিতার পাঠভূমি থেকে আবৃত্তির মুক্তাকাশে বিচরণে বাঙালীকে তদ্বিষ্ঠ করেছে এবং স্বভাবতই এই ছন্দে রচিত সর্বপ্রথম বাঙলা-আবৃত্তিযোগ্য কাব্য মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। অনেকেই অবগত আছেন, কাব্য বা নাটকরচনাকালে মধুসূদন প্রতিটি শব্দ-বাক্য-পঙক্তি বার বার আবৃত্তি করতেন এবং পরিপূর্ণ শ্রুতিসন্তোষলাভ করা পর্যন্ত রচনার পরিবর্তন ও সংশোধন কাজ করে চলতেন। এমনকি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকর্মপ্রসঙ্গে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহীদের সঙ্গে আলোচনায়, লিখিত চিঠিতে তিনি আবৃত্তিসচেতনতার বিষয়ে পুনঃপুনঃ অবহিত করতেন। নাটকের সংলাপরচনায় আবৃত্তির ছন্দব্যবহারের আবশ্যকতা অনুধাবন করেই তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্ণধারদের বলতে পেরেছিলেন—"যতদিন বাঙলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন না হবে ততদিন বাঙলা নাটকের উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং আমাদের ভাষায় এই ছন্দ-প্রয়োগ সম্ভব কিনা তা আমি প্রমাণ করে দেখাব।"—সত্যিই শুধু দেখিয়েছিলেন নয়, পরন্তু প্রখর নাট্যবোধ ও আবৃত্তিসচেতনতার জন্যই বাঙলা নাটক ও নাট্যের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনিই সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেন। তিনটি পত্রাংশ (মূল ইংরেজি ভাষায়) বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করা যাক:—

(১) দেশীয় সামাজিকবৃন্দের সংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব ও ব্যবহারে বিরক্ত মধুসূদন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন—"I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, by something of a foreign air about my Drama ; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters maintained, what care you if there be a foreign air about the thing ? ...Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and modes of thinking ; and that it is my intention to throw off the fetter forged for us by a service admiration of everything Sanskrit".

(২) জাতীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা ও প্রয়োগ পরিকল্পনার পথিকৃৎরূপে নিজের রচিত দুটি সার্থক প্রহসনের ("বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রেঁা" ও "একেই কি বলে সভ্যতা"—১৮৫৯) তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—"I half regret having published those two things. You know that as yet we have no established National Theatre, I mean, we have not as yet got a body of sound classical dramas to regulate the National taste, and therefore we ought not have farces."

(৩) তিলোত্তমাকাব্য প্রকাশিত হবার পর শ্রীরাজনারায়ণ বসু ও শ্রীকেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন: "Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank Verse)...My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune",... "The form of verse in which this drama is written if well-recited, sounds as much like prose as English Blank Verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression".

প্রকৃতপক্ষে গবেষকের প্রমাণসিদ্ধ-আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও নিষ্ঠায় মধুসূদন রিজিয়াকে নিয়ে ইংরেজিতে নাট্যকাব্য রচনা দ্বারা যে সৃষ্টিশীল জীবনের সূচনা করেন তা 'এ্যাংলো-স্যাকসন এ্যাণ্ড দি হিন্দু' গ্রন্থ রচনার মধ্যে দিয়ে গ্রীকনাট্যসাহিত্যের প্রতি সুগভীর আস্থাপ্রকাশ করে সংস্কৃত, গ্রীক ও ইংরেজীতে রচিত শেকস্‌পীয়রের উদ্ভিন্নমান নাট্যভাবনার পরিশীলিত ফসলরূপে কৃষ্ণকুমারী নাটকের রচনাকে সার্থক করে তোলে। মধুসূদনের নাট্যচেতনা অভিনয়-যোগ্যতাকেই নাটকের মানদণ্ডরূপে মেনে নিয়েছিল বলেই পাশ্চাত্য উপাদানগুলিকে প্রাচ্যভাবনায় নবরূপায়িত ও মূল্যায়িত করে মরুমায়াভিভূত মধুকবি নাটকের খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে চিন্তান্বিত থেকে সারাজীবন ধরেই জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্নকে সানুরাগে লালন করেছিলেন।

সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হোলো প্রচলিত পয়ার, ত্রিপদী, পাঁচালী, লাচাড়ী ছন্দে গ্রথিত এলায়িত বাক্‌বিন্যাসযুক্ত কলাকৃতি পরিহার করে কাব্যে ওজোগুণ, ধীরোদাত্ত এবং গৌরবসমুন্নত ধ্বনির প্রবর্তনা। পূর্বকথন (খ)-এ আমরা উল্লেখ করেছি যে মধুসূদন বাঙলা চতুর্দশপদাবলীর প্রবর্তক হলেও চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে অজস্র চতুর্দশপদী কবিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিক কথা, কিন্তু মধুসূদনের চতুর্দশপদাবলী রচনা চতুর্দশ শতাব্দীর ইটালীয়ান কবি পেত্রার্ক-এর (১৩০৪-১৩৭৪ খৃষ্টাব্দ, যাঁকে সনেটের জন্মদাতা বলে অভিহিত

করা হয়) সনেট রচনার সুনির্দিষ্ট নিয়মবদ্ধ মিলের রূপানুসরণে (কখখক+কখখক)+ (গঘঙ+গঘঙ) অথবা (গঘঙ+ঘগঙ) সম্পন্ন হয়েছে যা পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যে সার্থক সনেটরচয়িতাদের (রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ) কেউই অনুসরণ করেন নি।

মধুসূদনের এই বৈশিষ্ট্য শুধু সাহিত্যরসিক ও সমালোচকদের নয়, আবৃত্তিকারদেরও স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

মধুসূদন প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হোলো, তাঁর সমগ্র রচনায় অন্তত ষাট শতাংশ (গদ্য ও পদ্য) আজো আবৃত্তি-উপযোগিতায় সমুজ্জ্বল।

তাই, পথিকৃৎ-মধুসূদনের বাঙলাকাব্য ও নাট্যরচনায় মৌল-পরিবর্তন-প্রয়াস ব্যর্থ তো হয়নি, পরন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে তাঁর প্রবর্তিত ধারাপথকে অনুসরণ না করে পারেন নি। এ যুগের বাঙলা কাব্য ও নাটকের গতিপ্রকৃতির বিস্তৃত বিবরণ ও বিশ্লেষণ আমাদের আলোচনায় কাঙ্ক্ষিত ও প্রাসঙ্গিক নয়, তবু বলা প্রয়োজন যে, মধুকবির পূর্ব ও পরবর্তী প্রায় সকলেই (প্রধানত রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র) সাধ্যমত নতুন পরীক্ষানিরীক্ষায় তৎপর না হয়ে পারেন নি।

"ওরে, এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল্"—মঞ্চে আগত নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উদ্দেশ্যে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের অমোঘ-নির্দেশ। কিন্তু—কেন এই নির্দেশ?

সংলাপ-আবৃত্তিশিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে স্বর-প্রক্ষেপণের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ করার চেষ্টা হোতো এই এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলার মধ্যে দিয়ে এবং এ কাজের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি গিরিশচন্দ্র প্রায়ই স্বয়ং করতেন না, কারণ তাঁর অবসর (এবং বোধহয় ধৈর্যেরও) খুবই অভাব ছিল। ফলে, তাঁর অভিন্নহৃদয় নাট্যসুহৃদ, বন্ধু ও সহ-অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীকেই এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হোতো। অর্ধেন্দুশেখর স্ব-ভাবে ছিলেন ধীর-স্থির, পরমত সহিষ্ণু এবং বিশেষ করে নতুন শিশিক্ষুদের কাছে অভিভাবকস্থানীয়। ফলে, গিরিশ-নির্দেশিত যে কোনো মঞ্চনাট্য-প্রযোজনার খুঁটিনাটি বিষয়ে অর্ধেন্দুশেখরের সহজ-সরল-প্রাঞ্জল ব্যাখ্যানই সে-যুগের সকলশ্রেণীর মঞ্চসংশ্লিষ্ট মানুষের কাঙ্ক্ষিত ছিল। শোনা যায়, গিরিশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র প্রসিদ্ধ-নট সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) পিতা গিরিশচন্দ্রের কাছে প্রত্যক্ষভাবে নাট্যশিক্ষাগ্রহণ করতে ভয় পেতেন। পিতা কর্তৃক নাট্যপাঠ বা মহলার সময় নেপথ্যে থেকে সব কিছু শুনে নিতেন এবং পরে অর্ধেন্দুশেখরের নিকট পূর্ব-শ্রুতজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগবিদ্যা আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হতেন।

নাট্যশিক্ষক গিরিশচন্দ্রের আরো দুটি সাদামাটা কিন্তু অব্যর্থ-নির্দেশ শিশিক্ষুদের জন্য বরাদ্দ ছিল :

(১) "ঘুগ্‌নীচাটা গলা বের করিস্‌নে। ও গলায় ডায়লগ্‌ বল্‌লে শ্রোতারা কানে আঙুল দেবে রে।"

(২) "অভিনয় করতে গেলে বুদ্ধ্‌-ভুতুম্‌ হয়ে যা। নিজের শরীর ও মনটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তোর মধ্যে নাটকের চরিত্র ও তার আচরণ দাঁড়াবে কোথায় রে? আর যদি দাঁড়াতেই না পেলো তা'লে নাটকের চরিত্র না দেখে তোকে দেখার কি দায় পড়েছে রে দর্শকদের?"

একদা বাগবাজারের সৌখীন নাট্যদলের গুটিকয় মধ্যবিত্ত বাঙালী ছোকরা পাওা গিরিশ ঘোষের মুখে উপরোক্ত গোদাবাঙলায় চলতি নির্দেশগুলি প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বঙ্গরঙ্গমঞ্চের গ্যারিকরূপে সম্মানিত নট-নাট্যকার নির্দেশকরূপে প্রবীণ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের অধীত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাট্যবিদ্যার দেশীয় স্বাঙ্গীকৃত অভিজ্ঞতালব্ধ মূল্যবান পরামর্শ। ঘুগ্‌নীচাটার লালসামণ্ডিত মানসিকতায় কোনো মানুষেরই সুন্দর তো নয়ই, স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরই বজায় থাকে না। ফলে, সে সময়ে বেরিয়ে আসা কণ্ঠস্বর দিয়ে নাটকের কোনো চরিত্রের সংলাপাবৃত্তিই সত্য হয়ে তো ওঠেই না পরন্তু বিকৃতরূপ পায়, সুতরাং, স্বাভাবিক সংলাপ-আবৃত্তির জন্য প্রাথমিক চাহিদা হোলো সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপণ-শিক্ষা। আর, বুদ্ধ্‌ভুতুম হয়ে যাওয়ার অর্থ হোলো অভিনয়কালে নিজের নিজত্ব সাময়িকভাবে অন্তত ভুলে গিয়ে অভিনীত চরিত্রের খুঁটিনাটি বিষয়ে গভীরভাবে মনঃসংযোগ দ্বারা বিশ্লেষণ-প্রবণ হয়ে ওঠা যার ফলে পারিপার্শ্বিক বাস্তব-ক্রিয়াগুলিতে বুদ্ধ্‌ অর্থাৎ নিজের অহংবোধবর্জিত হয়ে সহজভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো। বলাই বাহুল্য, এ জাতীয় মনঃসংযোগ বা কন্‌সেনট্রেশন দ্বারাই অভিনীত চরিত্রের অভিনয় (সংলাপ-আবৃত্তি) শ্রোতাদের নিকট সত্য হয়ে ওঠে।

সুতরাং, সাধারণভাবে বলা যায় যে, একশো বছর আগে বাঙলা-আবৃত্তির রূপরেখার ধ্যানধারণা ও প্রয়োগের এই ছিল সাদামাটা চেহারা। বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পথিকৃৎ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের হয়তো অনেক দোষ ছিল কিন্তু সেই দোষের ভাগের চেয়ে সে যুগের অসুবিধাগুলি ছিল বহুগুণে বেশি প্রবল। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন অভিনেতা এবং সমাজের উপেক্ষিতা অবজ্ঞাতা বারবনিতাদের মধ্যে থেকে হঠাৎ-পেয়ে-যাওয়া অভিনেত্রী নিয়ে সামাজিক নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বিরূপতা-বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র-অপমান-লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে এবং সর্বোপরি বিদেশী শাসকদের সন্দেহ-সংশয়কে সুকৌশলে কাটিয়ে গিরিশচন্দ্রকে বাঙলানাট্য রচনা-প্রযোজনা-পরিচালনায় সর্ববিধ দুঃসহ দায়দায়িত্বের ভার বহন করে সব্‌কিছুর বনিয়াদ

তৈরীর ঘুঁটে-মজুরীর অর্থহীন অপ্রিয় কাজ করতে হয়েছে—এটা যেন আমরা ভুলে না যাই। স্বভাবতই, ভয়েস-ট্রেনিং ও ন্যাচারাল অ্যাকটিং-এর চিন্তাভাবনাকে সে যুগের মানুষদের উপযোগী করে তাঁকে গোদাবাঙলাতেই উপরোক্ত নির্দেশ জারী করতে হয়েছিল।

অবশ্য, উনিশের শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রায় সূচনাপর্ব থেকেই স্কুল-কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব বা ঐ জাতীয় অন্যান্য অনুষ্ঠানে ছাত্রাছত্রীরা মূল ইংরেজি বা সংস্কৃত কবিতা বা নাটিকার অংশবিশেষ ছাড়াও মধুসূদনের সনেট বা অন্যান্য কাব্যাংশ, বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের অংশবিশেষ বা ঐ জাতীয় অন্য কোনো কবির রচনা থেকে শিক্ষকমহাশয়দের তত্ত্বাবধানে আবৃত্তি করতেন। অর্থাৎ বাংলা আবৃত্তির এই কালটি (শৈশবকাল !) ছিল মুখ্যত শিক্ষালয় সংশ্লিষ্ট সামাজিকানুষ্ঠান-ভিত্তিক।

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের নট-নাট্যকার-পরিচালকরূপে নানান কর্মজ্ঞানপ্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা যতখানি ওয়াকিবহাল ঠিক ততখানি কিম্বা ততোধিক বিস্মৃত স্ব-ভাবে কবি গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে। অথচ এই স্ব-ভাব কবিপ্রকৃতিই বাঙলা নাট্যসাহিত্যে তাঁকে চিরস্মরণীয় আসনে স্থাপন করেছে তাঁর অবিস্মরণীয় ও অভিনব গৈরিশছন্দের প্রবর্তনার জন্য। বহুবিচিত্র নাট্যবিষয়বস্তুগুলি তাঁর স্বকীয় ছন্দযাদুস্পর্শে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। গুণগতবিচারে ঈশ্বর গুপ্ত ও মধুসূদনের ছন্দসচেতনতা থেকে স্বতন্ত্র হয়েও গৈরিশছন্দের প্রধান গুণ হোলো বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং চিত্রকল্পব্যঞ্জনা। বলাই বাহুল্য, এই বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও চিত্রকল্পব্যঞ্জনার প্রকৃত পরিস্ফুটন একমাত্র সু-আবৃত্তির দ্বারাই সম্ভবপর। একটিমাত্র উদাহরণ উল্লেখ করা যাক :

(১) গিরিশচন্দ্রের ম্যাক্‌বেথ অনুবাদ থেকে—[শেক্‌সপীয়রের মূল নাটকের প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য : মরুভূমি, বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎচমক, তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ]

১ম ডাকিনী। দিদিলো, বল্‌না আবার মিল্‌ব কবে তিনবোনে ?
যখন ঝর্‌বে মেঘা ঝুপুরঝুপুর,
চক্‌চকাচক্ হান্‌বে চিকুর,
কড়্ কড়াকড়্ কড়াৎ কড়াৎ ডাক্‌বে যখন ঝন্‌ঝনে ?

২য় ডাকিনী। যখন বাধ্‌বে, মাত্‌বে, হার্‌বে,
জিন্‌বে, থাম্‌বে লড়াই রণ্‌রণে।

৩য় ডাকিনী। চিকিচিকি ঝিকিমিকি, ডুবুডুবু হবে চাকি,
লড়াই কি আর থাকবে বাকি ?

১ম ডাকিনী। কোন্‌খানে বোন্ কোন্‌খানে, বোন্ কোন্‌খানে ?
ঠিকঠাক্ ব'লে দেলো, যেতে হবে কোন্‌খানে ?

২য় ডাকিনী। চুষ্‌ণো রাঁড়ীর মাঠে যাব।
৩য় ডাকিনী। ম্যাক্‌বেথেরে দেখা দেব, ঘাপ্‌টি মেরে এককোণে।
১ম ডাকিনী। যাই যাই যাইলো—দিদি, ডাক্‌ছে মেনী ল্যাল্‌নেলে;
২য় ডাকিনী। পাঁদাড় থেকে ডাক্‌ছে বোড়া,
কোলা ঐ ক্যার্কা জিব্‌টা মেলে।
৩য় ডাকিনী। আয় যাই চ'লে, আয় যাই চ'লে, আয় যাই চ'লে।
সকলে। ভাল মোদের কালো, মন্দ মোদের ভাল
আঁদাড় পাঁদাড় আনাচ্‌-কানাচ্‌ ঘুরে বেড়াই চল্‌।

শেক্‌সপীয়রের শব্দবিন্যাস (Diction), প্রকাশভঙ্গি (Style), অন্তর্নিহিতভাব (Spirit) এবং ছন্দ (Verse) পর্যন্ত স্বাঙ্গীকরণ করে ভাষান্তরিত করা অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। গিরিশের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল কারণ তিনি কেবল ইংরেজি ভাষায় নাটক মর্ম দিয়ে শুধু বুঝতেন তাই নয়, নাট্যালয়সংশ্লিষ্ট নাট্যরীতিতেও তিনি ছিলেন ধুরন্ধর। অনুবাদক গিরিশচন্দ্রের কর্মকৃতির বিশ্লেষণে অমরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন :

"মনে পড়ে, একজন শিক্ষকমহাশয়ের লেখায় দেখিয়াছি, তিনি স্যার আশুতোষকে বলিয়াছিলেন, 'আমরা পার্সিভালের ছাত্র। তাঁর কাছেই ম্যাক্‌বেথ পড়া। পার্সিভাল সাহেব আমাদের পড়িয়েছিলেন—

'A sailors wife has chestnuts in her lap,
And munch'd and munch'd and munch'd :

Notice the M-sound in the second line, it being an echo to the sense (the sound of mastication).

গিরিশচন্দ্র ঘোষ এর অনুবাদ করেছেন :

'এলো চুলে মাল্লারমেয়ে—
বসে উদোম গায়,
ভোর কোঁচড়ে ছেঁচাবাদাম
চাকুম্‌ চাকুম্‌ খায়।'

আশ্চর্য! মূলের সে M-sound অনুবাদে 'ম'-কারে অবিকল অনুকৃত হইয়াছে।

এইরূপে ম্যাক্‌বেথ বইখানার অষ্ট-পৃষ্ঠে দেখি, গিরিশ-প্রতিভা যেন ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। আরম্ভেই ডাকিনীদের সেই বাগবৈখরীশব্দ ঝরা—'যখন ঝর্‌বে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর।' মেঘে এই 'আ'কার যে কবি দিতে পারেন, তিনি সামান্য শাব্দিক নহেন। 'ডুবুডুবু হ'বে চাকি,—লড়াই কি আর থাক্‌বে বাকি?' গিরিশচন্দ্রের ডাকিনীরা

সূর্যদেবকে 'চাকি' বলে' শেক্স্‌পীয়রের ডাকিনীদের উপর চাপান দিয়াছে। —ইহা শুনিয়া গুণগ্রাহী আশুতোষ প্রশংসায় উচ্চহাসি হাসিলেন।"

বলাই বাহুল্য কবি গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব ছন্দচাতুর্যের আরো অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর পৌরাণিক নাটকের সংলাপ রচনায়। প্রসঙ্গত তাই বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গিরিশ-নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সু-আবৃত্তির অনুশীলন অত্যাবশ্যক।

কবি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে আর এক পাশ্চাত্যশিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত নাট্যকার কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কথাও প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য বলে মনে করি। দ্বিজেন্দ্রলালের মন্দ্র (১৯০২), স্বপ্নভঙ্গ থেকে উদাহরণস্বরূপ আট-আট মাত্রার প্রবহমান দ্বিপদী পঙ্‌ক্তির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি—

"...... পড়ে গেছে যবনিকা ;
সাঙ্গ অভিনয়, সাঙ্গ ক্ষুদ্র মধুর নাটিকা ;
সমাপ্ত সাবিত্রীসীতাকৃষ্ণা-উপাখ্যানভাগ,—
উদার গভীর প্রেম, নিঃস্বার্থতা, আত্মত্যাগ—
পরহিতব্রতে, সাম্য, সহিষ্ণুতা, নিত্য জয়
ধর্মের ;—সমাপ্ত আজি উপকথা অভিনয়।...
পাঠক গিয়াছ ভুলি মধুর চরিতাবলি
সেই সব পৌরাণিক ? দিয়াছ কি জলাঞ্জলি
ভক্তি, বিশ্বাসে ও স্নেহে ?......তবে কিবা কাজ
গাহিয়া সে গান যাহা শুনিবে না। যদি আজ
ওই সব অতীতের, অসত্যের, কল্পনার,
থাকুক অতীত-গর্ভে, তাহা গাহিব না আর।...
দিব সত্য যত চাহো ; উনবিংশ শতাব্দীর
শেষভাগে সভ্যতার তীব্রালোকে, জানি স্থির
অন্য গান লাগিবে না ভালো। তবে থাক্ সব,
সে করুণ, সে গম্ভীর, সে সুন্দর গীতরব,
সে গভীর প্রশ্ন ;—সেই জীবনের দুঃখসুখ
লুকায়ে নিভৃতে শুদ্ধ এ হৃদয়ে জাগরূক।"

গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার দীর্ঘ উদ্ধৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য রচনার গদ্যধর্মিতার মধ্য দিয়ে বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে অসাধারণ অর্থব্যঞ্জনার প্রকাশ। ছন্দের প্রকৃতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের চেয়ে উদ্ধৃতি কার্যকরী বলেই (**Example is better than precept**) উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হোলো।

গিরিশচন্দ্রের প্রাসঙ্গিক মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক। অনেকেই অবগত আছেন যে, আজ পর্যন্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চে লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকায় শ্রীমতী তিনকড়ি দাসীর অভিনয়কৃতিত্ব দ্বিতীয়রহিত। অথচ ব্যক্তিগতজীবনে প্রায় অক্ষরজ্ঞানহীনা শ্রীমতী তিনকড়ি গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ শিক্ষাদানে এমনই অভিনয়-প্রতিভার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যে সে যুগে আগত অনেক বিশিষ্ট পাশ্চাত্য নাট্যবিশেষজ্ঞগণও তাঁকে বিলেতের রঙ্গমঞ্চে মিসেস্ সীডন্‌স-এর সঙ্গে তুলনা করে ক্ষণজন্মা প্রতিভার অধিকারিণীরূপে স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেন নি। আসলে পাশ্চাত্যশিক্ষায় সুশিক্ষিত গিরিশচন্দ্রের লেডী ম্যাক্‌বেথ চরিত্রের খুঁটিনাটি বিষয়ে (আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংলাপ-উচ্চারণে সম্ভ্রান্তভঙ্গি ইত্যাদি) অসাধারণ শিক্ষাদানের গুণেই ব্যাপারটা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৭৫ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর (দানীবাবু, বিনোদিনী, তিনকড়ি, অমরেন্দ্রনাথ প্রমুখ) খ্যাতকীর্তি হয়ে ওঠার পেছনে গিরিশ-অর্ধেন্দুশেখরের অসাধারণ শিক্ষাদানপদ্ধতির অবদানের ফল আমাদের মনে রাখতে হবে। আর একথা তো অনেকেরই জানা যে মধুসূদনের মতো নটগুরু গিরিশচন্দ্রও সারাজীবন ধরে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের আবশ্যকতা সম্পর্কে বহুবার বলে গেছেন।

প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কবি গিরিশচন্দ্রের শিক্ষণপ্রয়াসের কোনো কিছুই রেকর্ড করে না-রাখার ফলে সে যুগের আবৃত্তির (নাট্যসংলাপ ও কাব্যের) প্রয়োগরূপরেখার কোনো বাস্তব নিদর্শন-প্রমাণই আমরা রক্ষা করতে পারিনি, এটা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক তো বটেই, লজ্জাকরও। সে যুগে আমাদের দেশে মাইক্রোফোনের চল্ ছিল না। ফলে আবৃত্তিকারের তো বটেই, যে কোনো প্রয়োগ-শিল্পীরই জোরালো, তীক্ষ্ণ ও সুরেলা কণ্ঠের রেওয়াজ করতে হোতো। যতদূর জানা যায়, সাধারণ মঞ্চের বাইরে একক কবিতাপাঠ ও আবৃত্তির স্বতন্ত্র প্রয়াস-প্রচেষ্টা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকেই শুরু হয় এবং এ ব্যাপারে পথিকৃৎ-এর মর্যাদা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের। সম্প্রতি ইণ্টারন্যাশনাল কালচারাল সেণ্টারের সৌজন্যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান-আবৃত্তি-বক্তৃতা প্রভৃতির রেকর্ড-সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করেছেন (এপর্যন্ত ৫৬টি আইটেম সংক্ষিপ্ত ইতিহাসসহ তালিকাবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়) তা থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের অংশবিশেষ এবং তাঁর রচনা 'সোনার তরী' কবিতার আবৃত্তি সর্বপ্রথম রেকর্ড করা হয় ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে। জনৈক এইচ্. এম. বোস্ যিনি সে যুগে বিখ্যাত গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ীরূপে এবং রবীন্দ্রসুহৃদ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছেন তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এডিশনের ফোনোগ্রাম মেশিনের একটি জোগাড় করে প্রথম তাম্রফলকে কবিকণ্ঠে ঐ দুটি বিষয় রেকর্ড করেন।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় কবির কণ্ঠ ছিল উদাত্ত, জোরালো এবং সুস্পষ্ট ও সুউচ্চারণসমৃদ্ধ। কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে এক সাহিত্যসভায় (পূর্বেই বলেছি সে যুগে মাইক্রোফোনের চল্ ছিল না) দেড়ঘণ্টা বক্তৃতা করার পর শ্রোতৃমণ্ডলী এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে খালি গলায় বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গাইতে গিয়ে কবির কণ্ঠ এমন সাংঘাতিকভাবে জখম হয় যে পরবর্তীকালে বহু চিকিৎসার পরও তাঁর নিজস্ব কণ্ঠসম্পদ আর ফিরে আসেনি। শ্রীবোসের ফোনোগ্রাম মেশিনে (যা তখন এইচ. বোসের 'টকিং মেশিন' বলে বিখ্যাত ছিল) রেকর্ড করার আনুষঙ্গিক ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও সুতীক্ষ্ণ, সুস্পষ্ট, সুরেলা কিন্তু পাতলা রবীন্দ্রকণ্ঠের এই আবৃত্তিতে এক স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পের ব্যঞ্জনা সর্বপ্রথম অনুভূত হয়। এবং এই কারণে পরবর্তীকালের সমস্ত বাঙালী আবৃত্তিকারই স্বতন্ত্র প্রয়োগ-শিল্পরূপে বাঙলা আবৃত্তির পথিকৃৎরূপে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সংগ্রহে এপর্যন্ত প্রায় ৩০টি কবিতা-আবৃত্তির (বাংলা-ইংরেজি-সংস্কৃত ভাষায়) রেকর্ড আছে এবং ভবিষ্যতে আরো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। সুতরাং, পরিশীলিত কণ্ঠসম্পদের সুস্পষ্ট উচ্চারণ, সংযত আবেগ, স্বরপরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, আত্মগত ভঙ্গি ও বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেষণার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাঙলা আবৃত্তিকে স্বতন্ত্র শিল্পগুণান্বিত করেছেন—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। তাছাড়া গ্রামোফোন রেকর্ড মারফৎ আবৃত্তির সর্বপ্রথম ব্যবসায়িক প্রচারের ব্যবস্থাও হয় তাঁর কণ্ঠ-বিধৃত রেকর্ডগুলির মধ্য দিয়ে।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) প্রমুখ দিক্‌পাল অভিনেতার কণ্ঠাভিনয়ের রেকর্ড শুনলেও সে যুগের সুরেলা নাট্য-সংলাপাবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২০-র পর আমাদের দেশে রেকর্ডিং-প্রথার উন্নততর চলন সুরু হয় এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা রেডিও স্টেশনের প্রবর্তনার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং শিশিরকুমার, প্রভাদেবী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র প্রমুখের গদ্যে ও পদ্যে কবিতা এবং নাট্যসংলাপাবৃত্তির কিছু ডিস্ক ও রেডিও রেকর্ড আমরা পেয়েছি। কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তির একটিমাত্র রেকর্ডেরই এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গেছে। নজরুলের দীপ্তকণ্ঠের কথা সমসাময়িক অনেকের মুখে শোনা গেলেও এই রেকর্ডে কিন্তু তার প্রমাণ মেলে না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতেও আবেগ-মথিত কবি যে শোক কবিতাটি রচনা করেন কলকাতা বেতারকেন্দ্রের তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ খুব দ্রুত সেটি রেকর্ড করে আকাশবাণী থেকে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের রচিত কবিতাতেই (আজি হতে শতবর্ষ পরে···) নিজের কবিতা ভবিষ্যৎ-পাঠকগণ গ্রহণ

করবেন কিনা সে সম্পর্কে সংশয়িত ছিলেন কিন্তু তাঁর সে সংশয় মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বাঙলা আবৃত্তি বর্তমানে শুধু বিস্ময়কর উন্নতিই লাভ করেনি, বহুবিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে জনপ্রিয়ও হয়েছে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকেও জানা যায় রবীন্দ্রকণ্ঠে যে-সমস্ত আবৃত্তি ও গান আমরা শুনতে পাই তার সবগুলিই ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এক দুর্ঘটনায় স্থায়িভাবে গলরোগে আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের। এ সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য হোলো—"রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের যে ভাঙা গলাটি বাজায় সবাই—সেটা আদৌ রবীন্দ্রনাথের আসল কণ্ঠস্বর নয়। তিনি যখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তাঁর স্বরভঙ্গ ঘটেছে এটি সেই সময়ের গলা। এ রেকর্ড আমি আর শুনতে পারি না। এটি তাঁর গলা নয়। এতে আমাকে ভীষণ খারাপ লাগে। তাঁর গলা তিন তিনটে octave-এ অনায়াসে ঘোরা-ফেরা করত। একটা থেকে আর একটা octave-এ অনায়াসে চলাচল করত। তাঁর গলা রিনরিনে ছিল ঠিকই কিন্তু এমন মেয়েলি গলা ছিল না। [আসলে সেসময় রেকর্ডিং সিস্টেম তো এত উন্নত ছিল না তাই আসল গলা তাঁরা রেকর্ড করতে পারেন নি।"] শ্রীগোপালচন্দ্র রায় লিখিত "ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক গ্রন্থেও সৌমেন্দ্র-নাথের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

কবি নিজেও তাঁর কণ্ঠের রোগ সম্পর্কে সারাজীবনই সচেতন ছিলেন তবু বহু বিচিত্র অজস্র রচনায় মত্ত না হলেও দেশেবিদেশে আবৃত্তি-গান করতে ভালবাসতেন। এমনকি শোনা যায় পরিণতবয়সে শারীরিক অসুস্থতার সময় নিজের কবিতাগুলি আবৃত্তি করে শোনানোর জন্য ডাঃ রাম অধিকারী ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে ডেকে পাঠাতেন। চিত্রিতা দেবীর রচনা থেকে জানা যায় যে, কবিতা পড়ার কথা বললেই কবি ঠাট্টা করে বলতেন "আব্রিত্তি করতে হবে নাকি?" তখনকার দিনে (আমার মনে হয় এখনো) অনেকেই ঋকারের যথার্থ উচ্চারণ করতেন না। 'অমৃত'কে 'অম্রিত', 'পিতৃ'কে 'পিত্রি', ইত্যাদি উচ্চারণ করতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের ঐ সহাস্য ব্যঙ্গ। উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা আবৃত্তির ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক বলে তিনি মনে করতেন যদিও বাঙলা উচ্চারণে সংস্কৃত-উচ্চারণবিধি প্রয়োগের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। শুধু তৎসম শব্দগুলিকে তিনি অন্তত কবিতায় সেইভাবেই রাখতে উপদেশ দিয়েছেন কারণ আঞ্চলিক কথ্যভাষার তাগিদে তার বিকৃতি ঘটানো তাঁর একেবারেই মতবিরুদ্ধ ছিল। তাছাড়া বহু তদ্ভবশব্দ বাঙলাভাষায় স্বীকৃতি পেয়েছে। শুধু সংস্কৃত থেকে নয়—আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, এমনকি ফরাসী ও ইংরেজির বহু শব্দও বাঙলায় স্থান পেয়েছে, যেগুলিকে বাঙলারূপেই ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ আর একটি জিনিসে জোর দিতেন—কথার অন্তর্নিহিত সুরের ওপর। আমরা যখন বাক্য গঠন করে ভাব প্রকাশ করি, আমাদের বাক্যের মধ্যে থেকে

নানাভাবের অভিব্যক্তি ঘটে; বিশেষ কথার মধ্যে বিশেষ সুর ধ্বনিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মত ছিল—আবৃত্তিতে এই সুরকে সহজভাবে ফোটানো। আবৃত্তির টান, স্বরের উচ্চনীচতা (Modulation) এবং Volume প্রভৃতির সঙ্গে এই সুরটা রক্ষা করা উচিত, কারণ এ সুর ফুটে উঠেছে প্রাণের ভিতরকার তাগিদে।

প্রখ্যাত সংগীতবিশারদ শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর এক রচনায় বলেছেন—"তিনি আবৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং যখন আবৃত্তি করতেন তখন তাঁর অসামান্য পার্সোনালিটিতে মুগ্ধ হলেও আবৃত্তির আর্টকে অ্যাপ্রিসিয়েট না করে গত্যন্তর ছিল না। প্রতি বছরই তিনি অন্তত দু-একবার কলকাতায় আসতেন এবং শুনিয়ে যেতেন তাঁর নবরচিত সংগীত ও কবিতার আবৃত্তি। যতবারই তাঁর আবৃত্তি শুনেছি ততবারই আমার মনে হয়েছে—তাঁর ধারাটি ছিল সুচিন্তিত এবং কাব্য ও অভিনয়ের সমন্বয় করেছিলেন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে। এই কাব্য ও অভিনয়ের সমন্বয়সাধনই বলাবাহুল্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কারণ এইখানেই অভিনয়ের সঙ্গে আবৃত্তির মূল পার্থক্যটিও ধরা থাকে।" প্রসঙ্গত শ্রীমিত্র আরো বলেছেন—"অভিনয়ের সঙ্গে সংলাপ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং সংলাপকে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করতে পারলেই অভিনয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কিন্তু আবৃত্তির উদ্দেশ্য খানিকটা ভিন্ন। তাকে কাব্যের চাহিদা পূরণ করতে হয়। আবার অভিনয়ের আঙ্গিকও বহুলাংশে আনতে হয়, কেননা একাধিক সেন্টিমেণ্ট আবৃত্তির সঙ্গে জড়িত। অতএব আবৃত্তিকে অভিনয়ের সহধর্মী করে তুললে তা সর্বাঙ্গসুন্দর হবে না এবং সেটি আবৃত্তি হিসেবে স্বতন্ত্র অর্থ হয়েও উঠবে না।...আর একটি গোষ্ঠি আছেন যাঁরা আবৃত্তি চর্চাকরণেও উপযুক্ত পরিমাণে কাব্যের টেকনিক সম্বন্ধে অবহিত নন। ফলে ছন্দের দিকটা শিথিল হয়, এবং যদিও তাঁদের অনেকের ধারণা তাঁরা ছন্দকে রক্ষা করেন কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় তাঁদের আবৃত্তিতে অনেকক্ষেত্রে গুরুতর ছন্দপতন ঘটেছে। অভিনেতাদের মধ্যেও অনেকে ইচ্ছা করেই ছন্দের শাসন মানেন না বা তাঁদের মতে পদান্তে মিল বা ছন্দটা আবৃত্তির ক্ষেত্রে বাধা হওয়া উচিত নয়। কবিতার সেন্টিমেণ্টকে তুলতে তাঁরা কাব্যপাঠকে ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকেন। নজরুল ছাড়া প্রায় কেউই ছন্দের ধার ধারতেন না। তাঁরা থিয়েটারের অভিনয়ের মত কবিতার আবৃত্তি করে যেতেন।...এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের সবাইকার পার্থক্য। অভিনেতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথও কম সার্থক ছিলেন না। তাঁর আবৃত্তি-ভঙ্গিতেও অভিনয়ের বহুল আঙ্গিক ফুটে উঠত, কিন্তু যেখানেই তিনি দেখেছেন যে ছন্দের একটা দাবী রয়েছে সেখানেই তিনি সে চাহিদা পূরণ করেছেন। আবার সঙ্গীতও তাঁর আবৃত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, বহুক্ষেত্রে তিনি গানের তানকেও তাঁর কাব্যপাঠের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। যেমন "মদনভস্মের পর" কবিতাটির উল্লেখ

করা যায়। এই কবিতা পঞ্চমাত্রিক ছন্দে রচিত। কবি এটি আবৃত্তি করতে গেলে নিশ্চিতভাবেই পাঁচমাত্রার ছন্দকে রক্ষা করতেন। আবৃত্তিটি হোতো এইরকম :

প ন্ চ । শ রে । দ গ্ ধ । ক রে ।
ক রে ছ । এ কি । স ন ন্ধ্যা । সী ০ ।
বি • শ্ব । ম য় । দি য়ে ছ । তা রে । ছ ড়া য়ে । ০ ০ I
ব্যা কু ল । ত র । বে দ না । তা র ।
বা তা সে । ও ঠে । নিঃ সা । সি ০ ।
অ ০ শ্রু । তা র । আ কা শে । প ড়ে । গ ড়া য়ে । ০ ০ II

বর্তমানে বহু আবৃত্তিকার এই ছন্দরাখাকে বাহুল্য মনে করেন। হয়তো অনেকের সাধ্যেও কুলোবে না, কিন্তু এটা সত্য যে এই ছন্দটিকে রক্ষা না করলে কবিতাটির আবেদন মাঠে মারা যাবে। শেষ বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে কবি ঝুলন কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন ত্রিমাত্রিক ছন্দে, সঙ্গে ছিল খোলের সঙ্গত এবং শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের নৃত্য। আবৃত্তি যে কতবড় একটা আর্ট হয়ে উঠতে পারে এটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্য পাঠ করতেন তখন তার ভিতরেও একটা সমতা বা ব্যালেন্স থাকতো, একটা ছন্দের একাংশকে বিলম্বিত করে অপর অংশকে সংক্ষিপ্ত পাঠ করা তাঁর রীতিবিরুদ্ধ ছিল। অর্থাৎ কীভাবে পাঠ করলে সমস্ত গদ্যাংশটির ভারসাম্য রক্ষিত হবে সেটি তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে সমুচিতভাবে নির্ধারণ করতেন, আবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে এটিও একটি মস্তবড় চিন্তা। গদ্য যে কেবল পরিমিতিবিহীন লম্বমান বাক্যসমষ্টি নয়, এটি তিনি পাঠ করে শ্রোতাদের উপলব্ধি করবার সুযোগ দিতেন।

বর্তমানে কবিতায় পদান্তের অনুপ্রাস থাকে না। আমরা এই রীতিকে 'গদ্যকবিতা' বলে থাকি। কিন্তু এই আখ্যায় যখন কবিতাকে বোঝানো হচ্ছে তখন এই 'টারমোনলজি'টিই রাখা গেল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ছন্দের শেষে মিল না-হয় না থাকল কিন্তু তার কাব্যধর্ম, যাকে লিরিক্যাল কোয়ালিটি বলে সেটার অভাব ঘটবে কেন ?...

...রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির ভঙ্গি এ যুগে ঠিক বোঝানো যাবে না। আমরা যাঁরা তাঁকে সাক্ষাৎভাবে বহুস্থানে আবৃত্তি করতে শুনেছি তারাই উপলব্ধি করতে পারব তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় এবং কত দিকে। রবীন্দ্রনাথ কখনও ওভার-অ্যাকটিং করতেন না অথবা তাঁর গলার কোনো কৃত্রিম ভঙ্গী ছিল না। তাঁর গলায় অবশ্য একটা কম্পন ছিল সেটা সহজাত এবং কথা বলবার বা উচ্চারণের কতগুলি বিশেষ ভঙ্গী ছিল যেটা পারিবারিক সূত্রে পাওয়া। অনেকে এসব ধরনকে বলতেন ঠাকুরবাড়ির ধারা। পড়বার সময় তিনি একটা চাঞ্চল্য অনুভব করতেন এটা ঠিকই কিন্তু তা স্বতঃস্ফূর্ত

ছিল। কখনও সংযমকে অতিক্রম করতেন না।……তাঁর কণ্ঠে আবৃত্তি যেন একটা সুসমঞ্জস পার্সোনালিটি থেকে তার সমস্ত আবেদন নিয়ে বিচ্ছুরিত হতো। কাব্যের লিরিক, ছন্দ, অন্তর্নিহিত বিশেষ বিশেষ ব্যঞ্জনা, রস, ভাবসুষমা, ভাবসাম্য, আবেগ, স্বচ্ছন্দ গতি, লাবণ্য, শৃঙ্খলা—সবগুলির প্রতি তিনি সমান সুবিচার করতেন, একটিও তাঁর কণ্ঠে অবহেলিত হোত না। শাপমোচন নৃত্যনাট্যের আখ্যানভাগ ছিল গদ্যে রচিত। সেই গদ্যাংশ যখন তিনি পাঠ করতেন তখনও তার থেকে একটি নিবিড় কাব্যসুষমা সুস্নিগ্ধভাবে সঞ্চারিত হোত। এই ছিল আবৃত্তির মূলমন্ত্র……।"

শ্রদ্ধেয় শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্রের সুদীর্ঘ বক্তব্যের উদ্ধৃতি আমরা এখানে ব্যবহার করলাম একটিমাত্র কারণে এবং তা হলো—একজন প্রত্যক্ষদর্শী রসিক শ্রোতার অভিজ্ঞতার আলোকে আবৃত্তিকার রবীন্দ্রনাথের একটি সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত করা। উপরোক্ত বক্তব্যের পরিচয়বাহী (এখনো পাওয়া ও শোনা যায়) প্রসঙ্গত মাত্র দু'টি রেকর্ডের উল্লেখ করছি—

(১) 'প্রান্তিক'-এর কবিতা 'যেদিন চৈতন্য মোর…'-এর রবীন্দ্র-কণ্ঠে আবৃত্তির রেকর্ড, হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ নভেম্বর ১৯৩৯-এ রেকর্ড করেছিল।

(২) 'বলাকা' কাব্যের 'অজানা সে দেশ……' কবিতার আবৃত্তি যা আকাশবাণী রেকর্ড করে এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়।

সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে আমরা বোধহয় একটা কথা উল্লেখ করতে পারি যে পরবর্তী বড়-ছোট, ভালো-মন্দ সকল আবৃত্তিচর্চাকারেরই ধাত্রীভূমি হলো রবীন্দ্র-আবৃত্তি।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে আবৃত্তিচর্চার শ্রেষ্ঠ পুরোধারূপে যাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ী। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে যোগদান করার ৮।৯ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে এবং ২।৩ বছর পরে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যিনি আবৃত্তিকার ও অভিনেতারূপে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নজর কেড়েছিলেন, প্রশংসালাভ করেছিলেন এবং পরমস্নেহের উপাধি 'নটরাজ' রূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। আমরা অনেকেই জানি যে, শিশিরকুমার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই নাট্যাভিনয়ে পারদর্শী হয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেন কিন্তু অনেকেই জানেন না বাংলা-সংস্কৃত-ইংরেজি তিনটি ভাষাতেই তিনি অসাধারণ সুন্দর আবৃত্তি করতে পারতেন এবং কলকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট আয়োজিত আন্তঃকলেজ আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়ান হন।—এ গৌরবের অধিকারী সমসাময়িককালে আর একজন ছিলেন, তিনি ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(এবং পরবর্তীকালে পাঁচের দশকের প্রথমে বর্তমান নিবন্ধকার প্রায় অনুরূপ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন)। বিশ ও ত্রিশের দশকের রসিক মানুষ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন তাঁদের অনেকের কাছেই শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ও শিশিরকুমার পরস্পর পরস্পরের আবৃত্তি শুনতে অসাধারণ উৎসাহী ছিলেন। আমার নিজের দেখা শিশিরকুমার প্রযোজিত পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অন্তত চারটি নাটকের কথা বলতে পারি (রীতিমত নাটক, সধবার একাদশী, মাইকেল মধুসূদন, জীবনরঙ্গ)—যার বেশ কিছু অংশের প্রধান আকর্ষণ ছিল শিশিরকুমারের উদাত্ত কণ্ঠে ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত আবৃত্তি। মধুসূদনের অধিকাংশ এবং রবীন্দ্রনাথের অন্তত পাঁচশো কবিতা শিশিরকুমারের কণ্ঠস্থ ছিল। আলাপচারী শিশিরকুমারের সান্নিধ্যে যাঁরা আসার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন তাঁরাই জানেন বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে শিশিরকুমার আবৃত্তি করতেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে ১৯৫১-৫২ সালে তাঁর কাছে মাঝে মাঝে আবৃত্তি শিক্ষার সৌভাগ্যলাভ করেছি এবং তার ফলে যে অভিজ্ঞতালাভ ঘটেছে তা আমার সারাজীবনের আবৃত্তিচর্চার মূল্যবান পাথেয় হয়ে আছে।

প্রসঙ্গত যুগান্তর পত্রিকার ২৭শে আষাঢ় ১৩৬৬-র সংখ্যায় প্রকাশিত শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক, যা থেকে জানা যাবে যুগপৎভাবে কাব্যপ্রেমিক ও রবীন্দ্রপ্রেমিক শিশিরকুমারের এক অন্তরঙ্গ পরিচয়:

"আমাদের বন্ধু কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। সেই মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে এতটা বিচলিত করেছিল যে, তিনি একটি সুদীর্ঘ শোক-কবিতা রচনা না করে পারেন নি। রামমোহন লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত এক বৃহৎ শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন তাঁর অতুলনীয় উদাত্তকণ্ঠে সেই কবিতায় সদ্য-স্বর্গত কবির প্রতি নিজের প্রাণের আকুতি নিবেদন করলেন, তখন সভাস্থ সকলেরই চোখ অশ্রুজলে ভিজে উঠেছিল।

সভাভঙ্গের পরে শিশিরকুমার বাইরে এসে দাঁড়ালেন এবং তারপর পথ দিয়ে ধাবমান একখানা মোটরগাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ভাবাভিভূত স্বরে বললেন: দেখ হেমেন, আমি এখনি ঐ মোটরের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করতে পারি।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: সেকি শিশির, কোন্ দুঃখে?

শিশিরকুমার বললেন: দুঃখে নয় ভাই, আনন্দের আতিশয্যে।

আমি অধিকতর বিস্মিত হয়ে বললাম: আনন্দের আতিশয্যে, আত্মহত্যা?

গদগদ কণ্ঠে উত্তর হলো: হ্যাঁ, ঠিক তাই। রবীন্দ্রনাথ যদি প্রতিশ্রুতি দেন

আমার মৃত্যু হলেও এই রকম একটি অপূর্ব কবিতা রচনা করবেন, তাহলে সেই আনন্দে মোটরের তলায় পড়ে আমার আত্মহত্যা করতেও আপত্তি নেই।

কোনো অভিনেতা তো দূরের কথা, কোনো বাঙালী কবির মুখেও আমি এমন কথা শোনবার আশা করিনি।"

মনে হয় এ ব্যাপারে আর কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিগত পরিচয় ও অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—শিশিরকুমারের মুখমণ্ডল ছিল বড়, ইংরেজিতে যাকে বলে **square face**। হাঁ-মুখটিও ছিল সেই অনুপাতে বড়। কথা বলার সময় হাঁ-মুখ বিস্তৃত করতেন তিনি। প্রতিটি শব্দ গোটা গোটা করে স্পষ্ট উচ্চারণ করতেন। আবৃত্তি করার সময় কিছুটা সুর ব্যবহার করতেন কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর জোয়ারী কণ্ঠস্বর, আবৃত্তি করার সময় (বিশেষ করে মধুসূদনের সনেট) তিনি চোখ বুজে আত্মমগ্ন হয়ে যেতেন। তিনি বই দেখে আবৃত্তি করা নিষেধ করতেন, বিশেষ করে শিশিক্ষুদের।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করে শিশিরকুমারের ওপর বক্তব্য নিবেদন শেষ করব। মধুসূদন-গিরিশচন্দ্রের মতো শিশিরকুমারও আমৃত্যু জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের স্বপ্ন দেখে গেছেন এবং তাঁর পরিকল্পিত জাতীয় নাট্যশালায় আবৃত্তিশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলা আছে। ১৩৪৮ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায় "রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক এক প্রবন্ধে শিশিরকুমার খেদ করে বলেছিলেন :

"বাংলাদেশে শক্তিশালী নটের কখনো অভাব হয়নি, কিন্তু প্রতিভাবান সূক্ষ্মদর্শী নাট্যকারের অভাব হয়েছে।…বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যকারের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, নট ও প্রয়োগকর্তা।

…আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, আমাদের রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে ঘটে উঠল না। আমি তাঁকে এদিকে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাধা এসেছে নানাদিক থেকে।…যেভাবে শেক্স্পীয়ার, ইবসেন বা হাউটম্যান তাঁদের জাতীয় নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যমঞ্চ সবল করে তুলবার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেইভাবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যদি নিজের দেশের নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্য পুষ্ট করবার সম্ভাবনা ঘটে উঠত, তাহলে আজকে বাংলার জাতীয় নাট্যমঞ্চ সুসম্পন্নপ্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারত।" নাট্যজীবনের প্রথম দিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ শিশিরকুমারের জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের স্বপ্নকে সার্থক করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু ১৯২৪-এ দেশবন্ধুর আকস্মিক অকালপ্রয়াণ তা ব্যর্থ করে দেয়। সারাজীবন ধরে লালন করেও নাট্যাচার্যের সে স্বপ্ন সার্থকতালাভ করেনি, হতাশা ও অভিমানে তিনি অনেকের কাছেই তাঁর বেদনার কথা প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁরই পূর্ব-উদ্ধৃত নিবন্ধের শেষে তিনি তাই সখেদে বলেছেন: "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন হলে আমরা পেতাম অপূর্ব সমৃদ্ধ নাট্যসাহিত্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রঙ্গশালা ও সমাজের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যে আবয়বিক সম্বন্ধ সেটা সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত হতে পারতো। কিন্তু হায়, এত কিছু হবার পূর্বেই—

"রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা
রিক্ত হলো সভাতল, আঁধারের মসী-অবলেপে
স্বপ্নচ্ছবি মুছে যাওয়া সুষুপ্তির মতো শান্ত হলো
চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনী-সংকেতে।"

•

প্রসঙ্গত বিশশতকের বাংলা কবিতার প্রকরণগত পালাবদল সম্পর্কে কিছু বক্তব্য নিবেদন করা যাক। কবিতার পালাবদল প্রসঙ্গ আলোচনা এইজন্য যে বাংলা আবৃত্তি মুখ্যত কবিতানির্ভর। উনিশের শতকের মধ্যভাগে পয়ার, ত্রিপদী লাচাড়ী ছন্দের গীতিকবিতার আবরণ ভেঙে মধুসূদন বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে সংস্কৃতবহুল গুরুগম্ভীর ভাষার প্রয়োগে মিলটন-কল্প সমুদ্রগর্জনের প্রবল আবেগের সৃষ্টি করেন। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের লিরিক কবিতার অপরূপ দেহলাবণ্য এবং প্রথম দিকে তাঁর প্রবর্তিত ভাষা-ছন্দ-মিলের সূক্ষ্ম পেলব সুষমা এবং পরের দিকে পঙ্‌ক্তিভাঙা ছন্দ বা মুক্তক পয়ারের নাট্যরসান্বিত গুণাবলী এবং তারও পরে কাজী নজরুলের কবিতার দৃপ্ত বাচনভঙ্গি ও সহজাত নাটকীয়তা বাঙালী কবিতাপাঠক ও আবৃত্তিকারদের পক্ষে আদরণীয় বিষয় ছিল এই শতকের দুয়ের দশক পর্যন্ত।

তিরিশের দশক থেকে আবেগের জোয়ারে ভাঁটার সূত্রপাত হলো। কবিতা পূর্বের চেয়ে অধিকতর ব্যক্তিগত অনুভব ও বোধের ফসলরূপে দেখা দিল এবং বোধের মধ্যেও প্রত্যক্ষভাবে সংমিশ্রণ ঘটানো হলো বুদ্ধির কিম্বা মননের। ক্রমশ কবিতা হয়ে উঠতে লাগলো অসরল (কখনও কখনও বেশ জটিল) এবং মৃদুভাষ। কবিতার শরীরে একদিকে ছন্দ ও মিলের অসদ্ভাব ঘটতে লাগলো, অন্যদিকে লাবণ্যময় কাব্যিক শব্দ-সমষ্টির পরিবর্তে দৈনন্দিনের কথ্য-সংলাপের স্থান হলো কাব্যভাষারূপে যা আবার কখনো কখনো জটিল মননের জারকে জারিত কিছুটা উদ্ভট ধরনের। কল্লোলযুগের কবিদের কথাই বিশেষ করে বলছি। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিরাটত্বকে অস্বীকার করার তাড়নায় 'নতুন কিছু করো রে ভাই' মানসিকতা নিয়ে তথাকথিত আধুনিকতার উদগ্রতা ও যুক্তিহীন অক্ষম রবীন্দ্র-বিরোধীতার প্রক্ষেপ ঘটল। অবশ্য বছর দশেক পরেই পালা-বদলের উদগ্রতা স্তিমিত হয়ে এলো, দেখা দিল নতুন মোড়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-মন্বন্তর-সাম্প্রদায়িক হানাহানি-দেশবিভাগ-উদ্বাস্তু আগমন ইত্যাদি যুগান্তকারী ঘটনার

আবর্তে অত্যাধুনিকতার উন্নাসিকতা ও বিদেশীয়ানার হ্যাংলাপনা পরিহার করে দেশজ মানসে কবিতার শেকড় নামাতে সর্বজনীন আবেগের পটভূমিকায় কবিতার পুনর্বাসনের সূচনা হলো, কবিতা কানে শোনার ও আবৃত্তিযোগ্যতার আবার সমূহ সম্ভাবনাময় রূপে দেখা দিল, ব্যক্তির গণ্ডিকে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও দায়বদ্ধতার অনুভবে উত্তরিত করার প্রয়াস দেখা দিল।

বাংলা কবিতার প্রকরণগত পালাবদলের রূপরেখা সম্পর্কে বক্তব্যকে আর দীর্ঘ করার বোধহয় প্রয়োজন নেই।

অভিনেতা আবৃত্তিকাররা ছাড়া কল্লোল-পূর্ব ও কল্লোলযুগের কবিদের মধ্যে যাঁরা কাব্যপাঠ ও আবৃত্তিতে উৎসাহী ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। কল্লোল-পরবর্তী যুগের কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অরুণাচরণ বসুর নাম করতে হয়। কিশোর-কবি সুকান্তও ভালো আবৃত্তি করতেন। তিরিশের দশকের অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মাধুর্য ও লাবণ্যভরা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে আবৃত্তি সে যুগে প্রখর উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তেমনি রাধামোহন ভট্টাচার্যের গাঢ় মর্যাদাসম্পন্ন কণ্ঠস্বরের আবৃত্তি সত্যিই প্রাণবন্ত ছিল। সর্বোপরি বাংলা আবৃত্তিজগতে আর একজনের বিশেষ অবদানের কথা সসম্ভ্রমে স্বীকার করতে হয়—তিনি হলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, কিছুটা ভঙ্গিপ্রাধান্য এবং স্বরক্ষেপণে আনুনাসিকতার প্রাবল্য থাকলেও প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা আবৃত্তির জনপ্রিয়তা আনয়নে তাঁর বিশেষ অবদান স্মরণীয়। বাংলা আবৃত্তির জনপ্রিয়তা আনয়নে আর একজনের অবদান স্মরণ করা প্রয়োজন। তিনি হলেন কবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-র মাধ্যমে (তখন আইনত প্রায় নিষিদ্ধ) ছোটো ছোটো স্কোয়াডে গণসঙ্গীত ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান করতেন। সময়টা ১৯৫০-৫১। অবশ্য ইতিমধ্যে বহুরূপী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৯৪৮, ১লা মে)। বহুরূপীর প্রাণপুরুষ শ্রীশম্ভু মিত্রের স্ব-ক্ষেত্র নাটক এবং আবৃত্তি। গ্রামে গঞ্জে এককভাবে শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি-অনুষ্ঠান তখনকার দিনে ছিল বিশেষ সাড়া জাগানো ব্যাপার। বহুরূপী প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই প্রত্যেক সভ্য-সভ্যা একক, দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তির নিয়মিত চর্চা করতেন। (ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান নিবন্ধকার পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বহুরূপীর নিয়মিত সভ্যপদ লাভ করে তদানীন্তন আবৃত্তিচর্চার অংশভাগী ছিলেন)। বটুকদার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র) লেখা সুদীর্ঘ কবিতা 'মধুবংশীর গলি'-র এবং রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতার শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে আবৃত্তি সে যুগে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। তাই, সাম্প্রতিককালে স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পরূপে এবং শক্তিশালী গণশিল্পমাধ্যম-

রূপে আবৃত্তিচর্চায় পথিকৃৎ-এর সম্মান অবশ্যই শ্রীশম্ভু মিত্রের। শ্রীমিত্রের অনুষ্ঠান-প্রেরণায় প্রাণিত হয়ে কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলের অনেক যুবক-যুবতী তৎপর হয়েছিলেন বিজ্ঞানভিত্তিক আবৃত্তিচর্চায়। বর্তমান নিবন্ধকার, কবি আবুলকাশেম রহিমুদ্দিন এবং গরিফা-নৈহাটি অঞ্চলের আরো কয়েকজন সংস্কৃতিমনা যুবক-যুবতী গরিফা কেশব সেন পাঠাগারকে কেন্দ্র করে সাহিত্য-নাটক-আবৃত্তি-চর্চায় উদ্দীপনাময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন 'সংস্কৃতি রূপ-নাট্যম্' সংস্থার মাধ্যমে ১৯৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে। সম্প্রয়াত বর্তমান পশ্চিমবাংলার লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক সমরেশ বসুকে প্রথম সাহিত্যিক-সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে গরিফার সংস্কৃতি রূপ-নাট্যম্ সংস্থা অভিনব পন্থায় একক-দ্বৈত-সমবেত আবৃত্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের, বিমলচন্দ্র ঘোষের ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাবলম্বনে। [প্রসঙ্গত আর একটি তথ্য নিবেদন করা প্রয়োজনীয়। পাঁচের দশকের প্রথমদিকে নজরুল পরিবার বাস করতেন মানিকতলা অঞ্চলের ভাড়াকরা একটা ফ্ল্যাট বাড়ীতে। কবিকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়ার কথাবার্তা হচ্ছে। 'নজরুল নিরাময় সমিতি'র নবীন সদস্যরূপে আমি, রহিমুদ্দিন, মিনতি মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন কবির রচনা আবৃত্তি করে, গান গেয়ে অতি উৎসাহে চাঁদা তুলে বেড়াতাম। প্রবীণদের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দিতেন পবিত্রদা (গাঙ্গুলি)। মাতৃসমা প্রমীলাদেবীর (কবি-পত্নীর) স্নেহের প্রশ্রয়ে আমরা সপ্তাহে ৩/৪ দিন কবির আবাসস্থলে হৈ-চৈ করে কাটাতাম। সানি (কাজী সব্যসাচী) তখনও আবৃত্তিকাররূপে প্রকাশিত হয়নি। আমাদের অতি-উৎসাহে শ্রদ্ধেয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহও ছিল।]

এই শতকের পাঁচের দশকের শেষদিকে বাংলা আবৃত্তিকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব কাজী সব্যসাচী ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে বহুরূপী প্রতিষ্ঠানে থেকে ও পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'রূপকার' প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-রূপে সবিতাব্রত দত্তও অভিনয় এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা আবৃত্তিকে জনপ্রিয় করে তোলায় প্রয়াসী হন। এই সময়ে প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাহিত্যবিদ্‌দের মধ্যে ড. নীহাররঞ্জন রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ভালো আবৃত্তি করতেন (পাঁচের দশকের শেষদিকে নাট্যদল নান্দীকার প্রতিষ্ঠা করার আগে অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আবৃত্তিচর্চায় যথেষ্ট সচেতন প্রয়াসে প্রয়াসী হন। এরপর এককভাবে, ষাটের দশক থেকে শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র, অমুভা গুপ্তা ও প্রদীপ ঘোষ বাংলা আবৃত্তিচর্চার জোয়ারে সামিল হন। (শ্রীঘোষ শুধুমাত্র আবৃত্তিচর্চাতেই এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট তৎপর রয়েছেন)। এভাবে নাম করার বিপদ আছে জানি। কার নাম করব, কার নাম বাদ দিয়ে ফেলব এবং নীটফলস্বরূপ ভুলবোঝাবুঝি বাড়বে তাই ক্ষান্ত হচ্ছি। ষাটের দশক থেকে

একক-দ্বৈত-সমবেত আবৃত্তির যে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিভিন্ন প্রয়াস দেখা দিয়েছে, বলাই বাহুল্য তা নিতান্তই সাম্প্রতিককালের। নিকট সাম্প্রতিককাল সম্পর্কে সমীক্ষার দিন এখনও আসেনি বলেই মনে হয়। এটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তোলা থাক। অন্তত বর্তমান নিবন্ধকারের পক্ষে, তার প্রস্তুত-নিবন্ধে, বিস্তৃত বক্তব্য-নিবেদন বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে না।

দ্বিতীয় ভাগঃ শিক্ষণ অঙ্গীকার, অনুপ্রবেশ, অনুধ্যান এবং অনুশীলন-পর্ব।

(ক) **অঙ্গীকার-পর্ব**। নিছক হুজুগ বা শখ নয়, আবৃত্তিশিক্ষাকে অদম্য অনুরাগে সাধনারূপে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, নিভৃতচারিতার অনুষঙ্গ পার করে আবৃত্তি বর্তমানে একটি অব্যর্থ ও জনচিত্তজয়ী স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পরূপে স্বীকৃত। আবৃত্তিকার হতে হলে প্রধানতঃ প্রয়োজন অনুসরণ ও অনুশীলন, অনুকরণ নয়। অবশ্য যে কোনো শিল্পচর্চায় প্রাথমিক পর্যায়ে অনুকরণ অবাঞ্ছিত নয় বটে, কিন্তু শুধুমাত্র অনুকরণপ্রয়াসে প্রয়াসী মানুষ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। ফলে, অনুকরণের যান্ত্রিকতার দাসত্বে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। অঙ্গীকার-পর্বেই এটা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার, শিক্ষক ও শিশিক্ষু উভয়ের তরফ থেকেই।

(খ) **অনুপ্রবেশ-পর্ব**। যেহেতু আবৃত্তি একটি শ্রমলব্ধ নিষ্ঠাশ্রয়ী সৃষ্টিসুন্দর স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্প, সেহেতু এর ব্যবহারিক প্রয়োগানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎপটের ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য জানা এবং বোঝা অত্যাবশ্যক।

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে: "আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী" অর্থাৎ অনুভূতিসম্ভব শিল্পমাধ্যমে সার্থকতালাভ করতে স্বভাবতই যুক্তিগ্রাহ্য, মননভূয়িষ্ঠ কিন্তু হার্দ্য প্রক্রিয়াগুলিকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—মানুষের সব চিন্তাই অনুভব-এ দানা বাঁধে না। যে কোনো চিন্তা, যুক্তি ও বিশ্লেষণের জারকে জারিত হয়ে তবে অনুভবের স্তরে পৌঁছায় এবং তখনই সেই অনুভূত বিষয়কে শ্রোতার মননে সঞ্চারিত করার চেষ্টা প্রয়োগশিল্পীরা করে থাকেন। আবৃত্তিকারকে এই ধারাবাহিক স্তর সম্বন্ধে অবশ্যই সম্যকরূপে অবহিত হতে হবে। শুধুমাত্র শিক্ষকের বক্তৃতার দ্বারা শিক্ষার্থী এ-বিদ্যা অর্জন করতে পারবেন না। এই প্রয়োগশিল্পে সার্থকতালাভ ঘটে নিয়মিত মনন-অধ্যয়ন-অনুশীলন এবং গবেষণার মধ্য দিয়ে। গত চার দশক ধরে বাংলা আবৃত্তিকে স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পরূপে ভাবা, চর্চা করা, প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগ নেওয়ার যে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে, আগে কিন্তু তেমন ছিল না এটা পরিষ্কারভাবে শুধু মনে রাখাই নয়, বুঝে নিতে হবে। তাই কেন তা ছিল না এবং কেমনটি ছিল, তা জেনে ও বুঝে নেওয়া অত্যাবশ্যক।

আবৃত্তিকার লেখক বা কবি বা অন্য কোনো সাহিত্যিক বা স্রষ্টার এজেন্ট বা

প্রচারক নয়। নিজস্ব অনুভবে ভাবিত হয়ে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় আবৃত্তি করবেন। আবৃত্তির ভঙ্গি, অবয়ব, প্রকরণ স্থিরীকৃত হবে শিল্পের রূপ ও রসের মানদণ্ডে। কারণ, স্বকীয় ভঙ্গিতে বোধযুক্ত আবৃত্তিই সত্যিকারের স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পরূপে গ্রাহ্য হবে, স্বীকৃত হবে। অনুপ্রবেশ-পর্বেই শিক্ষার্থী আবৃত্তিকারকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এই প্রয়োগশিল্পের কার্যকরী সার্থকতা অর্জনে নিয়মিত মনন-অধ্যয়ন-অনুশীলনে নিজেকে সর্বতোভাবে যোগ্য করে তুলতে। তাই আবৃত্তিশিক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুসন্ধিৎসু ও শিশিক্ষু মন, সচেতন কান, যে কোনো ভাবপ্রকাশোপযোগী পরিশীলিত কণ্ঠস্বর, ছন্দ-সচেতনতা, সুস্পষ্ট-অনায়াস-শুদ্ধ উচ্চারণ, সহজাত আবেগ, অনুশীলনসঞ্জাত সহজ, স্বাভাবিক কিন্তু অর্থবহ স্বরক্ষেপণ-প্রকাশভঙ্গি এবং সর্বোপরি বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথাযথ বা সম্যকজ্ঞান। শিক্ষার্থী অবশ্যই পেশাদারী আবৃত্তিকারদের চটকদারী কায়দা বা গিমিকে কখনো বিভ্রান্ত হবেন না—এই আত্মবিশ্বাস উদ্বোধনের ধ্রুবমন্ত্র প্রতিজ্ঞা করতে হবে। সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে নিজের অনুশীলিত কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক প্রয়োগের দ্বারাই আবৃত্তিশিল্পের ভাব ও অনুভূতির প্রকাশ সহজতম ও সুন্দরতম হবে।

(গ) **অনুধ্যান-পর্ব।** যে কোনো কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠি, বক্তৃতা বা অন্য কোনো সাহিত্যবিষয়ই আবৃত্তির বিষয়বস্তু হতে পারে না, সম্ভব নয়। সেজন্য আবৃত্তির বিষয়নির্বাচনে আবৃত্তিকারকে প্রথম থেকেই সজাগ হতে হবে। যেহেতু বিষয়বস্তুর ভাব ও অনুভূতির প্রকাশই আবৃত্তিকারের মুখ্য দায়িত্ব সেহেতু বিবয়বস্তুর অর্থ সর্বপ্রথম অবশ্যই আবৃত্তিকার অবহিত হবেন। বিষয়বস্তুর অর্থ অবহিত হবার পর আবৃত্তিকারকে অবহিত হতে হবে বিষয়বস্তুর বিন্যাসপ্রক্রিয়াগুলির খুঁটিনাটি সম্পর্কে অর্থাৎ চিত্রকল্প, ছন্দ, শব্দের ব্যবহারবৈশিষ্ট্য, উচ্চারণবিধি ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। ধরা যাক, কোনো পেশাদারী আবৃত্তিকারের আবৃত্তি শুনে শিশিক্ষু আবৃত্তিকার ঠিক করলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'দূরের-পাল্লা' কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে আবৃত্তিকারকে সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দ-জাদু গলায় প্রকাশের পূর্বে কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তির চিত্রকল্পগুলিকে মনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে এঁকে নিতে হবে অর্থাৎ ছবিগুলি তিনি, নিজের মনে সম্যকরূপে পরিচিত হলেই, গলার স্বরে সেই ছবিগুলি ব্যঞ্জিত করতে অনুপ্রাণিত হবেন এবং তখনই ছন্দের নিজস্ব দোলায় সেই ছবিগুলি উপযুক্তরূপে স্পন্দিত হয়ে উঠবে বাচনিক প্রকাশ-ভঙ্গিতে।

ছিপ্‌খান্ তিনদাঁড়—
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন্-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।

অথবা

হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচ্‌তেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্‌কে গেলো।
জম্‌জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এলো, রাত্রি এলো।
ঝাপ্‌সা আলোয় চরের ভিতে
ফিরছে কারা মাছের পাছে—
পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকো বাঁধা হিজল গাছে। ইত্যাদি

পঙ্‌ক্তিগুলিতে গ্রামবাংলার যে সহজ-অনাড়ম্বর-স্বাভাবিক ছবিগুলি চিত্রিত হয়েছে সে-ছবিগুলি সম্পর্কে আবৃত্তিকারের যদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে তবে খুবই ভালো, নচেৎ যার এই অভিজ্ঞতা আছে তার কাছ থেকে আবৃত্তিকারকে এই ছবিগুলির নিজস্ব অনুভবস্বরূপ বুঝে নিতে হবে। না নিলে যত কারিকুরিই করা হোক না কেন, তাঁর কণ্ঠব্যঞ্জনায় ঐ চিত্রগুলি তিনি শ্রোতার 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশানো'র কাজটি সম্পন্ন করতে পারবেন না। ছন্দের-যাদুকরের ছন্দের দোলায় শ্রোতা হয়ত দোলায়িত হবেন কিন্তু গ্রামবাংলার মাধুর্যরসে কিছুতেই প্রাণিত হবেন না, এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োগশিল্পীরূপে আবৃত্তিকারের গুণগত ত্রুটি থেকেই যাবে। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। আটটি ছত্রে ভগিনী নিবেদিতাকে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের 'আশীর্বাদ' শীর্ষক পত্র-কবিতাটি হল :

"মাতার হৃদয় আর বীরের বাসনা
মলয়বাতাসে যতো সৌরভ শীতল
পবিত্র মহিমা আর শৌর্য যতো ছিল
পূজার বেদীতে আর্য যজ্ঞের শিখায়,
সকলি তোমারি হোক, কিংবা আরো বেশি
স্ফূর্তি তোমার হোক ছিল না যা আগে,
হও তুমি ভারতের কন্যা মহীয়সী
বন্ধু ও সেবিকা হও আত্ম-নিবেদিতা।"

—এটি ভঙ্গ-পয়ার বা মিশ্র-পয়ার ছন্দে উনিশ শতকের শেষ দশকে রচিত একটি আদর্শ পত্র-কবিতা। পরাধীন ভারতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর সেবাকর্মে আয়ার্ল্যাণ্ডের

বিপ্লবকন্যা মার্গারেট নোবল্ কিভাবে ভগিনী নিবেদিতা হয়ে উঠলেন সে-সম্পর্কে স্বামীজীর সুস্পষ্ট অথচ সহজ-সাধারণ উপদেশগুলি নিটোল কবিতার অবয়বে পরিচিহ্নিত হয়েছে। শিশিক্ষু আবৃত্তিকারকে এ-কবিতা আবৃত্তি করার পূর্বে তাই সমসাময়িক ইতিহাসের পশ্চাৎপট অবশ্যই অবহিত হতে হবে। কারণ, ঋগ্বেদে বলা হয়েছে: "মনসা চিন্তিতং কর্ম ইতিহাসসমন্বিতম্"—সৃষ্টিশীল মানুষের চিন্তিত কর্মের সমন্বিত ইতিহাসকে না জানলে শ্রোতাকে শুধুমাত্র নিজের কণ্ঠস্বর অবলম্বন করে উপযুক্ত বাক্রীতির দ্বারা রসমণ্ডিত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তেমনি কেউ যখন মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের "ঈশ্বরপাটনী" কবিতাটি আবৃত্তি করবেন তখন তাঁকে সহজ সরল পয়ারছন্দোবন্ধে রচিত কাহিনী-কাব্যের প্রতিটি শব্দের, পঙ্‌ক্তির পরিপূর্ণ অর্থরস অবহিত হতে হবে।

"ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যোবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের প্রতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠে ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গানামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।
পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীনজাতি সেখানে কোন্দল॥"

শিশিক্ষু আবৃত্তিকার যদি পাটনীর মতো ব্যবহৃত শব্দের দ্বৈত-অর্থগুলি না জেনে

না বুঝে সহজ সরল বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে আবৃত্তি করেন তাহলে কবির বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সম্যক্ রস-পরিচয় শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবেন না, অর্থাৎ আবৃত্তিতে গুণগত খামতি থেকে যাবে।

(ঘ) **অনুশীলন-পর্ব।** বলাই বাহুল্য, যে কোনো শিল্পসাধকের পক্ষেই অনুশীলন-পর্বটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্বে সততা, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, শৃঙ্খলা-পরায়ণতা এবং সর্বোপরি ধৈর্যগুণের যত ব্যাপক ও সর্বাত্মক বিকাশ হবে, তত বেশী সার্থক ও সুন্দর হবে আবৃত্তির প্রকাশ।

শিল্পের উত্তরাধিকার অর্জনের মধ্য দিয়ে শিল্পী হয়ে ওঠার সার্থকতার চাবিকাঠি অনুশীলনের নিরীখেই স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং উপযুক্ত অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই।

মোট কথা, আমাদের মনে রাখতে হবে আবৃত্তি হচ্ছে অধিগত-বিদ্যা, ধারাবাহিক ও নিয়মতান্ত্রিক অনুশীলনের মধ্য দিয়েই এ ব্যাপারে অধিকার অর্জন করতে হয়। [**It is a habit of the vocal machinery learned through repeated trials (rehearsals), according to the laws of habit formation— Memory : I. M. W. Hunter**]

অন্যান্য দেশে তো বটেই, আমাদের দেশেও প্রাচীন পণ্ডিতগণ আবৃত্তিকর্মে নানান ত্রুটিবিচ্যুতির বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তাঁদের ধ্বনিবিজ্ঞান, উচ্চারণরীতি সম্পর্কে বিস্তৃত অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ আছে :

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং। মাত্রাহীনঞ্চ যদ্‌ভবেৎ॥
যন্মাত্রাবিন্দু। বিন্দু দ্বিতয়ঃ॥
পদপদদ্বন্দ্ব। ছন্দযতি বর্ণাদি হীনঃ॥
প্রবচনবচনাৎ। ব্যক্তমব্যক্তম্॥
মোহাদপঠিতম্। অজ্ঞানতপঠিতম্॥

অর্থাৎ অক্ষরভ্রষ্টতা, ভুলমাত্রায় উচ্চারণ, বিসর্গের অনুচ্চারণ অথবা ভুলভাবে বিসর্গস্থাপনা, সমাস-ছন্দ-যতি-বর্ণ বিলোপসাধন কিম্বা ত্রুটিযুক্ত সংস্থাপন, স্মৃতির অনধিকার প্রবেশ হেতু পূর্বপরিচিত শব্দের ভাবনিরপেক্ষ উচ্চারণ, অস্পষ্ট, অর্ধস্পষ্ট কিম্বা অনুচ্চারিত অক্ষর, অনর্থক উচ্চারণ, প্রাণ বা শ্বাসবায়ু সংযমের ব্যর্থতা থেকে মহাপ্রাণ বর্ণ অল্পপ্রাণ বর্ণ হয়ে যাওয়া কিম্বা অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণে রূপান্তরিত হওয়া (দুধ = দুদ্, গর্দভ = গর্দব, আম = আঁব ; লেবু = নেবু)। এছাড়া আছে কবিতার বিষয়বস্তুকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি না করায় স্বরের প্রকাশে ও স্বরপরিবর্তনে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে বিকৃত রস ও অর্থব্যঞ্জনার পরিবেষণও গর্হিত কাজরূপে কথিত হয়েছে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা একে একে সব বিষয়েই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিবেদন করব।

তৃতীয় ভাগঃ শিক্ষণ—অভিনিবেশ-পর্ব

দ্বিতীয় ভাগ-এ শিক্ষণকাজের ব্যাপারে অনুপ্রবেশ-পর্বে ভূমিকাস্বরূপ যে প্রাথমিক নির্দেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে "আবৃত্তি শিক্ষার জন্য……সম্যকজ্ঞান" তারই খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি ব্যাপারে এবার আলোচনা করা হবে। বলাই বাহুল্য এই আলোচনাই যে কোনো আবৃত্তিশিক্ষণসংস্থায় সাধারণভাবে কিম্বা নির্দিষ্ট সিলেবাস-এর ভিত্তিতে এক-দুই-তিন বা ততোধিক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সিলেবাসের কিছু হেরফের থাকলেও, শিক্ষণবিষয়গুলি প্রায় একই থাকে।

এক। কণ্ঠস্বরচর্চা বা স্বরসাধনা

পাশ্চাত্যদেশসমূহে স্বরসাধনা বা Voice-training-এর জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষণদানের নানান প্রক্রিয়া আছে। তার জন্য নির্দিষ্ট সিলেবাসই শুধু নয় সেই সিলেবাসানুযায়ী নানাবিধ গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকাও সহজলভ্য।

যতদূর জানি, বাংলাভাষায় তিনটি মাত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় যাতে আবৃত্তি বিষয়ে এবং স্বরসাধনা ও উচ্চারণবিধি সম্পর্কে আলোচনা আছে—(১) অভিনয়-নাটক-মঞ্চ: শম্ভু মিত্র; (২) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব: মুহম্মদ আবদুল হাই; (৩) স্বর ও বাক্‌রীতি: ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। এছাড়া সম্প্রতি শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅমিয় চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "বিষয়: আবৃত্তি" শীর্ষক আবৃত্তিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য।

আবৃত্তিবিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা পাওয়া যায় বহুরূপী পত্রিকায় এবং ইদানীংকালে প্রকাশিত 'কৃত্তিবাস', 'ছন্দনীড়' প্রভৃতি আবৃত্তিশিক্ষণ সংস্থাগুলির নিজস্ব পত্রিকায়।

প্রয়াত দুই আচার্য সুনীতিকুমার ও শহীদুল্লাহ সাহেবের সুবৃহৎ গ্রন্থাদি শিক্ষিত পাঠকদের পরিণত অবস্থায় কাজে লাগতে পারে। এই সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কয়েকটি ইংরেজী গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে:— (১) Actors on Acting: T. Cole & H. K. Chinoy; (২) American Standard Acoustical Termology—Newyork, 1951; (৩) Building a Character: C. Stanislavski; (৪) English Composition & Rhetoric: Alexander Bain; (৫) Improvement of Voice & Diction: J. Eisenson;

(৬) Institutes of Oratory : M. F. Quintilian ; (৭) The Throat in its Relation to Singing : Whitfield Ward ; (৮) Voice & Actor : Cicely Berry ; (৯) Voice Production in Singing : Viola Nevina ; (১০) Voice Training & Conducting in Schools : Reginald Jacques ; (১১) What is Rhythm : E. A. Sonnenschein ; (১২) Your Voice ; Douglas Stanley ; (১৩) First Steps in Acting : Samuel Seldon ; (১৪) Rhetoric & Prosody : L. R. Brander ; (১৫) Rules for Actors : J. W. V. Goethe ; (১৬) Fundamentals of Plays Direction : Alexander Dean & L. Carra ; (১৭) Marxism & Poetry : George Thomson ; (১৮) Memory : I. M. W. Hunter.

সংস্কৃত (বঙ্গানুবাদিত) গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) নাট্যশাস্ত্র : ভরত ; (২) সঙ্গীতমকরন্দ : নারদ ; (৩) সঙ্গীত-দামোদর : শ্রীশুভঙ্কর ; (৪) ব্যাকরণ কৌমুদী : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ; (৫) সিদ্ধান্ত-কৌমুদী : ভট্টোজী দীক্ষিত।

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের আলোচনায় উপরোক্ত গ্রন্থাদি থেকে (এবং কিছু কিছু পত্রিকা বা জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে) যদেচ্ছভাবে বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করা হবে এবং বাহুল্যবোধে উদ্ধৃতিচিহ্ন পরিহার করাও হতে পারে)।

আমরা জানি, আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গ সংগীতশিক্ষার জন্য স্বরশিক্ষা ও স্বরসাধনা অত্যাবশ্যক এবং সেই অত্যাবশ্যক শিক্ষাকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া-ব্যবস্থাদি ছিল এবং আছে। সঙ্গীতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও (ভজন, কীর্তন, রবীন্দ্র-সঙ্গীত) স্বরসাধনাশিক্ষা অত্যাবশ্যকরূপে স্বীকৃত। গত চল্লিশ বছর ধরে আবৃত্তি স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পরূপে গড়ে ওঠার ক্রমপর্যায়েও স্বরসাধনার আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করেছেন। যতদূর জানি, কলকাতায় (১১এ নাসিরুদ্দিন রোড) ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠানেই আবৃত্তিশিক্ষাদানের জন্য প্রথম থেকেই নিয়মনিষ্ঠ ব্যবস্থাদি গৃহীত হয় এবং বহুরূপীর প্রাণপুরুষ শ্রীশম্ভু মিত্র নাট্যাভিনয়ের অঙ্গস্বরূপ নিয়মিত আবৃত্তিশিক্ষণের ক্লাসের ব্যবস্থা করেন সভ্যসভ্যাদের জন্য। এর কয়েক বছর পরে প্রয়াত নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অধ্যক্ষতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-বিভাগে নিয়মিত স্বরসাধনার সিলেবাসভিত্তিক শিক্ষণব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

কণ্ঠস্বর কি, সেটা বুঝতে হলে তার বস্তুগত চেহারাটা বুঝে নেওয়া দরকার। এ পর্যন্ত কণ্ঠস্বরের অনুকরণে কোনো কৃত্রিম যন্ত্র তৈরী হয়নি। কলাকৌশলের দিক থেকে Church Organ-এর Single Reed পাইপ নিকটতম উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়। এই

অর্গানের তিনটি অংশ : (১) একটা হাওয়া যন্ত্র, যার মধ্যে হাপরের সাহায্যে পাম্প করা হয়। (২) কম্পন মাপকারী একটা কম্পক বা রীড, যা সমস্ত শব্দের মূল। (৩) একটা অনুকম্পনের আধার বা অনুকম্পক (Resonator), সাধারণ শব্দকে অধিক গুণ বিশিষ্ট করে রূপান্তরিত করা যার কাজ। বায়ুপ্রকোষ্ঠের মধ্যে যে হাওয়া পাম্প করে ঢোকানো হয়েছে সেটা সব সময়েই একটা চাপের মধ্যে থাকে। বেরুনোর একটাই পথ—একটা স্থিতিস্থাপক 'পাত' যাকে "রীড" বা "কম্পক" বলা হয়। বায়ুনির্গমনের যে জোর, তা রীডকে এমনভাবে কাঁপায় যে সরু ছিদ্রপথটি ক্রমান্বয়ে খোলে এবং বন্ধ হয়। এর দ্বারা নিয়মিত পর্যায়ে একই রকম Frequency বা শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করে। ফলে একটা স্থিতিস্থাপক কম্পকের ক্রিয়ায় শব্দের উৎপত্তি হয়। এই যান্ত্রিক কলা-কৌশলের সঙ্গে মানুষের গলার আওয়াজের খানিকটা তুলনামূলক বিচার চলে। ফুসফুস হাওয়ার আধার। শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় হাওয়াকে ভেতরে টানা হয় এবং পরক্ষণেই বের করে দেওয়া হয়। হাওয়া বেরিয়ে আসার পথে শ্বাসনালীতে আড়াআড়ি ভাবে দুটো Elastic Membrane (Vocal Chord)-এ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শব্দের উৎপত্তি ঘটায়। এই ভোকাল কর্ড-ই আমাদের গলায় কম্পক বা রীডের কাজ করে। এর ফলে ভোকাল কর্ডের স্থিতিস্থাপক দিকটা দোলায়িত হয়ে নিয়মিত পর্যায়ে কতকগুলি তরঙ্গের উৎপত্তি ঘটায় যা চাপের ফলে বেরিয়ে আসা হাওয়াটার স-ছন্দে বাধাপ্রাপ্তির ফল এবং এরই ফলে শব্দের জন্ম। সমধর্মিতা এই পর্যন্তই সত্য। অর্গানের Wind Chest-এর ভেতরের হাওয়ার চাপ রীডের ওপর যে কাজ করে ঠিক মানুষের Larynx-এর Vocal Chord নিশ্বাসের চাপেও অনুরূপ কাজ করে। কিন্তু আমাদের ক্ষমতা কিছু বেশী অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করলে নিশ্বাসের জোরটা পরিবর্তন করতে পারি, কম্পনের সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং Vocal Note-এর Intensity এবং Pitch-এর বিস্তৃতি ঘটাতে পারি, যা কোনো বানানো যন্ত্র পারে না। তাই, স্বরসাধনার প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের সকলেরই জানা দরকার যে স্বরসৃষ্টির জন্য তিনটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হলো : (ক) স্বরতন্ত্রীর কম্পন (Vibration of Vocal Chord) ; (খ) স্বরতন্ত্রীর কম্পনসৃষ্টির জন্য শ্বাসনিশ্বাসের প্রযোজ্য শক্তি ; এবং (গ) কম্পনজাত স্বর বহন করার জন্য প্রশ্বাস-নিশ্বাসজাত বাতাস। এই তিনটি বিষয় বুঝতে হলে মানুষের মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের (মুখগহ্বর, নাসিকা, কান, শ্বাসনালী, স্বরযন্ত্র, গলবিল ও সংশ্লিষ্ট স্নায়ু-মণ্ডলী এবং ফুসফুস ও ডায়াফ্রাম) অবস্থিতি ও কার্যক্রমের বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিও অবহিত হতে হবে। আমরা জানি, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রধানত তিনটি প্রকারভেদ আছে—প্রবহমান (Tidal), অবশিষ্ট (Residual) এবং অনুপূরক (Supplemental)। মানুষের কথা বলার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-নির্গমন রীতির অতি অবশ্যই আনুপাতিক

পরিবর্তন ঘটে থাকে। সাধারণত শ্বাস-গ্রহণের সময় অপেক্ষা নিশ্বাস-নির্গমনের সময় বেশী হয়। কারণ নিশ্বাস ধরে রেখে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা একটু একটু ছেড়ে কথা বলা হয়। এর দ্বারা বক্তার কণ্ঠস্বর ঠিকভাবে কাজ করার ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়ে ওঠে। সু-স্বরের জন্য ভালোভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে হলে নাক, মুখ ও গলা খোলা রেখে স্বাভাবিকভাবে গভীর ও পরিপূর্ণরূপে শ্বাসগ্রহণ এবং অবিচলিতভাবে স্বাভাবিক নিশ্বাস ছাড়ার শিক্ষাই হচ্ছে শ্বাস-নিশ্বাসক্রিয়ার ক্ষমতার্জনের প্রয়োজনীয় রীতি। একে বলা যেতে পারে উদরসংক্রান্ত রীতি। বিশেষজ্ঞগণ এ ছাড়াও পঞ্জরাস্থি সংক্রান্ত রীতি, কণ্ঠাস্থি সংক্রান্ত রীতিরও বিধান দিয়েছেন।

আমরা জানি, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়তাদান ও রক্তশোধন করা ফুসফুসের প্রধান কাজ। কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে ফুসফুসই বাগ্‌ধ্বনির উৎপাদক যন্ত্র এবং প্রধান কেন্দ্র। আর ধ্বনির উৎপত্তি ও শ্রুতির দিক থেকে বাক্-প্রত্যঙ্গ-সমূহের মধ্যে ফুসফুসের পরেই স্বরযন্ত্রের **(Larynx)** এবং মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীর **(Vocal Chord)** স্থান। কণ্ঠস্বরভিত্তিক প্রয়োগশিল্প আবৃত্তির ক্ষেত্রে বিচিত্র স্বরভঙ্গি সৃষ্টির প্রয়োজনে বক্ষগহ্বরের নিম্নভাগ ও উদরে বেশি জোর দিয়ে শ্বাসগ্রহণ করা বিধেয়। শ্বাসনিশ্বাসের স্বাভাবিকতা আনয়নের জন্য উদরসংক্রান্ত পদ্ধতিতে শ্বাসগ্রহণে আমাদের দেশে প্রাণায়াম করার যে বিধি আছে, মনে হয়, সেগুলিই শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। শিক্ষু স্বরসাধকের জানা থাকা দরকার তিনটি স্বরস্থানের (বক্ষস্থান, কণ্ঠস্থান, শিরস্থান) ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার বৈচিত্র্যগুলি। অনুদাত্ত বা মন্দ্রস্বর (উদারা), স্বরিত বা মধ্যস্বর (মুদারা), উদাত্ত বা তারস্বর (তারা), কম্পিত (কম্পমান) স্বর এবং উপাংশুভাষ (ফিস্‌ফিস্ করে বলা) ইত্যাদি স্বরের বর্ণবিভাজনগুলিও স্বরসাধকের জানা থাকা ভালো। এছাড়া স্বরের রঙ (**tonal colour**) কি ও কেন এবং স্বর-স্থাপনায় মানসিক বাসনাকে কিভাবে প্রয়োগ করা দরকার তাও স্বরসাধককে জানতে হবে। এবং জানা বিষয়গুলি যত স্বাভাবিক হবে তত বেশী পরিমাণে স্বরসাধক স্বর সৃষ্টির সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করবেন। এক্ষেত্রে একটি মাত্র সাবধানবাণী সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে—স্বাভাবিকতা কখনই কোনো অবস্থাতেই বিসর্জন দেওয়া চলবে না। স্বাভাবিক স্বরসৃষ্টির জন্য ওষ্ঠ ও জিহ্বার প্রচলিত ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করা যেতে পারে ; যেমন—মুখ খোলা রেখে এবং চোয়াল বিশেষ না নাড়িয়ে উচ্চারণ করা :

(অ) কা—কি—কু—কে—কৈ—কো—কৌ—কাপ্।
টা—টি—টু—টে—টৈ—টো—টৌ—টাপ্।
না—নি—নু—নে—নৈ—নো—নৌ—নাপ্।
লা—লি—লু—লে—লৈ—লো—লৌ—লাপ্।

(আ) **হসন্ত ট এবং ল :**

ঘাট্‌, পাট্‌, বাট্‌, ষাট্‌।

বিরাট্‌ — ভরাট্‌ — স্বরাট্‌ — সম্রাট্‌।

দুলাল্‌—বিড়াল্‌ —মশাল্‌।

অম্বল্‌—উজ্জ্বল্‌—কম্বল্‌—সম্বল্‌—ধবল্‌—কুণ্ডল্‌—দজ্জাল্‌।

(ই) কণ্টক্‌—বণ্টন্‌—বন্ধন্‌—কিন্নরী—ভঞ্জন্‌—মন্থন্‌।

ম্লান্‌—শ্লাঘা—শ্লেষ্‌—অম্ল—উল্কা—বল্গা—বিল্ব—মোল্লা।

উল্লাস্‌—কল্লোল্‌—কল্পনা—জহ্লাদ্‌—দুর্লঙ্ঘ্য।

প্রহ্লাদ্‌—বাল্মীকি—শাল্মলী—শল্যোদ্ধার্‌—অপরাহ্ণ।

আমার মনে হয়, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বরসাধনার প্রাথমিক স্তরে হারমোনিয়ম যন্ত্রের ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধাগুলি আবৃত্তি-স্বরসাধনাশিক্ষায় গ্রহণ করা বিধেয়। স্বরের বর্ণ আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা 'উদারা-মুদারা-তারা'র কথা উল্লেখ করেছি। আমরা জানি, প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব স্বরের নির্দিষ্ট সুরসপ্তকেই স্বাভাবিক স্বরের অনুরণন ঘটে। স্বাভাবিক স্বরস্থাপনার দ্বারাই স্বরের স্বাভাবিক ও সুস্থির ব্যঞ্জনা জানা বা বোঝা যায় এবং যে কোনো শিশিক্ষু স্বরসাধক তার ব্যঞ্জনাশক্তিকে পরিবর্ধিত করতে একটি অভ্যাস নিয়মিতভাবে করতে পারেন। ধরা যাক—শিশিক্ষুর স্বাভাবিক স্বরানুরণন ঘটে বি-ফ্ল্যাটে। সেক্ষেত্রে বি-ফ্ল্যাটের সুরসপ্তকে তিনি ত্রিশ সেকেণ্ড ধরে পর পর একই কথা "ম্লান হয়ে এলো কণ্ঠে মন্দারমালিকা" স্বাভাবিক ও সুস্পষ্টভাবে বলে গেলেন। অর্থাৎ স থেকে র্স পর্যন্ত এক এক ধাপ এগিয়ে কথাগুলি বললেন প্রতিটি পর্দায় ত্রিশ সেকেণ্ড ধরে। তারপর র্স-তে পৌঁছে তিনি পুনরায় এক এক ধাপ করে নেমে এসে স-তে পৌঁছে বিশ্রাম নিলেন। এতে দম বাড়বে স্বাভাবিকভাবে এবং যাকে বলে গলার আওয়াজের **Range**-ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে। এই অভ্যাস-প্রক্রিয়া দ্বারাই স্বরের অনুরণনে **(Resonance)** বৈচিত্র্যসৃষ্টি সম্পাদন সম্ভব করা যায়। বহুরূপী প্রতিষ্ঠানে অন্তত প্রথম দিকে যাঁরা সক্রিয় সদস্য ছিলেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে সকল সদস্য-সদস্যাদের এই পদ্ধতিতে স্বরসাধনার তালিম শ্রীশম্ভু মিত্র প্রায়ই দিতেন ও নিতেন। এই শিক্ষণ-প্রক্রিয়ায় মুখ, গলবিল ও নাসিকার অনুরণন (আনুনাসিকতা পরিহার করে) বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট চারটি ব্যায়াম অভ্যাস করলে লক্ষণীয় উপকার পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের গ্রন্থে উল্লিখিত চারটি সূত্র হুবহু উদ্ধৃত করছি :

(১) মুখ খুলে শ্বাস নেবেন—৫ সেকেণ্ড থেকে ক্রমে বাড়িয়ে ৮ সেকেণ্ড পর্যন্ত। প্রত্যেকবার শ্বাস ছাড়বার সময় 'আ'-ধ্বনি (ah) একটানা উচ্চারণ করুন। উচ্চারণকালে

সর্বদা স্বরে সমান জোর (equal force) পড়বে; সহজ ও সমভাবে (easy and smooth) ধ্বনি নির্গত হবে। স্বরের কোনো অংশ কম্পিত হবে না, অর্থাৎ নিটোল স্বর বার করতে হবে। স্বরনির্গমনের সময় ১৫ সেকেণ্ড থেকে বেড়ে ক্রমে ৩০ সেকেণ্ড পর্যন্ত হবে (পাঁচবার)।

(২) গলবিল খোলা রেখে ও চোয়াল শিথিল রেখে মুখ দিয়ে শ্বাস নিয়ে এক-নিশ্বাসে একটু টেনে টেনে উচ্চারণ করুন—আ, মা, দা, না, বা, পা, শা, হা, ফা। ক্রমে উচ্চারণ দ্রুত করবেন এবং একনিশ্বাসে একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করবেন। উচ্চারণের স্পষ্টতা যেন কোনোক্রমে বিঘ্নিত না হয়। (পাঁচবার)।

(৩) ক। মূর্ধা শিথিল করে মুখ ও নাক দিয়ে শ্বাস টেনে শ্বাস নাসিকাপার্শ্বস্থ গহ্বর ও নালীতে নিয়ে উচ্চারণ করতে হবে—ম, ন, ঙ, ং। উচ্চারণের সময় মুখ ও নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়বেন (পাঁচবার)।

খ। মুখ ও নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে মুখ বন্ধ করে একটানা হম্-ধ্বনি (hum) সৃষ্টি করুন (পাঁচবার)। ১৫ সেকেণ্ড থেকে ক্রমে বাড়িয়ে ৩০ সেকেণ্ড পর্যন্ত ধরে রাখুন।

গ। মুখ ও নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করুন (স্পষ্টতা যেন বিঘ্নিত না হয়)—পাঁচবার :

আম্, কাম্, জাম্, ধাম্, নাম্, লাম্ ॥
কান্, জান্, তান্, ধান্, পান্, মান্ ॥
মগ্ন, বিঘ্ন, নিম্ন, চিহ্ন, স্নান, বিষ্ণু, আসন্ন ॥

উচ্চারণ ক্রমে দ্রুত করে একনিশ্বাসেই কয়েকবার করে পুনরাবৃত্তি করবেন।

(৪) মুখ ও নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে প্রথমে একটু টেনে উচ্চারণ করুন, পরে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করবেন। (স্পষ্টতা যেন বিঘ্নিত না হয়)—

পাঁচবার :—অংশ, কংস, ধ্বংস, বংশ, হংস, সিংহ।

তুঙ্গ, ভৃঙ্গার, ভুজঙ্গ, মৃদঙ্গ, লঙ্ঘন, অঙ্কন, পুঙ্খানুপুঙ্খ, আকাঙ্ক্ষা ॥

আমরা জানি, কারোর স্বর মোটা, কারোর জোরালো, কারোর বা হালকা, কারোর পাতলা, কারোর নাকী, কারোর কর্কশ, কারোর কারোর স্বর হয় ফ্যাসফেসে, আবার কারোর বা মধুময়। স্বরের এই বিভিন্নতাকে ব্যক্তিগত স্বর-বৈশিষ্ট্য (Personal timber) বলে। তাই একই স্বর (Note) বিভিন্নকণ্ঠে বিভিন্নভাবে ধ্বনিত হয়। ধ্বনিপ্রাবল্যসৃষ্টিতে, ধ্বনিতরঙ্গের পরিসর বৃদ্ধিতে সেজন্য নিয়মিত স্বরসাধনার দ্বারা স্বরসৃষ্টির প্রক্রিয়াগুলিকে আয়ত্ত করা দরকার। স্বাভাবিক শুর থেকে অভ্যাস-সিদ্ধ স্বরস্তর (Habitual pitch) বৃদ্ধির অভ্যাস দ্বারা Pitch Range বা স্বরস্তরের

বিস্তৃতিসাধন সম্ভবপর হয়। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে সাতটি শুদ্ধস্বরের উল্লেখ আছে। প্রাণিকণ্ঠের শ্রুতিসুখকর শব্দের অনুকরণে এই সাতটি স্বরসৃষ্টি ঘটেছে—ময়ূরের শব্দানুকরণে ষড়জ (সা), গোজাতির (বৃষ) শব্দ থেকে ঋষভ (রে), অজের (ছাগল) শব্দ থেকে গান্ধার (গ), ক্রৌঞ্চের শব্দ থেকে মধ্যম (ম), কোকিলের কুহুস্বর থেকে পঞ্চম (প), অশ্বের শব্দানুকরণ থেকে ধৈবত (ধা) আর কুঞ্জরের শব্দ থেকে নি-স্বর উদ্ভূত। এছাড়া রে-গা-মা-ধা-নি এই পাঁচটি স্বর আবার বিকৃত ভাবে উচ্চারিত হয়ে ব্যবহৃত হয় বলে মোট স্বরের সংখ্যা ৭ + ৫ = ১২টি (শুদ্ধ = ৭টি, বিকৃত = ৫টি)। মুদারার 'সা' থেকে তারার 'সা' পর্যন্ত আমরা যেমন সারেগামা-পাধানির্সা বলে থাকি পাশ্চাত্যদেশে তেমনি **Do-Re-Me-Fa-Sol-La-Te-Do** বলা হয়। **Mr. Helmholzt** এই সাতটি স্বরের নামকরণ করেছেন—**C/D/E/F/G/A/B**। স্বরগুলির মধ্যে কম্পন-তরঙ্গের পার্থক্য আছে বলে সুরেরও পার্থক্য ঘটে। পাশ্চাত্যের সাধারণ সাতটি স্বর ছাড়াও পাঁচটি শার্প (**Sharp**) স্বর আছে অর্থাৎ তাদেরও ব্যবহৃত স্বরের সংখ্যা বারোটি।

প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কণ্ঠসংগীতশিল্পীর মতো কণ্ঠস্বর অবলম্বন করে গড়ে ওঠা অন্যান্য প্রয়োগশিল্পের শিল্পীদেরও (অভিনয়, আবৃত্তি) সাধারণভাবে কণ্ঠসঙ্গীতসাধনা করা বোধহয় অত্যাবশ্যক। আর শিক্ষার্থী স্বরসাধককে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের মনের অনুভূতির বিভিন্ন ধরন অনুযায়ী কণ্ঠস্বরেরও বিভিন্নতা প্রকাশিত হয়। মেজাজানুযায়ী স্বর উঁচু-নীচু হয়, স্বরের স্থায়িত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিও ঘটে। উচ্ছ্বাস-আবেগে স্বর চড়ে বা ওঠে আবার বিনয়ানুনয়ে নীচুস্বর দেখা যায়। স্বভাবতই মেজাজানুযায়ী কণ্ঠস্বরের অভিব্যক্তির লক্ষ্যণীয় রীতিগুলিতে বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকে। উদ্যমহীনতায়-বিষাদে-দুঃখে মানুষের কাজের মন্থরতার সঙ্গে সঙ্গে স্বরের স্তরও নীচু হয়ে যায়, গম্ভীর অবস্থাতেও পিচের নীচু স্তর থাকে। আবার হঠাৎ উল্লসিত-উচ্ছ্বসিত হলে, সাফল্যে গর্বিত বোধ করলে কিম্বা সাদর সম্ভাষণের সময় মনে খুশীর জোয়ারে হৃদ্‌স্পন্দনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে ও স্বর-উচ্চারণে দ্রুততা আসে, সুরের বিন্যাসে উন্নতি ঘটে।

মানুষের বিভিন্ন অবস্থানানুযায়ী বিভিন্ন মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ভরতমুনি স্বর-প্রকাশনে রতি—হাস—করুণ—বীর—রৌদ্র—অদ্ভুত—বীভৎস—এই সাতটি রসের কথা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলিই মতান্তরে নবরসে (নয়টি রসে) চিহ্নিত করা যায়। ওপরের আলোচনাগুলি অনুধাবনের সুবিধার্থে গ্রন্থ মধ্যে সাতটি রেখাচিত্র ব্যবহার করেছি। চিত্রগুলি মানুষের বাক্‌যন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, মস্তিষ্কে স্নায়ুকেন্দ্র, মুখমণ্ডলে বাক্‌যন্ত্রের অংশ, বাক্‌প্রত্যঙ্গ, বাক্‌ধ্বনির মধ্যবর্তী পথের বিভিন্ন

ধরণ এবং মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়-প্রক্রিয়াকে চিত্রিত করা হয়েছে শারীরবিজ্ঞানের পটভূমিকায়।

আমরা জানি, কোনো শিল্পসাধনাই স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক যে ঘটনারাজি মানুষের জীবনের নানান ক্ষেত্রে অহরহ ঘটে যায় তার থেকে নিজের মতো করে বেছে নিতে হয়, গুছিয়ে নিতে হয় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এবং এই সাজানো-গোছানো উপলব্ধ সত্যের প্রকাশই ঘটে শিল্পকলাতে। স্বভাবতই প্রত্যেক শিল্পকলার নিজস্ব নিয়মে, ছন্দে ঘটে-ওঠার কাজটাকে শৃঙ্খলাপরায়ণ হতেই হবে। শ্রীশম্ভু মিত্রের কথাতেই বলা চলে: যেহেতু জীবনটা কোনো ন্যাকামানুষের দিনপাতের মতো নিস্তরঙ্গ ও শিথিল নয় সেহেতু মানুষের শিল্পসৃষ্টির বোধ ঘটে থাকে বিরাট করে, গভীর করে জীবনকে জানার মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে আমরা সকলেই বিশিষ্ট; তাই শিল্পীর 'কাজ নিজের মনকে উন্মুক্ত করা, নিজের মধ্যের গভীরকে উপযুক্তভাবে উপলব্ধি করা। আমরা যখন হঠাৎ কোনো দুঃখকর ঘটনা প্রত্যক্ষ করি তখন প্রত্যেকের গলাই যেন আর্দ্র হয়ে ওঠে, কোনো শিশুর সঙ্গে যখন কথা বলি তখন নিজের গলায় মিষ্টতা আরোপিত হয়—এই যে স্বাভাবিকতা, এই স্বাভাবিকতাই নিজের গলায় ধরে রাখা এবং প্রয়োজন মতো প্রকাশ করতে পারাটাই হলো গলার স্বাভাবিকতা।

ভাল স্বরের অর্থ হলো—গলার অর্থবহ আওয়াজের বিস্তৃতির ব্যাপকতা। পূর্বে স্বরসাধনায় হারমোনিয়ামের ব্যবহারের কথা বলেছি। এই ব্যবহারের দ্বারা কারো তিন অক্টেভে গলার আওয়াজ হয়ত বেরুলো। তাহলেই কিন্তু তার গলার বিস্তৃতি ঘটলো না। গলার আওয়াজের স্বাভাবিক বিস্তৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলন দ্বারা অর্থমণ্ডিত ও শ্রুতিমধুর করে তোলা প্রয়োজন। গলার আওয়াজের বিস্তৃতি তাই যে কোনো স্কেলে ঘটতে পারে। আর নিজের স্বাভাবিক স্কেল বের করার সহজ পদ্ধতি হলো—কখনও মোটা বা ভারি করে কিছু বলবার চেষ্টা না করা। অনেকেই ভাবেন গলা মোটা করে কিছু বললে বেশ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাবে, কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়। ব্যক্তিত্ব ফোটে কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যে। অনেক মানুষ ভীষণ আস্তে কথা বলেন এবং বেশ পাতলা গলা। কিন্তু যা বলেন তা হিসেব করে বুঝে বলেন, প্রত্যেকটি শব্দে ও বাক্যে ধ্বনিময় অর্থ প্রকাশ করেন, নিজের পাতলা স্কেলের মধ্যেই তাঁর গলায় বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটায়। সকলেই নিশ্চয় স্বীকার করবেন মহামতি লেনিনের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা। লেনিনের ছিল মোটামুটি পাতলা গলা এবং কথা বলতেন মোটামুটি আস্তে (লেনিনের বক্তৃতার যে সব রেকর্ড পাওয়া যায় সেগুলি শুনলেই ব্যাপারটা বোঝা

যাবে)। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের কথা তো প্রায় সকলেরই জানা আছে, কিন্তু সে-কণ্ঠ শুনে কেউ কি বলবেন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল না। পূর্বে আমরা গিরিশচন্দ্রের প্রসঙ্গে আলোচনাকালে 'ঘুঘ্‌নি-চাটা' গলার কথা বলেছি। অনেক ফেরিওয়ালা বা গাড়িচালকের ভীষণ মোটা ও জোরালো গলা, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠস্বরের আওয়াজে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রকাশ প্রায় কখনোই ঘটে না।

স্বরপ্রক্ষেপণের যে পাঁচটি সাধারণ বিধানের (এ্যাবডোমেন-লিপ্‌টাঙ্‌-হুইসপারিং-ন্যাজাল্‌-হেডরেজিস্টার) কথা বিশেষজ্ঞগণ বলে থাকেন তার ব্যবহারিক প্রয়োগ-প্রক্রিয়াগুলি জানা স্বরসাধনার শিক্ষার্থীদের অবশ্যকর্তব্য। বাহুল্যবোধে আমরা সেগুলির আলোচনা এখানে পরিহার করছি।

আমরা জানি, প্রত্যেক স্বরই ধ্বনিময়। এই ধ্বনিময় স্বরকে ব্যঞ্জনাময় এবং অর্থকর করাই আবৃত্তিকার ও গায়কের কাজ। স্বরসাধনার ক্ষেত্রে গায়কের সুরেলাকণ্ঠে সুরের সুষ্ঠু প্রকাশ দ্বারাই অর্থপ্রকাশ সার্থক হয় আর আবৃত্তিকারের সুরেলাকণ্ঠে বর্ণ-শব্দের অন্তর্নিহিত সুরমাধুর্যরসে অর্থব্যঞ্জনা সার্থক হয়।

স্বরসাধনায় উপযুক্তভাবে নাসিকার ব্যবহার সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবহিত হই না। পূর্বকথন অধ্যায়ে বলা হয়েছে গিরিশচন্দ্র ম্যাকবেথ-অনুবাদে ইংরেজী **M-Sound**-এর উপযুক্ত বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যখন সহজভাবে কথা বলি তখন নাককে ভীষণভাবে ব্যবহার করি। ছোটো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমরা মোলায়েম করে কথা বলার চেষ্টা করি আর অন্তর থেকে হেসে যখন মানুষ কথা বলে তখন তার গলা বেশ মিষ্টি শোনায়। এই মিষ্টত্ব উপযুক্তভাবে কল্পনা করে গলার আওয়াজে সচেতনভাবে আনার অভ্যাস করা প্রয়োজন, তা করতে হলে নাক পরিষ্কার রাখা যে আবৃত্তিকারের পক্ষে খুব প্রয়োজন তা বোধগম্য হবে। গলার স্বরে শুধু মিষ্টত্ব আরোপের জন্যই নয়, আবেগের অনেক গভীর প্রকাশের ক্ষেত্রে নাকের উপযুক্ত ব্যবহার খুবই দরকারী। নাকের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য একটি অভ্যাস অনুশীলন করা যেতে পারে। মুখ বন্ধ রেখে শুধু নাক দিয়ে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-র্সা বলার চেষ্টা করা। দেখা যাবে প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা হবে, কেমন যেন পিঁপিঁ করে অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজ বেরুবে। এই আওয়াজকে ধীরে ধীরে বাড়াবার অভ্যাস করলে নানান রকম অনুরণন শোনা যাবে। খুব সজাগভাবে শুনতে পারাটাও অভ্যাসসাধ্য। অনুরণন বের হতে থাকলে একই পর্দাতে নানান রকম ভল্যুমে উচ্চারণ করলে আরো অনেক অনুরণন-বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে।

গলার অনুরণন আনার একটা সহজ পন্থা আছে। প্রথমে সাধারণভাবে

উচ্চারণ করুন : 'বলুন'। তারপর এমনভাবে উচ্চারণ করার চেষ্টা করুন যাতে আওয়াজটা ওপরের পাটির সামনের দাঁতের ভেতরদিকে গোড়াতে ধাক্কা লাগে। নিজের কানে শুনেই বোঝা যাবে আওয়াজ পাল্টাচ্ছে। ক্রমশ চেষ্টা করে আওয়াজটাকে মুখের মধ্যেই নানাভাবে ধাক্কা খাওয়ানোর চেষ্টা করলে দেখা যাবে গলার আওয়াজে বেশ দানা-দানা অনুরণন ফুটে উঠছে। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের অসাধারণ বিস্তৃতি ছিল। শিশিরকুমার-শম্ভু মিত্রের অসাধারণ কণ্ঠসম্পদের বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে অনেকেরই প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। অবশ্য পূর্বে-উক্ত অভ্যাসগুলি অনুসরণ করলে সকলেই শিশিরকুমার, শম্ভু মিত্র কিম্বা ঐ জাতীয় প্রতিভাধরদের অসাধারণ কণ্ঠসম্পদের অধিকারী হবেন এ ধারণা বাতুলতা মাত্র। তা হয় না, হতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কণ্ঠস্বরের যতখানি স্বাভাবিক বিস্তৃতিসাধন সম্ভব তাই শুধু আসতে পারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়মিত অনুশীলনের ফলে। অসুখ বা জন্মাবধি কোনো বিকৃতির জন্য যাদের স্বাভাবিক কণ্ঠ বিকৃত তাদের কথা আসতে পারে না। কিন্তু সাধারণ কণ্ঠসম্পদের অধিকারী মানুষ উপরোক্ত অনুশীলনগুলি করলে ভাল ফললাভ অবশ্যই ঘটবে।

ইতিপূর্বে "ম্লান হয়ে এলো কণ্ঠে মন্দারমালিকা" কবিতা-পঙ্‌ক্তিটি হার-মোনিয়াম পর্দায় সা থেকে র্সা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে উঠে গিয়ে পুনরায় নেমে আসার অভ্যাসের কথা বলেছি। একেই ইংরেজিতে বলে Chromatic Scale। এই সঙ্গে মীড় দিয়ে এক পর্দা থেকে আরেক পর্দায় যাওয়ার অভ্যাস করতে পারলে সমস্ত মীড়ের আওয়াজ গলায় স্থায়িভাবে বসে যাবে। এটা করলে বোঝা যাবে স্বর-পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলে কম্বুরেখায় বা Spirally। আর এই যে কম্বুরেখায় সুর ছুঁয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কথা বলা—এর দ্বারা আবেগের গভীরতা প্রকাশ করার, ছন্দবোধ বাড়ানোর, উচ্চারণে স্বাভাবিকতা আনয়নের পথ সুগম হয়। তাই আবৃত্তিকারের সুরসাধনার অর্থ হলো সুরটা সহজাতগুণের মতো করে গলায় ব্যবহার করা। এবং কোনো গলা যদি ঠিক সুরেলা হয়ে ওঠে তবে সেটা মিষ্টি হতে বাধ্য। কিন্তু এই বাধ্য হয়ে যাবার ব্যাপারটা যেন সর্বাঙ্গীন ও গভীর হয়, "ঘা পঞ্চ মিলে যা লেবুর পাতা করমচা" গোছের মেলানোর মতো না হয়। সুতরাং, স্বর সাধনায় কর্ণ-নাসিকা-কণ্ঠের (E. N. T.) সুসমন্বিত ব্যবহারের অনুশীলন আবৃত্তিশিক্ষায় হবে প্রাথমিক দায়িত্ব। এই সঙ্গে জিহ্বার অনাড়ষ্ট প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত হতে পরবর্তী উচ্চারণবিধি শিক্ষাপর্বে আলোচনা করা হবে।

॥ দুই : উচ্চারণবিধি ॥

উচ্চারণ আবৃত্তি-প্রয়োগবিদ্যার অন্যতম প্রধান উপাদান। তাই, উচ্চারণের শুদ্ধতাই শুধু নয়, উচ্চারণের বিবিধ কৌশলগত ও সযত্ন প্রয়োগে ব্যবহৃত শব্দ প্রত্যাশিত অর্থ ও রসব্যঞ্জনালাভ করে, আবার অচেতন, অশুদ্ধ বা আনাড়ি উচ্চারণ কবিতার তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটিয়ে দেয়। উচ্চারণের শুদ্ধতা আনয়নে জিহ্বার ভূমিকা সবিশেষ। ভাল কণ্ঠস্বরের অধিকারী হয়েও জিহ্বা বা জিভের আড়ষ্টতার জন্য অনেকেই আবৃত্তি-অভিনয়-সঙ্গীতসাধনায় বাধা পান। আমাদের দেশে জিভের আড়্-ভাঙার জন্য জিভের তলায় গোটা বা অর্ধেক সুপারী বা ঐ জাতীয় শক্ত জিনিস রেখে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করার অভ্যাসের কথা বলা হয়। প্রাথমিক অসুবিধা কেটে গেলে সুপারী-রাখা বাদ দিয়ে স্বাভাবিক বর্ণ বা শব্দ উচ্চারণের সুবিধা ঘটে। জিভের আড়্-ভাঙার জন্য শিক্ষার্থীগণ একটি অভ্যাস করতে পারেন। প্রথমে আস্তে আস্তে এবং ক্রমশ জোরে ও দ্রুত কচটতপ-পতটচক বলা অভ্যাস করা। প্রথম পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষরগুলি যদি ঠিকমত উচ্চারিত হয় তবে বাকি অক্ষরগুলিরও একই পদ্ধতিতে অভ্যাসের ফলে সম্ভবপর হবে।

উচ্চারণবিধি সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই একটা ব্যাপার বলে নেওয়া দরকার। অধিকাংশ বাংলাভাষাভাষী মানুষ ঋ-কার উচ্চারণ ঠিকমত করতে পারেন না। 'পৃথিবী'কে 'প্রিথীবী', 'প্রকৃতি'কে 'প্রোক্রিতি' বলতে অনেকেই অভ্যস্ত। অনেক তথাকথিত আবৃত্তিকারের কণ্ঠে 'আবৃত্তি' কথাটিও ঠিকমত উচ্চারিত হয় না। অনেক সময় মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এমন কি বেতার ও দূরদর্শন অনুষ্ঠানের ঘোষণাতেই 'আবৃত্তি' কথাটি আব্‌বৃত্তি—আবৃতি—আব্‌বৃতি—আব্রিত্তি—আব্‌ব্রিতি ইত্যাদি উচ্চারিত হয়। ব্যাপারটা খুবই অপ্রিয় শোনালেও সত্য এবং বলাই বাহুল্য লজ্জা ও দুঃখজনক। ইদানীং কলকাতা-শহরতলী ও মফস্বলের শহরে বেশ কিছু আবৃত্তি-শিক্ষার আসর বা প্রতিষ্ঠান দেখা যাচ্ছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন এমন কারো কারো মুখেও 'আবৃত্তি' কথাটি ঠিকমত উচ্চারিত না-হতে শুনেছি। সুতরাং তাঁর বা তাঁদের ছাত্রছাত্রীরা যে কি শিখছেন তার ব্যাখ্যা না করাই ভাল।

উচ্চারণ-বিকৃতির ভার আবৃত্তির ক্ষেত্রে সহনীয় হতে পারে না। বার বার অনুশীলন করে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণ ঠিক করতে হবে। ভাল আবৃত্তির মধ্যে চ, ছ, জ, য, ঝ-এর উচ্চারণ অনেক সময় ঠিকমতো হয় না। এর প্রধান কারণ, অক্ষরগুলির ওপর অকারণে ঝোঁক দেওয়া। অনেক ভাল কবিতা-পাঠকেরও এই প্রবণতা দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে কবি তাঁর কবিতাতে ব্যবহার করেন। স্বরাঘাতের অঘোমতা তাই আবৃত্তিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "আবৃত্তি আর অভিনয়—দুটো স্বতন্ত্র শিল্প—কিন্তু দেখেছি, অনেকেই দুটোকে অভিন্ন মনে করেন। তাই গলা কাঁপিয়ে এবং হাত-পা নেড়ে আস্ফালন করাকে তাঁরা আবৃত্তি বলে চালিয়ে দেন। আবৃত্তি বাচনশিল্প, অভিনয় আনুষ্ঠানিক শিল্প। আকারে সমধর্মিতা থাকলেও তাই প্রকাণ্ড প্রকারভেদ রয়েছে দুটোর মধ্যে।" আমার মনে হয়, প্রত্যেক আবৃত্তিকারেরই রবীন্দ্রনাথের অমোঘ নির্দেশ স্মরণে রাখা অত্যাবশ্যক। তাহলে অতিনাটকীয়তা বা অকারণে সুরারোপপ্রবণতার ঝোঁক আবৃত্তি করার ক্ষেত্রে সংযত হবে।

বাংলাভাষা যে সংস্কৃত থেকে এসেছে এটা আমরা সকলেই জানি কিন্তু সংস্কৃত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ স্বরলিপির মতো কার্যকর হলেও বাংলায় কিন্তু তা হয় না। স্বরবর্ণের উচ্চারণে আমরা খুবই অনভ্যস্ত। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার স্বরবর্ণের উচ্চারণের হ্রস্বদীর্ঘতা আয়ত্তে রাখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেই কিছু-না-কিছু সংস্কৃত আবৃত্তি অভ্যাস করতে বলতেন। তাঁর ধারণা ছিল—এই অভ্যাসের ফলে জিভের আড়্-ভাঙবে। অন্যান্য আচরণের মতো আমাদের অনেকেরই কিছু-না-কিছু বাচনিক মুদ্রাদোষ থাকে। এই দোষগুলি কাটাতে হবে নিজেকেই বার বার বলার মধ্য দিয়ে, সজাগ সচেতনভাবে শুনে।

বাংলাভাষার উচ্চারণ নিয়ে বাঙালীদের বিভ্রাটের অন্ত নেই। উচ্চারণ-ভিত্তিক ভাষাসংস্কার নিয়ে অনেক আন্দোলন-আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ এতো বেশি যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অনুধাবন করা খুবই শক্ত। সুতরাং উচ্চারণবিধি সম্পর্কে আবৃত্তি-প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু বক্তব্য নিবেদন করেই আমরা ক্ষান্ত হব। জিভের আড়্-ভাঙার ব্যাপারে পূর্বে বলেছি। স্বরপ্রক্ষেপণের ব্যায়ামের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এবার প্রথমেই স্বর-প্রক্ষেপণ ও উচ্চারণে স্বাভাবিকতা রক্ষা করার ব্যাপারে কিছু অভ্যাসের কথা বলছি।

অনায়াসে হাঁ-মুখ বা ঊর্ধ্ব-অধরোষ্ঠ ডিম্বাকৃতিতে ফাঁক করে কথা বলার অভ্যাস করলে স্বাভাবিক স্বরপ্রক্ষেপণ যেমন সম্ভব হবে তেমনি স্বাভাবিক উচ্চারণ-

প্রবণতাও সম্ভব হবে। এর দ্বারা চোয়ালেরও স্বাভাবিকতা রক্ষা পায়। উচ্চারণবিধি-পালনে প্রাথমিক পর্যায়ে শিশিক্ষুগণ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রথমে স্পষ্ট কিন্তু ধীরে ধীরে এবং পরে দ্রুত বলার অভ্যাস করতে পারেন :

(১) অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা। অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা॥
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অজয়া। অপরাধক্ষম অগো অবগো অব্যয়া॥

—ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল'।

(২) উর্ধ্ববাহু যেন রাহু চন্দ্রসূর্য পাড়িছে।
লম্ফ-ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ-কূর্ম নাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পিঃ ঢালি লক্ষদেহ পুড়িছে।
ভগ্নশেষ হৈল দেশ রেণুরেণু উড়িছে॥

—ভারতচন্দ্র, 'দক্ষযজ্ঞনাশ'।

(৩) ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ-চক্‌চকি। হুড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি॥
ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝরঝরি। চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরি॥

—ভারতচন্দ্র, 'মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি'।

(৪) মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ জটাজুট্ সজ্ঘট্য গঙ্গা। ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফগ্ন গাজে। দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধক্‌ধক্ ধক্‌ধক্ জ্বলে বহ্নি ভালে। ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥

—ভারতচন্দ্র, 'শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা', অন্নদামঙ্গল'।

এবার উচ্চারণবিধি সম্পর্কে শিশিক্ষুদের অবশ্যজ্ঞাতব্য কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করছি। চিত্রগুলি, বিশেষ করে ৪নং চিত্রটি দ্রষ্টব্য :

১। মুখমণ্ডলে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ-স্থানের তালিকা :

বর্ণ ও নাম	উচ্চারণস্থান
অ-আ-ক-খ-গ-ঘ-ঙ-হ (কণ্ঠবর্ণ)	কণ্ঠ।
ই-ঈ-চ-ছ-জ-ঝ-ঞ-য-শ (তালব্যবর্ণ)	তালু।
ঋ-ট-ঠ-ড-ঢ-ণ-র-ষ (মূর্ধন্যবর্ণ)	মূর্ধা।
৯-ত-থ-দ-ধ-ন-ল-স (দন্ত্যবর্ণ)	দন্ত।
উ-ঊ-প-ফ-ব-ভ-ম (ওষ্ঠবর্ণ)	ওষ্ঠ।
এ-ঐ (কণ্ঠতালব্য বর্ণ)	কণ্ঠ ও তালু।
ও-ঔ (কণ্ঠোষ্ঠ্যবর্ণ)	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ।

অন্তঃস্থ ব (দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ)	দন্ত ও ওষ্ঠ।
ং (অনুস্বার) (অনুনাসিক বর্ণ)	নাসিকা।
ঙ-ঞ-ণ-ন (অনুনাসিক)	প্রধানত নাসিকা।

২। **ধ্বনিমূলক উচ্চারণবিধি : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ** (প্রয়াত ভাষাচার্য ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের মতে)—

স্বরবর্ণ—একক স্বর (MONOPHTHONG)

অ, আ, ই, উ, এ, ও, এ (অ্যা)—এই স্বরগুলির প্রত্যেকটির হ্রস্ব ও দীর্ঘভেদ আছে, —যা খাঁটি বাংলার বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতে ই, উ ধ্বনির শুধু দীর্ঘভেদ আছে, কিন্তু অ কেবল হ্রস্ব এবং আ, এ, ও কেবল দীর্ঘ। এ (অ্যা) ধ্বনি সংস্কৃতে নেই। এছাড়া ঋ হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং ঌ হ্রস্ব সংস্কৃতে আছে কিন্তু পালি ও প্রাকৃতে নেই। বাংলা উচ্চারণে—

হ্রস্ব—	দীর্ঘ—	উদাহরণ	হ্রস্ব—	দীর্ঘ—	উদাহরণ
অ	—	অজানা, কলা।	উ	—	উনি, কলু।
—	অ	অজ, দশ।	—	উ	উট, কুল।
আ	—	আমি, মামা।	এ	—	এলাচি, কেনা।
—	আ	আম, কাল।	—	এ	এর, চলেন।
ই	—	ইনি, দিদি।	ও	—	ওহে, ঘোড়া।
—	ই	ইট, দিন।	—	ও	ওল, দোল।
			এ'	—	এ'মন (অ্যামন) এ'কা (অ্যাকা)
			—	এ'	এ'ক (অ্যাক), দে'খ (দ্যাখ)

বাংলায় সংস্কৃত বানানবিধি অনুযায়ী ঈ, ঊ লেখা হলেও খাঁটি বাংলা উচ্চারণে তারা হ্রস্ব হতে পারে : সীতা, ঈশান, দেশী, ঊনিশ, ঊরু, পূজারি।

সন্ধিস্বর (DIPTHONG)

সংস্কৃতে সন্ধিস্বর মাত্র দু'টি : ঐ, ঔ। পালি ও প্রাকৃতে কোনো সন্ধিস্বর নেই। বাংলায় মোটামুটিভাবে ২৯টি আছে।

সন্ধিস্বর	উদাহরণ	সন্ধিস্বর	উদাহরণ
অয়—	হয়, পয়লা।	এয়—	পেয় (পান করে),
অও—	হও, চওড়া।		গেয় (গান করে),
আই—	খাই, মাইবি।		দেয় (দেওয়ার যোগ্য)।
আউ—	ঝাউ, শাউড়ী।	এও—	পেও (পান কর)।

সন্ধিস্বর	উদাহরণ	সন্ধিস্বর	উদাহরণ
আয়—	হায়, বায়না।	এয়—	দেয়, পেয়।
আও—	খাও, পাওনা।	এ'য় (অ্যায়)—	নে'ও, শে'ওলা।
ইই—	আমিই, দেখিই।	এও—	পেও (পান কর)
ইউ—	মিউ, শিউলি।	ওই—	মই (মোই),
উই—	দুই, দুইটা।		পইতা (পোইতা)
এই—	খেই, এইটা।	ওউ—	মউ (মোউ),
এউ—	ঢেউ, দেউলিয়া।		বউনি (বোউনি)
		ওয়—	শোয়।
		ওও—	শোও।

এছাড়া আচার্য সুনীতিকুমার আরো নয়টি সন্ধিস্বরের উল্লেখ করেছেন। ইএ (ia), ইও (io), এয়া (ea), অআ (aa), ওআ (oa), উএ (ue), উআ (ua) এবং উও (uo)। কোনো কোনো সুবক্তার মুখে দু'টি অভিশ্রুতি (umlaut) যুক্ত শোনা যায়। চা'ল (চাউল) ডা'ল (ডাইল) কা'ল (কল্য), হা'র (পরাজয়) শব্দগুলি চাল (ঘরের চাল), ডাল (শাখা), কাল (সময়), হার (মালা) থেকে পৃথকরূপে উচ্চারিত হয়। ঠিক একইভাবে ক'নে (কন্যা), ধ'নে (ধনিয়া) শব্দগুলি কোণে, ধনে থেকে পৃথকরূপে উচ্চারিত হওয়া উচিত।

একক ও সন্ধিস্বরের আনুনাসিক উচ্চারণও আছে। বাংলায় অনুস্বার ও বিসর্গের ধ্বনি আছে—রং, সং, বেং (ব্যাং) আংটি, আংরা, আঃ, বাঃ, উঃ। এই দুই ধ্বনি প্রকৃতপক্ষে—ঙ এবং 'হ'-এর হসন্ত উচ্চারণ, সুতরাং ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে গণ্য করা উচিত।

ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ

ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ঞ, ণ, ষ, ঢ ধ্বনি সাধারণত বাংলায় নেই। পৈশাচী-প্রাকৃতে কেবল ন, অন্যপ্রাকৃতে কেবল ণ আছে। বাংলায় জঞ্জাল, ঠাণ্ডা খন্দ—এই তিন শব্দের ঞ, ণ, ন ব্যবহৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা একই মূলধ্বনির (Phoneme) সামান্য প্রকারভেদ। যেমন উল্টা এবং আলতা-র 'ল' একই মূলধ্বনির প্রকারভেদ মাত্র। বাংলায় ব্যবহৃত 'সবিশেষ' শব্দের তিনটি উষ্মবর্ণের একই 'শ'-কার উচ্চারণ। পালি ও প্রাকৃতে 'ষ' নেই। মাগধী-প্রাকৃতে কেবল শ (বাংলার মতো) এবং অন্য প্রাকৃতগুলি এবং পালিভাষায় কেবল 'স' আছে। বাংলাভাষায় কেবলমাত্র বিদেশী শব্দে এবং সংযুক্ত-বর্ণে স আছে : সালাম, মুসলমান, আসমান, আস্তে, মস্ত প্রভৃতি। বাংলাভাষায় স লিখিত হলেও প্রায়ই তার উচ্চারণ হয় শ। গূঢ়, গাঢ়, আষাঢ় ইত্যাদি সংস্কৃতসম শব্দে ঢ় লিখিত হয়, কিন্তু খাঁটি বাংলায় ঢ় বর্ণের ব্যবহার নেই বলা চলে। মধ্যযুগের

বাংলাসাহিত্যে বুঢ়া, বাঢ়ে, পঢ়ে প্রভৃতি ব্যবহৃত শব্দগুলি আধুনিক যুগে ড় দিয়ে লিখিত ও উচ্চারিত হয় (বুড়া, বাড়ে, পড়ে)। বাংলা বর্ণমালায় অন্তঃস্থ য এবং অন্তঃস্থ ব বর্ণ দু'টির বর্গীয় জ-ও বর্গীয় ব-এর মতো অভিন্ন উচ্চারণ। জন্ম এবং যত্ন শব্দ দু'টির বর্গীয় অন্তঃস্থ 'জ' 'য'-এর বাংলা উচ্চারণ অভিন্ন। তেমনি বিদ্ধ এবং বিদ্যা এই শব্দ দু'টির বর্গীয় ও অন্তঃস্থ দু'টি ব-এর একই উচ্চারণ। অবশ্য সংস্কৃতে এই দুয়ের পৃথকরূপ ও পৃথক উচ্চারণ আছে। খাঁটি বাংলায় নাওয়া, খাওয়া, চোয়াল, ধোয়া প্রভৃতি শব্দে অন্তঃস্থ ব-ধ্বনি আছে, কিন্তু কোনও বর্ণ নেই। অথচ অসমীয়া ভাষাতে এজন্য একটি পৃথক বর্ণ আছে ('কিনিব পাবে' = কিনিতে পাবে)। সংস্কৃতসম অর্থাৎ সংস্কৃত হতে কৃতবাণ, পরাহ্ণ, চিহ্ন প্রভৃতি শব্দে কেউ কেউ আবার মহাপ্রাণ 'ন' উচ্চারণ করেন। তাঁদের উচ্চারণ 'Chin-nha', 'Paran-nha'। এ রকম মহাপ্রাণ 'ম' এবং 'ল' উচ্চারণও আছে। যেমন 'ব্রহ্মা', 'ব্রাহ্মণ', 'আহ্লাদ' শব্দগুলি বাংলায় উচ্চারিত হয়—'Brah-mha', 'Bram-mhan', 'Al-lhad'। বিদেশী শব্দে 'z' ধ্বনি সংজ্ঞায় এবং পারিভাষিক শব্দে রক্ষা করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালে এটি 'য' দ্বারা সূচিত হচ্ছে বটে (যেমন—আযান, নমায, এলিজাবেথ, যবন) কিন্তু উচ্চারণে য-ধ্বনিটি জ-এ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং সেইমতো তাদের লিখিত রূপও হওয়া উচিত (জেব্রা, হাজার, জাহাজ, জোর ইত্যাদি)। মনে হয় ৎ-এর জন্য পৃথক কোনো বর্ণের দরকার নেই। ক্ দ্ ইত্যাদির ন্যায় ত্ ভালভাবেই চালানো যায়।

অতএব ধ্বনিমূলকভাবে খাঁটি বাংলায় বর্ণমালা হবে : স্বরবর্ণ (৯টি)—অ, আ, ই, উ, এ ও এ' (= অ্যা), ং, ঁ।

ব্যঞ্জনবর্ণ (৩০টি)—ক, খ, গ, ঘ, | চ, ছ, জ, ঝ, | ট, ঠ, ড, ঢ, | ত, থ, দ, ধ, ন, | প, ফ, ব, ভ, ম, | য, র, ল, ব় (= ওঅ), | শ, স, হ, | ড়।

৩। বাংলাভাষায় প্রচলিত কয়েকটি শব্দের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য :

দশ্, রূপ, লোক, জন ইত্যাদি শব্দগুলি নিয়মানুযায়ী দশ্—রূপ্—লোক্—জন্ কিন্তু অকারান্ত তৎসমশব্দ অন্য শব্দের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হলে পদটির শেষের অকারের হলন্ত এবং আগের অন্য শব্দের অ-ধ্বনি ও-ধ্বনির মত উচ্চারিত হবে; যেমন—জল্+যোগ্ = জলোযোগ্, দশ্+রথ্ = দশোরথ, লোক্+গীতি = লোকোগীতি, ভোগ্+বিলাস +পরায়ণ = ভোগোবিলাসোপরায়ণ। বলাই বাহুল্য, লেখ্যবানান কিন্তু হবে দশরথ, লোকগীতি, ভোগবিলাসপরায়ণ।

উদ্যোগ-এর মূল শব্দ যোগ। উৎ উপসর্গ যোগ হয়েছে। বাংলায় য সাধারণত জ-রূপে উচ্চারিত। ঐ জ-ধ্বনির প্রভাবে উৎ উপসর্গের হসন্ত-ত হসন্ত-দতে রূপান্তরিত। সুতরাং উদ্+জোগ্ মিলে উদ্জোগ্ উচ্চারিত হবে। তেমনি উদ্বেল = উদ্বেল্।

শব্দের অ-কারের আগে ঋ থাকলে অ-কার ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। তৃণ=তৃণো, কৃশ=কৃশো, বৃষ=বৃষো ইত্যাদি। ত-প্রত্যয়যুক্ত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হসন্ত না হয়ে ও-ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়: গম্+ত=গতো (বানানে গত), লী+ত=লীনো (বানানে লীন), নি-হন্+ত=নিহতো (বানানে নিহত)।

বাংলা হ-শব্দের উচ্চারণে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য। হ-এর সঙ্গে য-ফলাযুক্ত হলে 'জ্ঝ'-এর মতো উচ্চারিত হয়। সজ্ঝো (সহ্য) বাজ্ঝো (বাহ্য) লেজ্ঝ (লেহ্য)। আর হ-র সঙ্গে ন, ম ও ল যুক্ত হলে উচ্চারণের ক্ষেত্রে হ-ন এর, হ-ম এর এবং হ-ল এর স্থানপরিবর্তন ঘটে; যেমন—অপরাণ্হ (অপরাহ্ণ), মধ্যান্হ (মধ্যাহ্ন), ব্রাম্হণ্ (ব্রাহ্মণ), প্রল্হাদ (প্রহ্লাদ)। এছাড়া 'হ'-র সঙ্গে 'ব' যুক্ত হলে 'হ' ও 'ব'-র স্থান পাল্টানো ছাড়াও ব-র উচ্চারণ হয় ইংরেজি 'W'-র মতো 'ওয়'। যেমন—আওহান (আহ্বান), জিওহা, জিহোবা (জিহ্বা), বিওহল বা বিহোবল্ (বিহ্বল), আহোবান্ (আহ্বান)। কোনো বর্ণের সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে সেই বর্ণটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় এবং ম-ফলা চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। যেমন মহাত্তাঁ (মহাত্মা), আত্তাঁ (আত্মা), অকোৎশাঁৎ (অকস্মাৎ), বিস্সঁয় (বিস্ময়), ভীষ্ষ (ভীষ্ম)। কিন্তু ঙ, ণ, ন, ল এবং গ-এর সঙ্গে ম-ফলা থাকলে 'ম'-এর উচ্চারণ হয়; যেমন—বাঙ্ময়, হিরণ্ময়, চিন্ময়, মৃন্ময়, গুল্ম, বাল্মীকি, শাল্মলী, বাগ্মী ইত্যাদি।

স্বরবর্ণযুক্ত ব্যঞ্জন এবং য-ফলাযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি ও-ধ্বনির মতো উচ্চারিত হবে—ওখিল (অখিল), মোধু (মধু), মোস্হণ (মসৃণ), পোক্খো (পক্ষ), লোক্খো (লক্ষ), দোক্খো (দক্ষ), জোগ্গোঁ (যজ্ঞ), সোভ্ভো (সভ্য), দৈবোগ্গোঁ (দৈবজ্ঞ), ওন্নো (অন্য) আবার র-ফলাযুক্ত বর্ণের সঙ্গে 'অ'-যুক্ত হলে অ-ধ্বনি ও-ধ্বনিতে পরিণত হবে: ভ্রোম্ (ভ্রম), শ্রোম্ (শ্রম), প্রোমাণ্ (প্রমাণ), অগ্রোণী (অগ্রণী)। বাংলায় শ, ষ, স-এর উচ্চারণ সাধারণত ইংরেজি 'sh'-এর মত হয় কিন্তু র, ল, ন, ঋ ফলাযুক্ত হলে শ, ষ, স-এর উচ্চারণ হবে ইংরেজি 's'-এর মতো—স্রী (শ্রী), স্রাবণ্ (শ্রাবণ), স্লীল্ (শ্লীল), সৃগাল্ (শৃগাল)।

উচ্চারণবিধি সম্পর্কে পর পর তথ্য লিপিবদ্ধ করলে পাঠকগণ ক্লান্তিতে বিরক্ত-বোধ করতে পারেন। তাই পরবর্তী তথ্য নিবেদনের পূর্বে উচ্চারণবিধি-নিয়ন্ত্রক বাগ্যন্ত্রের ক্রিয়াকর্মের সামগ্রিক পরিচয়টি সহজভাবে নিবেদন করা যাক।

ফুসফুস থেকে যখন নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তখন কোনো স্বরসৃষ্টির বাসনা হলে' ভোকাল্কর্ড বা দু'টি স্বরতন্ত্রী প্রায়-যুক্ত হয়ে যায়, এই যুক্ত স্বরতন্ত্রীকে গ্লটিস বলে। প্রায়-যুক্ত গ্লটিসের ফাঁক দিয়ে বের-হওয়া নিঃশ্বাসের ধাক্কা লেগে স্বর তন্ত্রীতে কাঁপন লাগে এবং কাঁপনের ফলে যে স্বর উৎপন্ন হয় তা মুখ ও নাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

বেরুবার সময় আলজিভ, জিভ, চোয়াল, মূর্ধা, তালু, দাঁতের গোড়া, দাঁত এবং ঠোঁটের বিভিন্ন জায়গায় ধাক্কা লেগে বর্ণ বা শব্দ উচ্চারিত হয়। এই গতিবিধির বহু বিচিত্র পরিবর্তনে বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণ ঘটে যাবে। এই শব্দ-উচ্চারণের জন্য গলবিল, নাক, নাকের পাশের নালী ও গর্ত, মুখের গর্ত, জিভ প্রধানত নানানভাবে নিয়ন্ত্রণ-কাজ সম্পাদিত করে। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বাগ্‌যন্ত্রের চিত্রটি দেখে ক্রিয়াপ্রক্রিয়াগুলি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

পুনরায় উচ্চারণবিধি সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য নিবেদনে ফিরে আসা যাক।

ঞ-এর সঙ্গে চছজঝ যুক্ত হলে ঞ-এর উচ্চারণ হয় 'ন্'। চঞ্চল (চন্‌চল), বাঞ্ছা (বান্‌ছা), জঞ্জাল (জন্‌জাল), ঝঞ্ঝা (ঝন্‌ঝা)। 'ণ' ও 'ন' বাংলায় একই রকমের উচ্চারণ হয় : জনগণ, ধনবান, বিত্তবান। আদিতে 'য' থাকলে 'জ' উচ্চারিত হবে ; যান (জান), যদি (জদি)। য-এর নীচে বিন্দু দিয়ে 'য়' হয়। এর উচ্চারণ অ-এর মতো। তনয়া, চয়নিকা, নয়ন। য ফলা উচ্চারিত হয় না কিন্তু য-যুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ বিধেয় : পুণ্য (পুন্‌ন), মান্য (মান্‌ন)। য-ফলায় উচ্চারণ কখনো আবার এ-র মতো হয় ; ব্যক্তি (বেক্‌তি), ব্যষ্টি (বেষ্টি), ব্যতিক্রম (বেতিক্রম)। য-ফলা আবার কখনো কখনো 'অ্যা' উচ্চারিত হয়—ব্যয় (ব্যায়), ব্যর্থ (ব্যার্থ), ব্যঙ্গ (ব্যাঙ্গ), ব্যক্ত (ব্যাক্ত), ব্যবহার (ব্যাবহার)। র ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হলে রেফ্ বলা হয়—ধর্ম (ধর্‌ + ম), এবং র ব্যঞ্জনবর্ণের পর যুক্ত হলে 'র'-ফলা হয়—চক্র (চক্‌ + র), বক্র (বক্‌ + র)।

বাংলায় বর্গীয় ও অন্তঃস্থ 'ব'-এর উচ্চারণ সাধারণত বর্গীয় 'ব'-ই হয় (ইংরেজি 'বি'-র মতো) কিন্তু প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব-যুক্ত হলে তার উচ্চারণ সাধারণত করা হয় না—দ্বার (দ্‌-দার্), ধ্বনি (ধ্‌-ধনি)। আবার শব্দের অন্যত্র ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে উচ্চারণে যুক্তবর্ণটি পরিষ্কারভাবে দ্বিত্ব উচ্চারণ করা হয়—বিল্ব (বিল্‌ল), বিশ্ব (বিশ্‌শ)। আর তৎসমশব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে 'ব' উচ্চারিত হয় ইংরেজী 'ডব্লু'-র মতো—জিহ্বা (জিওহা)। ড, ঢ় শব্দের মাঝে বা শেষে থাকলে উচ্চারিত হয়। আর য-ফলাযুক্ত হলে বর্ণ দু'টির উচ্চারণ করা হয়—জাড্‌ড (জাড্য), ধনাঢ্‌ঢ (ধনাঢ্য)। ং-এর উচ্চারণ ঙ-র মতো—রং (রঙ্), বাংলা (বাঙলা)। ঃ পরে থাকলে উচ্চারিত হয়—বিশেষতঃ, প্রথমতঃ কিন্তু পদের মধ্যে থাকলে উচ্চারণ লোপ হয়ে পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব হয়—অতঃপর = অতপ্‌পর, দুঃখ = দুখ্‌খ বা দুক্‌খ। চন্দ্রবিন্দু ঙ এবং ন-র উচ্চারণে নাসিকাধ্বনি হয়ে যায় : অঙ্ক > আঁক, শঙ্খ > শাঁখ, কণ্টক > কাঁটা। বাংলায় সন্ধিজাত উচ্চারণ—বর্ণের প্রথম বর্গের পরে তৃতীয় বর্ণ থাকলে প্রথম বর্ণটি উচ্চারণে তৃতীয় বর্ণ হয়ে যায়—পাঁচজন = পাঁচ্‌জোন, টকগন্ধ = টগ্‌গন্ধো।

হাতদেখা = হাদ্‌দ্যাখা। আবার র-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে 'র' লুপ্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়—চারদিক = চাদ্‌-দিক্‌, ঘোড়ারডিম = ঘোড়াড্‌-ডিম। চ-এর পর শ, স থাকলে 'চ' বর্ণের জায়গায় শ, স হয়ে যায়—পাঁচসের = পাঁস-সের, পাঁচশত = পাঁশ-শতো। উল্লিখিত উচ্চারণবিধি ছাড়াও অ-কার ও এ-কারের উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম এবং বিশেষ নিয়মগুলি আমাদের জানা থাকা ভাল। এ ব্যাপারে প্রয়াত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার ও শহীদুল্লাহ সাহেবের গ্রন্থাদিতে বিস্তৃত আলোচনা অনুসন্ধিৎসুগণ দেখে নিতে পারেন।

উচ্চারণবিধির অন্যতম জ্ঞাতব্য বিষয় হলো ছেদবিধি। পূর্ণচ্ছেদ, অর্ধচ্ছেদ, পাদচ্ছেদ, দৃষ্টান্তচ্ছেদ (কোলন), যোগচিহ্ন (হাইফেন), দীর্ঘ যোগচিহ্ন (ড্যাস), লোপচিহ্ন (অ্যাপোসট্রপি), উদ্ধৃতিচিহ্ন, বর্জনচিহ্ন, জিজ্ঞাসাচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন ইত্যাদি। ছেদ হলো বিরতি। ছেদ চিহ্নগুলি বাংলাতে ইংরেজি ভাষার অনুসরণে গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের ছেদচিহ্নের জন্য পূর্ণবিরতি ছাড়াও পাঠের সময় ভাবানুযায়ী বাক্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ছোট বিরতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর দ্বারা শ্বাসগ্রহণের সুবিধা ছাড়াও অর্থপ্রকাশের সুবিধা হয়। যতিচিহ্নও এক প্রকারের বিরতি, কিন্তু ছেদের সঙ্গে এর তফাৎ আছে। যতি ব্যবহৃত হয় কবিতা ছন্দের নির্দিষ্ট রূপানুসারে। এতে শ্বাস গ্রহণের সুবিধা হয় কিন্তু এর দ্বারা অর্থ প্রকাশের কোনো বিশেষ সুবিধা হয় না। ইংরেজি ভাষায় ছেদকে বলে Logical pause, যতিকে বলে Poetic Pause।

ছেদ ও যতি ছাড়াও আবৃত্তি ও পাঠের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিরতি ব্যবহৃত হয় যাকে বলা যেতে পারে চলনভঙ্গির পরিমাপ, ইংরেজিতে যাকে বলে Pace. এছাড়া কি গতিক্রমে (Tempo) আবৃত্তি করলে স্বর পরিবর্তন ও উচ্চারণ স্বাভাবিক রেখে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যঞ্জিত করা যায় তাও উচ্চারণবিধির সঙ্গে অনুশীলনযোগ্য।

[বলাই বাহুল্য, উচ্চারণবিধির সঙ্গে স্বরভঙ্গির বিভিন্ন ব্যাপারগুলি (স্বরস্তর—tonal level, স্বরবৈচিত্র্য—pitch variation, স্বরপ্রাবল্য—Volume, অনুরণন—Resonance, স্বরস্তর বিস্তৃতি—Pitch range, যতি—Metrical pause, ব্যক্তিগত স্বরবৈশিষ্ট্য—timbre, স্বর প্রক্ষেপণ—Voice projection, ভাষার নিজস্ব সুর—Speech Melody, পঙ্‌ক্তির মধ্যে পর্ব ও পর্বাঙ্গের বিভাজন, শ্বাসাঘাত—Accent, মাত্রা—Mora ইত্যাদি সুসমন্বিত করবার অভ্যাস অত্যাবশ্যক। প্রতিযোগিতামূলক আবৃত্তির বিচারের সময় সামগ্রিকভাবে এগুলিকে প্রকাশভঙ্গিরূপে বিচার করা হয়।]

॥ তিন। ছন্দবিধি ॥

কবি গঙ্গাদাস 'ছন্দোমঞ্জরী' গ্রন্থে বলেছেন—'ছন্দোবদ্ধপদং বাক্যম্'। বাংলাতে ছন্দের সংজ্ঞারূপে নির্দেশিত হয়েছে 'গদ্যের স্বাভাবিক পদ-স্থাপনার বন্ধনকে শিথিল করে সুর-লয় সহযোগে ভাবাবেগের গতি বাড়িয়ে বাক্যকে রসাত্মক করে তোলার জন্য বিশেষ বিশেষ রূপকল্প অনুসারে শব্দধ্বনির বিন্যাসরীতিকে ছন্দ (পদ্যবন্ধ) বলে।' আর আচার্য সুনীতিকুমার নির্দেশিত সংজ্ঞাটি হলো—'বাক্যস্থিত পদগুলিকে যেভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তাহার মধ্যে একটা কালগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয় পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলে। পদগুলির অবস্থান এমনভাবে হওয়া চাই যাহাতে ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতির কোনো পরিবর্তন না হয় এবং রচনাটির মধ্যে একটি সহজ লক্ষ্যণীয় এবং সুসঙ্গত পরিপাটি বা আদর্শ (Pattern) দেখিতে পাওয়া যায়।'

ছন্দ সম্পর্কে বাংলাভাষায় অনেক ভাল বই পাওয়া যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম বাংলাছন্দের রীতিনীতি সম্পর্কে অনেকগুলি নিবন্ধ রচনা করেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় সদ্যপ্রয়াত 'ছান্দসিক' (রবীন্দ্রনাথের দেওয়া উপাধি) আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নানান গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া প্রয়াত অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক নীলরতন সেনের গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

ছন্দের প্রয়োজন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলার জন্য তা প্রয়োজন।" কাব্যের ছন্দ শব্দের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। যেহেতু কাব্যের বৈশিষ্ট্য গতিশীলতায় সেহেতু ছন্দ শুধু গতিশীলতাই আনয়ন করে না, যে কোনো বক্তব্যকে নিত্যবহমানতা এনে দেয়। কবিতার ভাষা ও ছন্দ ভাবকে জাগিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় বলা যায়: "ছন্দ সঙ্গীতের একটা রূপ। কবিতায় সেই ছন্দ এবং ধ্বনি দুই মিলিয়া ভাবকে কম্পান্বিত এবং জীবন্ত করিয়া তোলে, বাহিরের ভাষাকেও হৃদয়ের ধন করিয়া দেয়।" রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার দু'টি লাইন হলো:

"অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি।
তোমার ভাষা বোঝার আশায় দিয়েছি জলাঞ্জলি ॥"

শিশুর অসংখ্য দুর্বোধ্য কলকোলাহল মাত্র দুই পঙ্‌ক্তিতে সহজবোধ্য ও রসাত্মক-রূপে ধরা দিল আমাদের কাছে। বলাই বাহুল্য, ছন্দোবদ্ধ সুবিন্যস্ত শব্দগুলিই এখানে সহজবোধ্য রসাস্বাদনের সহায়ক হলো। গদ্যেরও অবশ্য ছন্দোলক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে তা কিছুটা আকস্মিক। পদ্যের ছন্দোলক্ষণ কিন্তু স্বাভাবিক ও সুপরিস্ফুট। পদ্য স্বাভাবিক ছন্দের নিগড়ে তটবদ্ধ নদীর মতো। গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য সম্পর্কে রবীন্দ্র-উক্তি হলো: "গদ্যের সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই, সে একটা বৃহৎ বিশেষত্বহীন বিলের মতো। আবার তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে, একটা গতি আছে। কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেমন যেন বিস্তৃতভাবে দিক্‌বিদিক গ্রাস করে পড়ে থাকে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার প্রয়োজন হয় তবে তাকে ছন্দের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয়, নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে একদিকে ধাবিত হতে পারে না।

ছন্দ-সচেতনতা আবৃত্তিকারের পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাঁর মোটামুটিভাবে জানা থাকা দরকার বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি। সংস্কৃতের বৃত্তছন্দ ও জাতি-ছন্দগুলির বৈশিষ্ট্য, ইংরেজি ছন্দে বিভিন্ন শব্দে ব্যবহৃত প্রস্বরের (Accent) বৈশিষ্ট্য এবং পর্বগঠনরীতির বৈশিষ্ট্য সকল বাংলা ছন্দে সাধারণত অনুসৃত হয় না।

বাংলা ছন্দের আকৃতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করতে হলে পদ বা পর্ব (চরণের যতিবিচ্ছিন্ন অংশকে পদ বা পর্ব বলে), চরণ (কয়েকটি পদ বা পর্ব মিলে একটি আদর্শ বা প্যাটার্ন সৃষ্টি করলে তাকে চরণ বলে) এবং স্তবক (কয়েকটি চরণ মিলে একটি স্তবকের সৃষ্টি করে) গঠনের নিয়মবিধি জানা থাকা ভাল।

বাংলা কবিতার ছন্দ মোটামুটিভাবে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) পদ্যছন্দ, (২) গদ্যছন্দ। পদ্যছন্দের তিনটি বিভাগ: (ক) অক্ষরবৃত্ত, (খ) মাত্রাবৃত্ত, (গ) স্বরবৃত্ত। বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সদ্য প্রয়াত আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের বক্তব্য হলো:

"ঋক মন্ত্রগুলিরই অপর নাম 'ছন্দ'। মন্ত্রগুলি ছন্দোবদ্ধ রচনা বলেই এই নাম। পক্ষান্তরে এ কথাও জানি যে ঋক্ মন্ত্রগুলি সুর দিয়ে গান করলেই তা সামে পরিণত হয়।......ছন্দ বাঁচিয়ে পড়লে বা আবৃত্তি করলে যা হয় আবৃত্তি বা কবিতা, সুরে লয়ে গীত হয় বলে তাই আবার স্থান পেয়েছে গীতবিতানে।

......দৈশিক ভাষায় ছন্দ রচনার কোনো বাঁধা নিয়ম নেই, কানের অভিরুচির উপরে নির্ভর করে লিখে গেলেই হলো এবং পড়বার সময় কানের অভিরুচির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে দীর্ঘবর্ণকে লঘু আর কোথাও দ্রুত, কোথাও মন্থর উচ্চারণ করে

ছন্দ রক্ষা করলেই হলো। অর্থাৎ দায়টা ছন্দরচয়িতার নয়, পাঠক বা আবৃত্তিকারের। ছন্দ বাঁচিয়ে রচনার দায় নেই, পাঠ বা আবৃত্তি করেই ছন্দ বাঁচাতে হবে।

ছড়াই হোক বা অন্য যে-কোনো পদ্যাকার রচনাই হোক, সকলেরই প্রাণ ওই রিদম্ বা তাল। সেকালেও সর্ববিধ পদ্যাকার রচনার লক্ষ্য ছিল এই তাল উৎপাদন। আর গায়কের, আবৃত্তিকারের বা পাঠকের কণ্ঠে কখনও তাল-স্খলন ঘটত না। আধুনিককালেও পুরাণ-পাঠকের বা কবির লড়াইয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কণ্ঠে অতি অমার্জিত পদ্য রচনাও কিভাবে সুনিয়ত তালে উচ্চারিত হয় তা সকলেই জানেন। সেকালে পদ্য রচনা হয় সুরে তালে গীত হোত কিম্বা পাঠকঠাকুরের কণ্ঠে গীত-ভঙ্গিতে আবৃত্তি হোত, তাল-স্খলন ঘটত না। ......আজকাল পাঠে বা আবৃত্তিতে ওই রকম পর্বান্ত সুস্পষ্ট বা প্রবল ঝোঁক থাকে না, তাই এই জাতীয় শব্দচ্ছেদও হয় না। তাছাড়া শব্দের বিশেষত তৎসম শব্দের আদ্য ও মধ্য রুদ্ধদলের যথেচ্ছ প্রসারণ চলে না, আর অন্ত্যরুদ্ধদলের সংকোচন অচল হয়ে গেছে।"

আসলে ছন্দ একটি ধ্বনিশিল্প, সুতরাং ছন্দের গোড়ার কথাই হচ্ছে ধ্বনির তত্ত্ব, ধ্বনির বাহনকাল, ছন্দ বস্তুত এই ধ্বনিবাহীকালের উপরই নির্ভর করে, লিখিত অক্ষর-সংখ্যার উপর নয়। প্রসঙ্গত ছন্দসম্পর্কে আরো একটি রবীন্দ্র-উক্তি নিম্নরূপ :

"ছন্দ এমন একটা বিষয় যাতে সকলে একমত হতে পারে না। তোমার সঙ্গে একমত হতে পারব এমন আশা করা যায় না। ছন্দ হচ্ছে কানের জিনিস; একেক জনের কান একেক রকম ধ্বনি পছন্দ করে। তাই আবৃত্তির ভঙ্গির মধ্যে এতটা পার্থক্য ঘটে, আমি দেখেছি কেউ কেউ খুব বেশী টেনে টেনে আবৃত্তি করে আবার কেউ কেউ আবৃত্তি করে খুব তাড়াতাড়ি। কানেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে; আর আবৃত্তি করাও অভ্যাস থাকা চাই। আমি কিন্তু কবিতা রচনার সময় আবৃত্তি করতে করতেই লিখি, এমন কি কোনো গদ্য রচনাও যখন ভালো করে লিখব মনে করি তখনও গদ্য লিখতে লিখতেও আবৃত্তি করি। কারণ রচনার ধ্বনি সংগতি ঠিক হলো কিনা তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে কান।"

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে আবৃত্তি শিক্ষা-শিক্ষণে ছন্দজ্ঞানের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা থাকলেও ছন্দ সম্পর্কে বিস্তৃত অধ্যয়ন-অনুশীলনের অত্যাবশ্যকতা নেই। সুতরাং ব্যবহৃত ও প্রচলিত ছন্দের রূপ-রীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিবেদনের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমিত থাকবে। প্রথমে পদ্য ছন্দের তিন বিভাগ সম্পর্কে (অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত) উদাহরণসহ কিছু আলোচনা করা যাক :—

অক্ষরবৃত্ত :—সঙ্গীতসাধক দিলীপকুমার রায় তাঁর 'ছান্দসিকী' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন : "সেই ছন্দের নাম অক্ষরবৃত্ত—যে ছন্দে যুগ্ম ধ্বনি শব্দের শেষে থাকলে

সর্বদাই বিশিষ্ট ভঙ্গিতে (টেনে) উচ্চারণ করে ধরা হয় দু'মাত্রা, আর শব্দের মধ্যে থাকলে সচরাচর সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিকে (ঠেসে) উচ্চারণ করে ধরা হয় একমাত্রা।" অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বিভিন্ন পণ্ডিতজন তানপ্রধান ছন্দ, দ্বৈমাত্রিক ছন্দ, যৌগিক ছন্দ, পয়ারধর্মী ছন্দ ইত্যাদি অভীধায় অভিহীত করেছেন, তান-প্রধান ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত নামকরণ করার কারণস্বরূপ শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'ছন্দোবিজ্ঞান' গ্রন্থে বলেছেন : "সাধারণ ভঙ্গিতে উচ্চার্য ছন্দের নাম অক্ষরবৃত্ত। অক্ষরবৃত্তই সকল ছন্দের মূল উপাদান তাই অক্ষরবৃত্ত নামে সাধারণ ভঙ্গির উচ্চারণ ভিন্ন অন্যান্য ভঙ্গির উচ্চারণ সূচিত হয় না।" কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন—

"বিজোড় বিজোড় গাঁথ জোড়ে গাঁথ জোড়।
আটে ছয়ে হাঁফ ফেলে ঘুরে যাও মোড়।"—অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তকে শ্রুতিমধুর করাতে শব্দচয়নে বেজোড় মাত্রার শব্দের সঙ্গে বেজোড় মাত্রার এবং জোড় মাত্রার শব্দের সঙ্গে জোড়মাত্রার শব্দ গ্রহণ করা আবশ্যক, অর্থাৎ এক-তিন-পাঁচ প্রভৃতি মাত্রার শব্দকে দুই-চার-ছয় প্রভৃতি মাত্রার শব্দের পাশাপাশি ব্যবহার করলে ছন্দে মাধুর্য প্রকাশের সুবিধা বেশী হয়, কারণ এর ফলে ছন্দের দ্বিমাত্রিক চাল সুষ্ঠুভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন :

(১) শৃঙ্খলে শৃঙ্খলাবলী মান নাই মনে—
মূঢ় জনে তাই তোমা কহে উচ্ছৃঙ্খল,
প্রবল জীবন-বেগ জাতির জীবনে
মূর্ত তুমি মহাসত্ত্ব ! ওগো মহাবল !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'মহাকবি মধুসূদন'।

(২) দিন দিন হীনবীর্য রাবণ দুর্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।

—মধুসূদন দত্ত, 'মেঘনাদ বধ কাব্য, ১ম সর্গ'।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গতিকে কেউ কেউ 'গজেন্দ্র গমন' সদৃশ বলেছেন। এর ফলে এই ছন্দ সংযত-গম্ভীর ভাব প্রকাশোপযোগী মনে করা হয়, নাট্যকাব্য ও মহাকাব্য রচনার পক্ষে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আধার বিশেষ উপযোগী বলা হয়। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি ড. গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের মতে—(১) অক্ষর উচ্চারণে গদ্যের সাধারণ ভঙ্গি অনুসৃত হয়। (২) সুরের প্রাধান্য আছে বলে সমদৈর্ঘ্যের পর্বের পুনরাবৃত্তি খুব স্পষ্ট না হওয়ায় বিরাম গ্রহণে বেশ স্বাধীনতা পাওয়া যায়। (৩) সুরের প্রভাবে বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যস্থিত ফাঁকটুকু সহজে ভরে তোলা যায় বলে লঘু-গুরু সকল প্রকার অক্ষরের সমাবেশ করা যায়। (৪) তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব প্রভৃতি এবং যুক্তাক্ষরবহুল সাধুভাষার

সকল প্রকার শব্দের ব্যবহারের সুবিধা আছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দের নাম দিয়েছেন 'সাধুভাষার ছন্দ' তবু চলিত ভাষাতেও তিনি অক্ষরবৃত্তের চরণ রচনা করেছেন—

"কাঁঠালের ভূতি-পচা, আমানি, মাছের যত আঁশ,
রান্নাঘরের পাঁশ,
মরা-বিড়ালের দেহ, পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান-বাদন বাজায়।"

—রবীন্দ্রনাথ, 'অনসূয়া'।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কয়েকটি রূপকল্পের উদাহরণ দেওয়া যাক—

(১) পয়ার (লঘু ত্রিপদী)—১৪ মাত্রার স্তবক। চরণের শেষে পরবর্তী চরণের শেষ অংশের সঙ্গে চরণান্তিক অনুপ্রাস আছে। প্রতি চরণে অষ্টমমাত্রা শেষে অর্ধযতি এবং চতুর্দশ মাত্রা শেষে পূর্ণযতি থাকে।

কৃত্তিবাস রামায়ণ থেকে : মাত্রা ৮+৬=১৪
"বিদায় লইয়া রাম/মায়ের চরণে //
গেলেন লক্ষণসহ/সীতা সম্ভাষণে।" //

(২) **তরল পয়ার**। যে পয়ারে ৪র্থ ও ৮ম অক্ষরে অনুপ্রাস থাকে।

মাত্রা ৮+৬=১৪।
বিনা সূত কি অদ্ভুত/গাঁথে পুষ্প হার //
কিবা শোভা মনোলোভা/অতি চমৎকার //

—রামপ্রসাদ সেন, 'সুন্দরের মাল্যগ্রন্থন (বিদ্যাসুন্দর)'।

(৩) **মালঝাঁপ পয়ার**। চরণান্তিক মিল ছাড়াও ৪র্থ, ৮ম ও ১২শ অক্ষরে অনুপ্রাস। মাত্রা : ৮+৬=১৪।

মধ্যক্ষীণ, কুচ পীন/শশীহীন শশী।
আস্যবর, হাস্যবর/বিম্বাধর রাশি॥

(৪) **পর্যায়সম পয়ার**। ১ম ও ৩য় চরণ এবং ২য় ও ৪র্থ চরণে পর্যায়সম (alternative) অন্ত্যানুপ্রাস। মাত্রা : ৮+৬=১৪।

পরাধীন স্বর্গবাস/হতে গরীয়সী //
স্বাধীন নরকবাস,/অথবা নির্ভীক //
স্বাধীন ভিক্ষুক এক/তরুতলে বসি, //
অধীন ভূপতি হতে/সুখী সমধিক, //

—নবীনচন্দ্র সেন, 'পলাশীর যুদ্ধ,' ৪র্থ সর্গ।

(৫) **মধ্যসম পয়ার।** ১ম ও ৪র্থ চরণে এবং ২য় ও ৩য় চরণে অন্ত্যানুপ্রাস থাকে। মাত্রা : ৮+৬=১৪।

তেঁইগো প্রবাসে আজি/এই ভিক্ষা করি //
দাসের বারতা লয়ে/যাও শীঘ্রগতি, //
বিরাজে, হে মেঘরাজ,/যথা সে যুবতী, //
অধীর এ হিয়া, হায়,/যার রূপ স্মরি //

—মধুসূদন, 'মেঘদূত'।

(৬) **অমিল পয়ার।** চরণান্তিক অনুপ্রাস থাকে না। মাত্রা : ৮+৬=১৪।

তার শান্ত নিশাকালে/নিশ্বাস পতনে //
প্রহর গণিতে পারি/স্তব্ধ রজনীর //

—রবীন্দ্রনাথ, 'সম্মিলন'।

(৭) **ভঙ্গ পয়ার।** প্রথম চরণে ১৬ মাত্রা, দ্বিতীয় চরণে ১৪ মাত্রা। চরণের ১ম পর্বের পুনরাবৃত্তিও ঘটে। মাত্রা : ৮+৮=১৬, ৮+৬=১৪।

কন্যা বলি পৃথিবী/সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে/তুলিল সিংহাসনে॥

(৮) **লঘুভঙ্গ পয়ার।** চরণের ১ম পর্বে ৮ মাত্রা, ২য় পর্বে ৭ মাত্রা। ৮+৭ =১৫ মাত্রা।

ব্রহ্মাণ্ডের লয় যেন/কালান্তের নিনাদে। //
বিশ্ব কেন্দ্রে বিশ্বনাথ/পুরী কাঁপে শবদে॥ //
প্রতিধ্বনি ঘন ঘোর/মহাকাশে ছুটিল। //
দশদিকে দশবিম্ব/ঘন ঘন তুলিল॥ //

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দশমহাবিদ্যা'।

(৯) **পয়াররাজ।** ১৬ মাত্রার চরণ। চরণে ২টি পর্ব। চরণান্তিক অনুপ্রাস থাকে। মাত্রা : ৮+৮=১৬।

এখনো কাঁপিছে তরু/মনে নাহি পড়ে ঠিক—
এসেছিল বসেছিল/ডেকেছিল হেথা পিক! //
এখনো কাঁপিছে নদ,/ভাবিতেছে বার বার,— //
ঢলিয়া কি পড়েছিল/মেঘখানি বুকে তার। //

—অক্ষয়কুমার বড়াল।

১০। **মহা পয়ার।** (দীর্ঘপয়ার, দীর্ঘ দ্বিপদী)। ১৮ মাত্রার চরণ (৮+১০)। চরণান্তিক অনুপ্রাস আছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭–১৮৮৭) পদ্মিনী

উপাখ্যান কাব্য (১৮৫৮) থেকে সাম্প্রতিককালের কবিরাও এই ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন, করছেন।

(ক) অরি সিংহ নাম তাঁর,/অরি পক্ষে সিংহের সমান। //
—তিন দিন পরে শূর/সসৈন্যেতে রণভূমে যান ॥ //
—ঘোরতর রাগ-নাগ-/গরলে অন্তর জরজর। //
অদ্ভুত বীরত্ব বীর/দেখালেন শত্রুর ভিতর ॥ //
কোটি কোটি তারা-মাঝে/মৃগাঙ্কের প্রভাব যেমন। //
অস্থির শত্রুর দল। চারিদিকে করে পলায়ন ॥ //
—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অরি সিংহের যুদ্ধ (পদ্মিনী উপাখ্যান)'।

(খ) যার ভয়ে তুমি ভীত,/সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনই জাগিবে তুমি/তখনই সে পলাইবে ধেয়ে ॥
—রবীন্দ্রনাথ, 'এবার ফেরাও মোরে'।

(গ) আমরা ঘুমায়ে থাকি/পৃথিবীর গহ্বরের মত, //
পাহাড় নদীর পারে/অন্ধকারে হয়েছে আহত ॥ //
একা হরিণের মত/আমাদের হৃদয় যখন। //
জীবনের রোমাঞ্চের/শেষ হলে ক্লান্তির মতন ॥ //
—জীবনানন্দ দাশ, 'প্রেম'।

(ঘ) জন পাখিদের গানে/মুখরিত হবে কি আকাশ ? //
—ভাবে নির্বাসিত মন,/চিরকাল অন্ধকারে বাস। //
পাখিদের মাতামাতি,/বুঝি মুক্তি নয় অসম্ভব, //
যদিও ওঠেনি সূর্য,/তবু আজ শুনি জনরব ॥ //
—সুকান্ত ভট্টাচার্য, 'জনরব'।

(ঙ) পর্যায়সম অন্ত্যপ্রাসযুক্ত মহাপয়ার :
বৈপ্লবিক চিন্তাজালে/পিষ্ট আমি দিবসরজনী //
এ জীবনে শান্তি নেই /নানা ছাঁদে রুদ্ধ অবকাশ। //
তবু কেন কেঁপে ওঠে/নিপীড়িত আদিম ধমনী, //
শীতার্ত বনানী চেয়ে/জ্বলে কেন অবাধ্য পলাশ ? //
—মণীন্দ্র রায়, 'প্রত্যাগমন'।

১১। **ত্রিপদী**। চরণে তিনটি পর্ব থাকে। ১ম ও ২য় পর্বের শেষে মিল হয়, প্রতি দু'টি চরণে অন্ত্যানুপ্রাস থাকে এবং দু'টি চরণে স্তবক গঠিত হয়। ত্রিপদী দুই প্রকার—লঘু ও দীর্ঘ।

লঘু ত্রিপদী। (ক) মাত্রা : ৬+৬+৮=২০।

এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥

লঘুত্রিপদী। (খ) (মাত্রা—৮+৮+৬=২২। চরণের তিনটি পর্বকে একই পংক্তিতে সাজানো অবস্থায়—

ভাঙা বাঁশী জোড়া দিয়ে/বীণা ফেলে তাই নিয়ে/ফিরিয়া এলাম। //
বহু অপরাধ জমা,/স্নেহ ভরে কর ক্ষমা/লও মা প্রণাম //

কালিদাস রায়, প্রত্যাবর্তন।

দীর্ঘ ত্রিপদী। মাত্রা : ৮+৮+১০=২৬।

যে মোহিনী স্বর্ণটাটে/পাতে পাতে সুধা পটে, /
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা, //
হে মোর বঞ্চিত রাজ/নিঃশেষ বুঝেছি আজ /
আমি যে তাদেরি একজনা। //

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'কচি ভাব'।

১২। **চৌপদী।** প্রতি চরণে চারটি পর্ব। প্রথম তিন পর্বের শেষে মিল আছে। প্রতি দুই চরণে অন্ত্যানুপ্রাস আছে। দু'টি চরণে একটি স্তবক গঠিত। চরণগুলি সাধারণত দুই পংক্তিতে সাজানো।

চৌপদী দুই প্রকার—লঘু ও দীর্ঘ।

(ক) **লঘু চৌপদী।** মাত্রা : ৬+৬+৬+৫=২৩।

চির সুখীজন/ভ্রমে কি কখন।
ব্যাথিত বেদন/বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে/বুঝিবে সে কিসে।
কভু আশীবিষে/দংশেনি যারে ॥

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, 'সদ্ভাবশতক' (১৮৮১ খৃঃ)।

(খ) **দীর্ঘ চৌপদী।** মাত্রা : ৮+৮+৮+৬=৩০ ।

কি বলেছি অভিমানে/শুনো না শুনো না কানে।
বেদনা দিও না প্রাণে/ব্যাথার সময় ॥

—বিহারীলাল চক্রবর্তী, 'সারদামঙ্গল'।

১৩। **ললিত।** চারটি পর্বে চরণ, ১ম ও ২য় পর্বে অন্ত্যানুপ্রাস থাকে। প্রতি

দুই চরণ শেষে মিল এবং দুই চরণ মিলে স্তবক গঠিত। ললিত দুই প্রকার—লঘু ও দীর্ঘ।

(ক) লঘু ললিত। মাত্রা : ৬+৬+৬+৫=২৩।

হিমাদ্রি অচল/দেবলীলা স্থল।
যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত/পবিত্র স্থান॥
অমর কিন্নর,/যাহার উপর।
নিসর্গ নিরখি/জুড়ায় প্রাণ॥

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গঙ্গার উৎপত্তি'।

(খ) দীর্ঘ ললিত। মাত্রা : ৮+৮+৮+৬=৩০।

যখন যে ধন চাই/সেই ক্ষণে যদি পাই।
আমার মনের মত/বন্ধু হবে সেইলো॥

—ভারতচন্দ্র রায়, 'সামান্য বণিতা'।

১৪। **একাবলী**। প্রত্যেক চরণে দু'টি পর্ব থাকে। চরণের মাত্রা ৬+৫=১১। কিম্বা ৬+৬=১২। চরণে একটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব থাকায় এক সময়ে অপূর্ণ পর্বকে প্রথমের পূর্ণ পর্বের অন্তর্গত মনে করা হোত। ফলে একটি পূর্ণ পর্বে চরণ গঠিত বলে এই ছন্দকে 'একপদী পয়ার' বলা হোত। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী একে 'একপদী ছন্দ' নামকরণ করেন। বর্তমানে একে 'একাবলী' বলা হয়।

দুগ্ধে গুড়ে তিলে/মিশাইয়া লাউ। //
দধির সহিত/খুদের জাউ॥ //
শুন প্রভু কিছু/কহি অপর। //
চিঁড়া চাঁপাকলা/দুধের সর॥ //

—মুকুন্দরাম, 'কবিকঙ্কন চণ্ডী, সাধ ভক্ষণ'।

১৫। **অমিত্রাক্ষর (প্রবহমান পয়ার) ছন্দ**। এই ছন্দ পয়ারের অধ্যায়েই প্রতিষ্ঠিত। পয়ারে ছেদ ও পূর্ণযতি চরণের শেষে আবশ্যিক এবং দু'টি মাত্র পংক্তির মধ্যে একটি ভাবকে সমাপ্ত করতেই হবে। মধুসূদনের বিদ্রোহী মন যতি ও ছেদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ওই দুয়ের বন্ধন থেকে ছন্দকে মুক্তি দিলেন। এর ফলে ছন্দে প্রবহমানতা দেখা দিল। কবির ভাবকে পংক্তির পর পংক্তিতে ছড়িয়ে দিল। ভাব ও ছন্দের এই প্রবহমানতা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তকরূপে (বাংলা কাব্যে) মধুসূদনের বিশেষ অবদান। এর ফলে কবিতার অর্থ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। ভাবকে ছন্দের অনুরোধে থেমে থাকতে হয় না। ইংরেজি **Blank Verse**-এর বাংলা নাম

অমিত্রাক্ষর যথাযথ কিন্তু অমিত্রাক্ষরতা Blank Verse-এর মূল কথা নয়। তাই মধুসূদন-প্রবর্তিত ছন্দের যথার্থ নাম হওয়া উচিত 'প্রবহমান পয়ার ছন্দ'।

কৌটা খুলি রক্ষোবধূ/যত্নে দিল কৌটা * //
সীমন্তে * * সিন্দুর বিন্দু/শোভিল ললাটে * //
গোধূলিললাটে তাহা/তারা রত্ন যথা * * //
কৌটা দিয়া পদধূলি। লইল সরমা * * //

পয়ারের মতই চোদ্দ মাত্রার চরণ কিম্বা অন্ত্যমিল নেই। পয়ারের মতো যতি ও ছেদ একস্থানে পড়ছে না। ছেদ এক ঝোঁকে যতটা পড়া চলে তারপরই পড়ছে। হ্রস্ব-যতি ও দীর্ঘ-যতির স্থান কিন্তু নির্দিষ্ট আছে। প্রসঙ্গত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের বক্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য—

"একথা বলা প্রয়োজন যে, তাল মান লয় যোগে স্বরের ক্ষেত্রে এ ছন্দের লীলা ও মহিমার পূর্ণ প্রকাশ হলেও ছন্দোময় কণ্ঠের আবৃত্তিতেও এর লীলামাধুর্য সম্পূর্ণ অপ্রকাশ থাকে না। তবে সেক্ষেত্রে ছন্দের পূর্ববিভাগ বাক্‌পর্বের অনুযায়ী হওয়া চাই। নতুবা ছন্দের প্রাণবস্তুটাই মারা পড়ে। গানের তাল ছন্দপর্ব বা বাকপর্ব অনুযায়ী না হলেও চলে। য়ুরোপে কোনো জনসভায় একবার একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগনমন' রচনাটি। কবে কখন এখন মনে নেই। এখানে রবীন্দ্রভবনে তার সবাক চলচ্চিত্রটি রক্ষিত আছে। তার থেকে আমি কবিকণ্ঠে 'জনগনমন' রচনার আবৃত্তি শুনেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর অভিজ্ঞ ও অভ্যস্থ কণ্ঠের আবৃত্তিতে ওই রচনাটির প্রত্যাশিত ছন্দোমাধুর্য অতি সুন্দরভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। আমি অনুভব করেছি যে, অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথের হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, দেশ দেশ নন্দিত করি, মাতৃ-মন্দির পুণ্য-অঙ্গন, দ্বিজেন্দ্রলালের পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে প্রভৃতি বহু রচনাই সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠের আবৃত্তিতে জয়দেবীছন্দের লীলামাধুর্যে স্বতোবিলসিত হয়ে ওঠে। আমি গীতরসমুগ্ধ শ্রোতা, কিন্তু আমার কণ্ঠে সুর নেই। তাই ছেলেবেলা থেকেই শ্রুতি-মুখের প্রেরণায় আমি ওসব রচনা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করে নিজের কানের রায় নিয়েছি। সে রায় সর্বদাই আবৃত্তির অনুকূলে গিয়েছে। অর্থাৎ ওসব রচনার গীতরসের ন্যায় আবৃত্তিরসেও আমি মুগ্ধ। কিন্তু শুধু ভাব গ্রহণের জন্য এসব রচনা নীরবে পড়া যায় না। ওরকম নীরব পাঠ বীণাযন্ত্রের ঝংকার না শুনে তার রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার মতই নিরর্থক। কেন না এসব রচনার ভাবরস ও ছন্দোরস বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন ও মধুসূদনের পদাঙ্কানুসরণ করে

অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেন কিন্তু মাধুর্যসৃষ্টিতে শব্দ নির্বাচনের আসল তত্ত্বটি ঠিকমত অনুধাবন করতে না পারার ফলে গাম্ভীর্য, ধ্বনিতরঙ্গ, চরণমধ্যস্থ শ্বাসাঘাতের স্বল্পতা, ছন্দোযতি ও ভঙ্গ-যতির বিশেষ অমিত্রতা এবং প্রবহমানতার অভাবে এঁদের সৃষ্ট ছন্দ মধুসূদনের মতো হিল্লোলিত হয়নি। তাই তাঁদের অমিত্রাক্ষরকে মিলহীন পয়ার ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। একটি করে উদাহরণ দিয়ে পার্থক্য দেখানো যেতে পারে :

(ক) **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—**

হে মিত্র অমাত্যগণ,/ + না দেখিয়া হায়। // +
কি বীরত্ব দেখাইলা/অন্তিমে কুমার ! // +
সুত আমি তার, + কত/যুদ্ধে নিরখিনু// +
সে বীরের বীরদর্প,/ + কিন্তু কভু হেন
অদ্ভুত অস্ত্রক্ষেপ/ + চক্ষে না হেরিনু,// +
না শুনিনু এ শ্রবণে ! / + বীর চূড়ামণি// +
মৃত্যুকালে দেখাইলা/বীরের বীরত্ব// +

—বৃত্রসংহার, ত্রয়োদশ সর্গ।

(খ) **নবীনচন্দ্র সেন—**

চাহিয়া গর্জিলা ক্রোধে/উন্মত্ত অর্জুন ;// +
কুরুক্ষেত্র থরথর/উঠিল কাঁপিয়া।// +
নিক্ষেপি গাণ্ডিব ধনু/ + বামে ও দক্ষিণে,// +
কাঁপায়ে কোদণ্ড শব্দে/কুরুক্ষেত্র পুনঃ// +
কহিলেন, + ধর্মরাজ/ + এ প্রতিজ্ঞা মম,// +
না লয় আশ্রয় তব/কালি জয়দ্রথ,// +
না লয় পুরুষোত্তম/কৃষ্ণের আশ্রয়,// +
কালি জয়দ্রথে আমি/করিয়া সংহার// +
বরষিব শান্তি বারি/ + এই শোকানলে//
আমাদের/ + ·········

—কুরুক্ষেত্র, পঞ্চদশ সর্গ।

(গ) **মধুসূদন দত্ত—**

রুষিলা বাসবত্রাস !/ + গম্ভীরে যেমতি//
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে/ + জীমূতেন্দ্র কোপি,// +
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,/ + 'ধর্মপথগামী,//
হে রাক্ষস রাজানুজ,/ + বিখ্যাত জগতে //

তুমি; + কোন্ ধর্মমতে/কহ দাসে, + শুনি, // +
জ্ঞাতিত্ব, + ভ্রাতৃত্ব, + জাতি — + এ সকলে দিলা//
জলাঞ্জলি ? + শাস্ত্রে বলে/ + গুণবান্ যদি//
পরজন, + গুণহীন/স্বজন, + তথাপি//
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ,/ + পরঃ পরঃ সদা'//

—মেঘনাদবধ, ষষ্ঠসর্গ।

১৬। **অমিত্রাক্ষর ছন্দ (সমিল)**।

বাংলায় পয়ারের দুই চরণের অন্ত্যানুপ্রাস বজায় রেখে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনা করেন রবীন্দ্রনাথ। সুতরাং সমিল প্রবহমান পয়ার বা অমিত্রাক্ষরের স্রষ্টা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে পয়ার ও মহাপয়ারকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের ভিত্তি হলো শুধুমাত্র পয়ার। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অমিল ও সমিল দুই প্রকারের প্রবহমান পয়ারেই কবিতা রচনা করেছেন, যদিও অমিল অমিত্রাক্ষরে রচনা খুবই কম। অমিল ও সমিল রচনায় (রবীন্দ্রনাথের) দু'টি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে :—

অমিল। মাত্রা : ৮ + ১০ = ১৮।

এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদী পার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংস ক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। —প্রান্তিক, ১৭ নং কবিতা।

সমিল। মাত্রা : ৮ + ১০ = ১৮।

যেন চেয়ে ভূমি পানে—
অবসাদে-অবনত ক্ষীণ শ্বাস চির প্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,
ক্লান্তিভারে আঁখি পাতা বন্ধপ্রায়। শুন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দন তিলক ভালে,
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগন প্রাঙ্গণে ;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণি কঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা ॥ —অবরুদ্ধ ছিল বায়ু।

জ্যেষ্ঠ-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য রচনার পর রবীন্দ্রনাথ মহাপয়ারের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর রচনায় মহাপয়ার বিশেষ শক্তিশালীরূপে দেখা দেয়। মাত্রা : ৮ + ১০ = ১৮।

হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই ওঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দশদিশি।

—রবীন্দ্রনাথ, 'সমুদ্রের প্রতি'।

১৭। **গৈরিশ ছন্দ**—অমিত্র ছন্দকে ঠিকমত আবৃত্তি করলে গদ্য ছন্দের মত শোনায়। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাই এ সম্ভাবনাকে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। অমিত্রাক্ষরের চোদ্দ অক্ষরের চরণ ভেঙে গিরিশচন্দ্র ভাবানুযায়ী ছেদ টেনে চরণ রচনা করেন। একেই গৈরিশ ছন্দ বলা হয়। এই ছন্দের রচনা নাটকীয় আবেগ সৃষ্টির উপযোগী।

(ক) দেব, তব পদে/শত নমস্কার,
হল মম/ভ্রান্তিনাশ,
প্রবুদ্ধ অন্তর/তব বীরবাক্য শুনে।

—এক কথায় এই ছন্দে পদ্যের পর্বকেই চরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) সিরাজ/— বঙ্গের সন্তান —। হিন্দু-মুসলমান,/
বাঙ্গলার সাধহ কল্যাণ,/
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—/
নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর।/
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার,/
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,/
স্বার্থপর —। চাহেমাত্র রাজ্য-অধিকার,—/
হও সবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।

—গিরিশচন্দ্র, 'সিরাজদৌলা,' ১ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক।

পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুও তাঁর কবিতায় এই ছন্দের অনুসরণ করেন—

ঊর্ধ্বে মম রক্তিম আকাশ —/
প্রভাত সূর্যের লজ্জা/রঞ্জিত করিছে অরণ্যানী। /
সদ্য-নিদ্রা-জাগরিত গগনের/পাণ্ডুভাল-'পরে/
বহ্নিশিখা করিছে অর্পণ :/

কামনার বহ্নি সে যে,/স্বপনের সলজ্জ বিকাশ। /
গোলাপের বর্ণে বর্ণে স্বপ্ন সুধা মাখা, /
আরক্তিম অন্তর নিয়ে/একাকী বসিয়া আছি আমি /
উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে। / —বুদ্ধদেব বসু, 'শাপভ্রষ্ট'।

১৮। **মুক্তক ছন্দ**—এই ছন্দের ভিত্তি সমিল অমিত্রাক্ষরের উপর প্রতিষ্ঠিত। মিত্রাক্ষরের অবস্থান বোঝাতে পয়ার ও মহাপয়ারের পর্ব ভেঙে রবীন্দ্রনাথ নানা পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত করেন। চরণগুলি স্বভাবতই তাই প্রায় অপূর্ণপদী হয়। পূর্ণ চরণের দৈর্ঘ্য (৮ + ১০) বা (৮ + ৬) অর্থাৎ মহাপয়ার বা পয়ার-এর চরণ-দৈর্ঘ্যের সমান হয়। ছন্দের পর্বগুলি যুক্ত অবস্থায় থেকে পয়ার বা মহাপয়ারের চরণ-সৃষ্টি করে, কোথাও বা একটি অপূর্ণ-পর্বিক চরণরূপে অবস্থান করে, আবার কোথাও বা তিনটি চরণ একত্র হয়ে একটি ত্রিপদী গঠন করে। মনে রাখা দরকার এই ছন্দের প্রতিটি ছত্র এক একটি চরণ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা' কাব্য গ্রন্থের কবিতায় এই ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে একে অসম চরণসমিল অমিত্রাক্ষরও বলে। যেমন—

যদি তুমি মুহূর্তের তরে।
ক্লান্তিভরে
—দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব। পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে।

অসম চরণ অমিল মিত্রাক্ষর ছন্দ। একেও বলে মুক্তক ছন্দ :

হে সবিতা! তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অনাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি। আপন সত্তারে
মৃত্যুর অতীত।

প্রবহমান পয়ার, ভাঙা অমিত্রাক্ষর এবং ভাঙা মিত্রাক্ষরের আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক—

(ক) মহাপয়ারের ভিত্তিতে রচিত প্রবহমান ছন্দে বিভিন্ন প্রকারের মিল ব্যবহার—

প্রাণ নাই, ভান আছে—জন্ম মৃত্যু দুই বিড়ম্বনা,
মরণ যে হত্যা শুধু, বেঁচে থাকা বিধাতার গ্লানি!

শাস্ত্র আছে—শিখিয়াছি ভালোমতে করিতে বঞ্চনা
মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বার্থত্যাগে অতি-সাবধানী।
দিবসে তারকা খুঁজি দীপ্ত রবিরশ্মি পরিহরি,
ধর্ম জানে পুরোহিত!—মোরা জানি তাহারি অর্চনা!
ভুলেছি ওঙ্কারনাদ, আত্মার সে আদি-ব্রহ্মবাণী,
মুক্তি নাই, শুক্তি আছে—মুক্তি নয়, মন্ত্র জপ করি।

—মোহিতলাল মজুমদার, 'নবতীর্থঙ্কর'।

(খ) ভাঙা অমিত্রাক্ষর :

হে সজ্জন!
স্বভাবের সুনির্মল পটে
রহস্য রসের সঙ্গে—
চিত্রিনু চরিত্র—দেবী সরস্বতী বরে।
কৃপাচক্ষে হের একবার
শেষে বিবেচনামতে
তিরস্কার কিম্বা পুরস্কার
যাহা হয় দিও তাহা মোরে—
বহু মানে লব শিরপাতি।

—কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাচার নক্শা', দ্বিতীয় ভাগ।

(গ) ভাঙা মিত্রাক্ষর (অসম-সমিল-প্রবহমান ছন্দ) :

গদা সদা নামে
কোনো এক গ্রামে
ছিল দুই জন।
দূর দেশে যাইতে হইল;
দুজনে চলিল।
ভয়ানক পথ—পাশে গণ্ড ফণী বন,
ভাল্লুক শার্দূল তাহে গর্জে অনুক্ষণ।
কাল সর্প যেমতি বিবরে,
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে,
পথিকের অর্থ অপহরে,
কখনো বা প্রাণ নাশ করে।

—মধুসূদন, 'গদা ও সদা'।

১৯। চতুর্দশপদী বা সনেট

সনেট শব্দটি ইটালীয়ান 'সনেটো' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। "The Sonnet (diminative from Italian 'Sono'=Sound) is a short lyrical poem Complete in one stanza, containing fourteen lines of five measured verse—" Prof. Bain. চতুর্দশ শতকের ইতালীয়ান কবি পেত্রার্ক (১৩০৪—৭৪ খৃঃ) সনেটের উদ্ভাবক। দান্তে, ট্যাসো প্রমুখ ইতালীয়ান কবিদের মতো শেক্‌সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স্‌, রসেটি, আর্নল্ড, ক্রক্‌ প্রমুখ ইংরেজ কবিগণ সনেট রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করেন। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন সনেটের প্রবর্তক। এক অখণ্ড কবি-ভাবনা সনেটে আত্মপ্রকাশ করে। পয়ার অথবা অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলায় সনেট রচিত হয়। ১৪ অক্ষরবিশিষ্ট চোদ্দ পঙ্‌ক্তিতে এর আত্মপ্রকাশ। চোদ্দ পঙ্‌ক্তি বা চরণ আবার দু'ভাগে বিভক্ত: প্রথম আট চরণ (অষ্টক বা Octave) তারপর ছয় চরণ—(ষটক্‌ বা Sestet)। পেত্রার্ক প্রবর্তিত সনেটের চরণান্তিক মিল নিয়মবদ্ধ (কখ খক+কখখক) +(গঘঙ+গঘঙ) বা (গঘঙ+ঘগঙ)। মধুসূদন পেত্রার্ক-প্রবর্তিত রূপটি প্রধানতঃ গ্রহণ করেন। মধুসূদন পরবর্তীকালে বাংলাভাষায় রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার এবং আধুনিক যুগে অনেক বিখ্যাত কবি সনেট রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রথম আট চরণে ভাব কল্পনাটি রূপলাভ করে আর পরের ছয় চরণে ঐ ভাব কল্পনা ব্যাখ্যাত হয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। কঠিন বন্ধনের জন্য সনেট কবিকল্পনাকে সঙ্কুচিত করতে হয় ফলে উদ্দাম কাব্যোচ্ছ্বাস সংযত বন্ধনে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

সনেট কেন চতুর্দশ পদী হয় সে সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য হল: "আমার বিশ্বাস, বাংলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা ১৪ হবার একমাত্র কারণ এই যে, বাংলাভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ হয় তিন অক্ষরের নয় চার অক্ষরের। পাঁচ ছয় শব্দ প্রায়ই হয় সংস্কৃত নয় বিদেশী। সুতরাং সাত অক্ষরের কমে সকল সময়ে দু'টি শব্দের একত্র সমাবেশের সুবিধা হয় না। সেই সাতকে দ্বিগুণ করে নিলেই শ্লোকের প্রতি চরণ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচলিত শব্দই ঐ চোদ্দ অক্ষরের মধ্যে খাপ খেয়ে যায়।" অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এবং অন্য কোনো কোনো কবি ১৮ বা ১৬ অক্ষরেও চতুর্দশপদী রচনা করেছেন। আলোচনা বিস্তৃত না করে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক;

(১) **মধুসূদন দত্ত—**

অষ্টক কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে — ক
কালীদহে। বসি বামা শতদল দলে — খ
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে — খ

মনোহারা) বাম করে সাপটি হেলনে — ক
গজেশে গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে — ক
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধপরিমলে, — খ
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে — খ
কার না ভোলেরে মনঃ, এ হেন ছলনে। — ক
ষটক্ কবিতা পঙ্কজরবি, শ্রীকবি কঙ্কন — গ
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে' ! যশঃ-সুধাদানে — ঘ
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী — ঙ
বাগ্দেবী। ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ — গ
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ? — ঘ
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলেকামিনী। — ঙ

—কমলে কামিনী।

(২) **প্রমথ চৌধুরী ;**

"ফরাসী কবিদের পদাঙ্কানুসরণে সনেট লিখতে শুরু করি। ইতালীয় সনেটের সঙ্গে ফরাসী সনেটের প্রভেদ হল—দুই সনেটেই প্রথম অক্ষর সমান। শেষ ষট্‌কে প্রভেদ আছে। ফরাসীরা ছয়কে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম একটি দ্বিপদী পরে একটি চতুষ্পদী। সনেটের technique বড় কঠিন অন্তত আমার পক্ষে। ফরাসী সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ। এরই মধ্যে একটু সহজ বলে ফরাসী কর্মটাই আমি নিই।"

পেত্রার্কা চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ, — ক
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেট সাকার। — খ
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার, — খ
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ! — ক
নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ ! — ক
বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার, — খ
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার, — খ
একথা পণ্ডিতে বোঝে, মূর্খে লাগে ধন্দ ।। — ক
ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন, — গ
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন ।। — গ
ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ, — ঘ
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট। — ঙ

কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহা বিজাতীয় গন্ধ — ঘ
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট ! — ঙ

—একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বটকের প্রথম দুই চরণে দোহার (Couplet) সৃষ্টি হয়েছে।

(৩) **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ** চতুর্দশ অক্ষর না হয়ে আঠারো অক্ষরবিশিষ্ট দীর্ঘ পয়ারে রচিত সনেট :

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্ত পানে ;
কোথায় সঙ্কয় তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে।
ওই শোনো, সংখ্যাহীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এককালে ছিল রূপ, ছিল বুঝি ভাষা ;
বিশ্ব গীতি নির্ঝরের তীরে তীরে বুঝি কত বাসা
বেঁধেছিল কোন্ জন্মে ; দুঃখে সুখে নানাবর্ণে রাঙি
তাহাদের রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙি
অতৃপ্ত আশার ধূলি স্তূপে। আকার হারালো তারা,
আবাস তাদের নাহি। খ্যাতিহারা সেই স্মৃতিহারা
সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শুধু মূর্তি-তরে, আশ্রয়ের তরে।
রাগে অনুরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ শূন্য দীর্ঘশ্বাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে।

(৪) **মোহিতলাল মজুমদার ঃ** ইনি চতুর্দশপদী রচনায় অন্য প্রকার মিলের উপস্থাপনা করেছেন—

ছল-ভরা কলহাস্যে জলতল ফুঁসিছে ফেনিল — ঙ
ঈর্ষার অজস্র কণা, অর্ধ-মগ্ন শবের দশনে — চ
বিকাশে বিদ্রূপ-ভঙ্গি, কুৎসা-ঘোর কুহেলি ঘনায় ! — ছ
তবু পার হতে হবে, বাঁচাইতে হবে আপনায় — ছ
নগ্ন-বক্ষে, পাল তুলি একমাত্র উত্তরী-বসনে, — চ
ধর হাল—বদ্ধ করি করাঙ্গুলি আড়ষ্ট, আনীল। — ঙ

—মোহিতলাল, 'আহ্বান'।

(৫) **সুধীন্দ্রনাথ দত্ত :** পয়ারের পরিবর্তে অধিকাংশ সনেটই অক্ষরবৃত্তের মহাপয়ারের ভিত্তিতে রচনা করেন। সনেটের স্তবক বিভাগেও বিভিন্নতা লক্ষণীয়। অন্ত্যানুপ্রাস প্রয়োগে কখনো অষ্টকে মধ্যসম মিল, ষটক্-এ পর্যায়সম মিল এবং পরিশেষে একটি দ্বিপদী বা কাপ্‌লেট দেখা যায়।

মনেরে বুঝায়ে বলি/মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে — ক মাত্রা ৮
গ্রহ, তারা, নীহারিকা/ধায় নিত্য বিয়োগের পথে ; — খ = ১০
বস্তুর দুর্দান্ত চিতা অনির্বাণ শূন্যের সৈকতে ; — খ = ১৮
কালের অদৃশ্য গতি ব্যক্ত শুধু বিপ্লব বর্ধনে। — ক
সালোক্য, সাযুজ্য, সঙ্গ, সে কেবলই সম্ভব স্বপনে ; — গ
বিসংবাদ, বিকর্ষণ আর্যসত্য জাগ্রত জগতে ; — ঘ
ছুটি মোরা মর্ত্যচর আত্মঘাতী আবর্তের স্রোতে, — ঘ
ফেনিল সম্মোহে মেতে, লুব্ধকেন্দ্র নাস্তির শোষণে। — গ
হার মানে খিন্ন মন। দেহ কিন্তু অক্ষয় উৎসাহে — ঙ
পরিব্যাপ্ত ব্যবধানে রচে সদা বাসনার সেতু ; — চ
তন্ময় মুহূর্ত মাঝে অনন্তের আবির্ভাব চাহে ; — ঙ
দেখে জন্ম-মরণেরে কণ্ঠশ্লেষে বাঁধে মীনকেতু। — চ
আজিকে দেহের পালা, রিক্ত শেজে শুয়ে তাই ভাবি — ছ
হয়তো বা তারই কাছে পড়ে আছে অমরার চাবি। — ছ

—সুধীন্দ্রনাথ, 'দ্বন্দ্ব'।

(৬) **জীবনানন্দ দাশ :** 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থে অধিকাংশ সনেট স্থান পেয়েছে। সনেটগুলির অধিকাংশের মাত্রাবিন্যাস হল—৮+৮+১০ অথবা এদের মিলিত মাত্রাবিন্যাস।

সে কত পুরোনো কথা— / যেন এই জীবনের / ঢের আগে আরেক জীবন ; —ক
তোমারে সিঁড়ির পথে / তুলে দিয়ে অন্ধকারে / যখন গেলাম চলে চুপে —খ
তুমিও ফেরনি পিছে— / তুমিও ডাকনি আর ;— / আমারও নিবিড় হল মন —ক
যেন এক দেশলাই / জ্বলে গেছে—জ্বলিবেই— / হালভাঙা জাহাজের স্তূপে —খ
আমার এ-জীবনের / বন্দরের ; তারপর / শান্তি শুধু বেগুনি সাগর —গ
মেঘের সোনালি চুল— / আকাশে উঠেছে ভরে / হেলিওট্রোপের মতো রূপে —খ
আমার জীবন এই ; / তোমারো জীবন তাই ; / এইখানে পৃথিবীর পর —গ
এই শান্তি মানুষের, / এই শান্তি। যতদিন / ভালবেসে গিয়েছি তোমারে —ঘ
কেন যেন লেগুনের / মতো আমি অন্ধকারে / কোন্ দূর সমুদ্রের ঘর —গ

চেয়েছি—চেয়েছি, আহা /…ভালোবেসে না-কেঁদে কে পারে —ঘ
তবুও সিঁড়ির পথে / তুলে দিয়ে অন্ধকারে / যখন গেলাম চলে চুপে —খ
তুমিও দেখনি ফিরে— / তুমিও ডাকনি আর— / আমিও খুঁজিনি অন্ধকারে —ঘ
যেন এক দেশলাই / জ্বলে গেছে—জ্বলিবেই / হালভাঙা জাহাজের স্তূপে —খ
তোমারে সিঁড়ির পথে / তুলে দিয়ে অন্ধকারে / যখন গেলাম চলে চুপে। —খ

—'যেন এক দেশলাই'।

(৭) **বুদ্ধদেব বসু:** অধিকাংশ সনেটই মহাপয়ারের ভিত্তিতে রচিত। ১ম ও ৪র্থ, ২য় ও ৩য়, ৫ম ও ৮ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম, ৯ম ও ১২শ এবং ১০ম ও ১১শের পঙ্‌ক্তিতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রয়োগ করে দু'টি পঙ্‌ক্তিতে দ্বিপদী (Couplet) সংযোজন ঘটেছে।

তোমারে স্মরণ করি / আজ এই দারুণ দুর্দিনে — ক (মাত্রা ৮ + ১০ = ১৮)
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম / সভ্যতার শ্মশান-শয্যায় — খ
সংক্রমিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়; — খ
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে — ক
সুন্দরেরে বিদ্ধ করে, মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন, — গ
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো।' — ঘ
দেশে-দেশে সমুদ্রের তীরে-তীরে কাঁপে থরোথরো — ঘ
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ। — গ
প্রাণরুদ্ধ, প্রাণস্তব্ধ। ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে — ঙ
লুব্ধতার লালা ঝরে। এত দুঃখ, এ দুঃসহ ঘৃণা — চ
এ-নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু, যদি না — চ
লিপ্ত হোত রক্তে মোর, বিদ্ধ হোত গূঢ়মর্মমূলে — ঙ
তোমার অক্ষয়মন্ত্র। অন্তরে লভেছি তব বাণী — ছ
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি। — ছ

—'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'।

(৮) **বিষ্ণু দে:** অধিকাংশ সনেটই পয়ারের ভিত্তিতে রচিত। মিলের দিক থেকে তিনি নানান পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন।

পাহাড়ের চল ভেঙে / নামে স্বচ্ছ শত স্রোতস্বিনী — ক
মাটির অমোঘ বাঁকে / জমে তারা; বিপ্লবীর ভিড় — খ
দুরন্ত ঘূর্ণিতে ক্ষিপ্র, বেগবন্ধ, হানে শত চিড় — খ
তরল প্রণতি তার; ভাবে, আজ প্রাণ দিয়ে জিনি — ক
স্রোতের পরম ক্লান্তি; কোন দূর সমুদ্রের ডাক — গ

মর্মে মর্মে তোলে সুর। খড়্গপুরে এই ভীমবাঁধে — ঘ
হাভেলী প্রান্তরে মাতে লাল জল স্বচ্ছন্দে অবাধে। — ঘ
সূর্যাস্তের অস্তাকাশে ওড়ে টিয়া, ঝাঁকে ঝাঁক — গ
হরিয়াল, এঁকে যায় হিরণ্ময় হৃদয়ের ঘটা — ঙ
শুন্তের প্রসাদ এক উৎসীর মুহূর্তে প্রতীক। — চ
ভাবি পাখি? নাকি জল? জলস্রোত, ঘূর্ণি, লাল জল, — ছ
তরল গতির ছন্দ মাটির পয়ারে পায়দল, — ছ
ভেঙেছে জহ্নুর জানু, ছিঁড়েছে কালের ঘনজটা, — ঙ
কর্দমাক্ত বর্তমান ভবিষ্যে বিহঙ্গ সামুদ্রিক। — চ

বিষ্ণু দে, 'সনেট' (দুই)।

(৯) **মনীন্দ্র রায়ঃ** 'নবচতুর্দশপদী' নাম দিয়ে ইনি যে সনেটগুলি রচনা করেন তার স্তবকগঠন প্রচলিত ৮ ও ৬ পঙ্‌ক্তির বিভাগসমন্বিত নয়। প্রথমে তিন পঙ্‌ক্তিতে পর পর চারটি স্তবক গঠন করে শেষে আর একটি স্তবকে দু'টি পঙ্‌ক্তিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। মিলের ক্ষেত্রেও অন্ত্যানুপ্রাস গ্রহণ ও বর্জন করা হয়েছে। মহা-পয়ারের ভিত্তিভূমিই কবির কাঙ্খিত কিন্তু শেক্‌সপীরিয়ন রীতি পদ্ধতিই তিনি কাম্য করেছেন।

কেন যে হৃদয় ভুলে / বার বার ঘুরি অন্যমনা — ক ৮ + ১০ মাত্রা
ভিক্ষার দরিদ্র বেশে, কেন-যে এখনো স্বপ্নসাধ — খ
সাজায় তোমাকে রত্নে (ভুলে পরকীয় সে গহনা — ক
প্রেমের অযোগ্য!) কেন প্রতিদিন চৌর অপবাদ — খ
মানি, কেন এ-কাঙাল মন স্বকীয় রক্তের বীজে — গ
জন্ম দিতে পারে না সে তরু ঊর্ধ্বে যার মহাকাশ — ঘ
রৌদ্রস্নাত নীল, নিয়ে যার মূল স্মৃতির রাগিণী — ঙ
সবুজ প্লাবনে, আহা, কেন সেই প্রাণের আদিম — চ
বিদ্রোহের অলংকারে হে প্রেয়সী তোমাকে বাঁধিনি, — ঙ
বাজেনি সর্বাঙ্গে কেন শ্যামাগ্নির সে রুদ্র ডিণ্ডিম — চ
এ আমার অক্ষমতা। বালুডাঙা হৃদয়ে ধুতুরা — ছ
নাও তাই। ও-বসন্তে দেব রক্তফাটা কৃষ্ণচূড়া॥ — ছ

—'কেন যে হৃদয় ভুলে'।

(১০) **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীঃ** নীরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ সনেট মহাপয়ারের ভিত্তিতে রচিত, 'নীলনির্জন' ও 'অন্ধকার বারান্দা' কাব্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। প্রথম

চার পঙ্ক্তিতে মধ্যসমমিল এবং পরের চার পঙ্ক্তিতে পর্যায়সম মিল আছে। এছাড়া ১ম ও ৫ম এবং ৪র্থ ও ৭ম পঙ্ক্তির শেষে মিল লক্ষণীয়।

এখন অস্ফুট আলো। / ফিকে ফিকে ছায়া-অন্ধকারে — ক ৮+১০=১৮ মাত্রা)
অরণ্য, সমুদ্র হ্রদ, রাত্রির শিশিরসিক্ত মাঠ — খ
অস্থির আগ্রহে কাঁপে, আসে দিন, কঠিন কপাট — খ
ভেঙে পড়ে। দুর্বিনীত দুরন্ত আদেশ শুনে কারো — গ
দীর্ঘ রাত্রি মরে যায়, ধ্বসে পড়ে জীর্ণ রাজ্যপাট; — খ
নির্ভয় জনতা হাঁটে আলোর বলিষ্ঠ অভিসারে। — ক
হে এসিয়া, রাত্রিশেষ, 'ভস্ম-অপমান-শয্যা' ছাড়ো, — গ
উজ্জীবিত হও রূঢ় অসঙ্কোচে রৌদ্রের প্রহারে। — ক
শহরে, বন্দরে, গঞ্জে, গ্রামাঞ্চলে, খেতে ও খামারে — ক
জাগে প্রাণ, দ্বীপে দ্বীপে মুষ্ঠিবদ্ধ আহ্বান পাঠায়; — ঘ
অগণ্য মানবশিশু সেই ক্ষিপ্র অনিবার্য ডাক — ঙ
দুর্জয় আশ্বাসে শোনে, দৃঢ় পায়ে হাঁটে। তারপরে — ক
ভারতে, সিংহলে, ব্রহ্মে, ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায় — ঘ
বীতনির্দ্র জনস্রোতে বিদ্যুৎ-উল্লাসে নেয় বাঁক। — ঙ

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'এসিয়া'।

(১১) **শক্তি চট্টোপাধ্যায়ঃ** কবির 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কাব্যে সন্নিবিষ্ট আছে বেশ কয়েকটি সনেট। নানান পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন তিনি তাঁর রচনায়—মিলের ও অন্ত্যানুপ্রাসের ক্ষেত্রে। শেক্‌সপীরিয়ান অনুপ্রাস রীতিতে রচিত তাঁর একটি সনেট। (৮+১০=১৮ মাত্রা)

কখনো জাগিনি আগে / ভোরবেলা ঘাসের মতন — ক
শিশিরে, চপেটাঘাতে, কিংবা ঝাউবন চূর্ণ করা — খ
হাওয়ায় জাগিনি আগে ভোরবেলা, কখনো এমন — ক
জাগিনি, আমার চিত্ত চিরকাল ছিল জয় করা — খ
বিকাল বেলার। আমি মাঝরাতে ঘুরেছি বাগানে। — গ
একি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায় — ঘ
জন্ম কি এমনই ভালো? সন্ধ্যা হতে দেয় না সেখানে — গ
অহংকার আলো করে রেখে দেয় মলিন জামায়। — ঘ
কখনো জাগিনি আগে ভোরবেলা, না জাগিলে আর — ঙ
কেমনে পেতাম ঘাসে শিশিরের নৈঃশব্দে করুণা — চ

অবিরাম বুকে হেঁটে পার হওয়া—জীবনে পাহাড় — ঙ
বাঘেরও অসাধ্য, আমি বাঘ হতে বড় জন্তু কি না! — চ
একি স্বাভাবিকভাবে আজ তুমি জাগালে আমায় — ছ
একি এ একাকী জন্ম ভোরবেলা উজ্জ্বল জামায়। — ছ

—শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' ৬১নং কবিতা।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনা শেষ। এবার মাত্রাবৃত্ত।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ঃ এই ছন্দে চরণের পর্বগুলিতে প্রতিটি ধ্বনিই প্রাধান্য পায়। অক্ষরধ্বনির স্পষ্ট উচ্চারণ দ্বারা মাত্রার পরিমাণ ঠিক করা হয় বলে একে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলা হয় (ধ্বনির প্রাধান্য থাকায় ধ্বনিপ্রধান ছন্দ বলেও একে অভিহিত করা হয়। কেউ কেউ দুর্বল উচ্চারণ-ভঙ্গির ছন্দ, অসমমাত্রার ছন্দ বা মধ্যলয়ের ছন্দরূপেও একে অভিহিত করেন)। এর রীতি—(১) পর্ব স্বরান্ত ও হলন্ত কিম্বা কেবল অক্ষর দ্বারা গঠিত হয়। (২) একই শব্দের অন্তর্ভুক্ত যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বর, হলন্ত-অক্ষরের স্বর, অনুস্বার বিসর্গের পূর্ববর্তী হলন্ত অক্ষরের স্বর, ঐ, ঔ যৌগিক স্বরদ্বয়—সকল ক্ষেত্রেই দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক ধরা হয়। অন্য সকল স্বরই হ্রস্ব কিম্বা এক মাত্রিক হয়। (৩) পর্বগুলি ৪, ৫, ৬, ৭ বা ৮ মাত্রায় হয়। (৪) ছন্দের লয় মধ্য। সাধারণত সমস্ত বাংলা গান এই ছন্দে রচিত হয় বলে একে পদছন্দও বলা হয়ে থাকে।

পর্বাঙ্গ নির্দেশ করতে হলে মাত্রাবৃত্তের পাঁচ ও সাত মাত্রার (বিষম মাত্রার) পর্বকে ৩+২ ও ৩+৪ পর্বাঙ্গে বিভক্ত করা হয়। কখনো বা ২+৩ ও ৪+৩ পর্বাঙ্গ বিভাগও ঘটে। উদাহরণ দেওয়া যাক—

পাঁচ মাত্রার :

১ ২ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ২ | ১ ১
জগৎ জুড়ে | উদাস সুরে | আনন্দ গান | বাজে।

১ ২ ১১ | ১ ২ ১১ | ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১
সে গান কবে | গভীর রবে | বাজিবে হিয়া | মাঝে

সাত মাত্রার :

৩ ২ ২ | ৩ ২ ২ |
এতই আছে বাকি | জমেছে এত ফাঁকি |

৩ ২+২ | ৩ ২+২ |
কত যে বিফলতা | কত যে ঢাকাঢাকি— |

৩ ২ ২ | ৩ ২ ২
আমার ভাল তাই | চাহিতে যবে যাই

২+১ ২ ২ ২
ভয় যে আসে মনো মাঝে।

এই ছন্দে যৌগিক অক্ষরের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। এর দ্বারা গীতি-কবিতা রচনায় এবং অন্য ভাষার ছন্দ অনুকরণে সুবিধা হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ভিত্তিতে জাপানী 'তান্‌কা' এবং মালয়ের 'পান্তুম্‌' ছন্দের অনুকরণ করে বাংলা রচনা করেন—

তান্‌কা— অশ্রুর দেশে
হাসি এসেছিল ভুলে;
সে হাসিও শেষে
মরণে পড়িল ঢুলে,
অশ্রু-সায়র কূলে। 'তান্‌কাসপ্তক, অভ্রআবীর'।

পান্তুম—(ভিক্টর হুগোর একটি কবিতা অবলম্বনে রচিত):

প্রজাপতিগুলি খেলিয়া ফিরিছে পাখার ভরে,
শৈল-মেখলা সিন্ধুর কূলে গেল গো তারা!
পঞ্জর তলে মন কাঁদে মোর কাহার তরে,
জন্ম অবধি সারাটা জীবন এমনি ধারা! —সত্যেন্দ্রনাথ, 'অতুলন'।

(চার্ল্‌স্‌ বোদ্‌লেয়র-এর একটি কবিতা অবলম্বনে রচিত):

বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম ফুলগুলি ফেলে শ্বাস,
শিহরি গুমরি বাজিলে বেহালা যেন সে ব্যথিত মন
সান্দ্র ফেনিল মূর্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্তন!
সুন্দর-ম্লান, দেবী সুমহান সীমাহীন নীলাকাশ।

—সত্যেন্দ্রনাথ, 'সন্ধ্যার সুর'।

বহু ভাষাবিদ্‌ কবি সত্যেন্দ্রনাথের এ জাতীয় অনেক অনুবাদ আছে, বাহুল্যবোধে উদাহরণ প্রদান পরিহার করা হলো। বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্য যুগে মাত্রাবৃত্তে যৌগিক অক্ষর এবং কখনো কখনো দীর্ঘ স্বরান্ত অক্ষর দ্বৈমাত্রিকরূপে গণ্য করা হোত। চর্যাপদ ও বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে এর অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হবার পূর্বে তত্ত্বগত একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় যদিও তাঁর ছন্দ বিষয়ে সারস্বত সাধনার প্রথম যুগে (১৯২২-২৩) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের অনুসরণে মাত্রাবৃত্ত নামটি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এই ছন্দ প্রকরণের নাম 'কলাবৃত্ত' রাখার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে গেছেন। তাঁর বক্তব্য—"বাংলায় এক রীতির ছন্দে ধ্বনিপরিমিত হয় কলাসংখ্যানুসারে, আর এক রীতির হয় দলসংখ্যানুসারে। অর্থাৎ এক রীতিতে ছন্দের মাত্রা কলা, আর-এক রীতিতে

দল। বাংলায় দু'রকম মাত্রা থাকাতেই কলা ও মাত্রা শব্দকে অভিন্নার্থক বলে স্বীকার করা যায় না। তাই, বাংলা কলামাত্রক ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলা যায় না, বলা উচিত কলাবৃত্ত।" অবশ্য নামকরণ ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অন্য অনেকের নানা বিষয়ে ভিন্নতর বক্তব্য আছে। বাহুল্যবোধে সেগুলির উল্লেখ পরিহার করছি।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতা আবৃত্তির ব্যাপারে ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি। "স্থিতি অপেক্ষা গতির দিকে এর লক্ষ্য অধিক হওয়ায় মধ্যলয়ের এই ছন্দের কবিতায় আবৃত্তিতে সুরেলাভঙ্গি প্রয়োগ করা উচিত নয়। আবৃত্তিতে কবিতার ভাব ও শব্দের ধ্বনি-মাধুর্যের প্রতি যেমন লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনি ছন্দোবৈশিষ্ট্যকেও অবহেলা করলে চলবে না। মাত্রাবৃত্ত সুরপ্রধানরীতির ছন্দ নয়। এটা ধ্বনিপ্রধানছন্দ। শব্দের ধ্বনি-সংগীত ফুটিয়ে তোলার দিকে আবৃত্তির সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া ভাব অনুযায়ী কণ্ঠভঙ্গি (Modulation) প্রয়োগ করতে গিয়ে যে সামান্য সুর আসবে তাকে অবহেলা করা যাবে না। সুরেলা-ভঙ্গি আর এ সামান্য সুরে অনেক পার্থক্য।" ড. ভট্টাচার্য আরো বলছেন—"মাত্রাবৃত্তে যুক্তধ্বনিবিশ্লিষ্ট করে উচ্চারণ করতে হয়, এর মাত্রা প্রকরণের জন্য। তার ফলে শব্দের উচ্চারণরীতিতে কিছু—কিঞ্চিৎ সুর এসে যায়। কাজেই এর সঙ্গে গীতিধর্মের সামান্য সম্পর্ক আছে। এসবের জন্য মাত্রাবৃত্তের কবিতা আবৃত্তিতে সুরের আভাস থাকবে। কিন্তু তাই বলে সুর টেনে টেনে এই ছন্দের কবিতা আবৃত্তির কথা একেবারেই অচিন্ত্যনীয়। তা করলে কবিতা ছন্দোভ্রষ্ট হবে, কবির প্রকাশভঙ্গিকেও অবমাননা করা হবে। যাঁদের ছন্দোবোধ নেই, অশিক্ষিত পটুত্ব নিয়ে তাঁরা এই কাজই করে থাকেন।"

এবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিভিন্ন রূপকল্পের পরিচয় :

চতুর্মাত্রিক পর্ব :

মধুকর | বন্দিত ¦| নন্দিত | সহকার মাত্রা ৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬
মুকুলিত | নত শাখে | মুখ চাহে | কহ কার।

—রবীন্দ্রনাথ, 'কবি'।

পঞ্চমাত্রিক :

(১) রূপসী বলে | যায় না তারে/ডাকা মাত্রা ৫ + ৫ + ২ (অপূর্ণ ৩ মাত্রা)
কুরূপা তবু | নয় সে তাও | জানি ;
কী মধু যেন | আছে সে মুখে | মাখা ;
কী বরাভয়ে | উদ্ধত সে— | পাণি ॥ —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'সংশয়'।

(২) আমরা দেব | বোবাকে ধ্বনি, মাত্রা ৫+৫
থোঁড়াকে দ্রুত | ছন্দ ৫+৩ (অপূর্ণ ২ মাত্রা)
লক্ষ বুকে রয়েছে খনি,
আমরা নই প্রলয় ঝড়ে অন্ধ। —সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'কাব্যজিজ্ঞাসা'।

ষাণ্মাত্রিক :

(১) প্রথম পেয়ালা | কণ্ঠ ভেজায়, মাত্রা ৬+৬
দ্বিতীয় আমার | জড়তা নাশে ; ৬+৫ (অপূর্ণ ১ মাত্রা)
তৃতীয় পেয়ালা | মশগুল্ করে
মজ্‌লিশ ক্রমে | জমিয়া আসে ; —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'চায়ের পেয়ালা'।

(২) ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা | জীবনের জয়- | গান ৬+৬+৬+২
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ? অপূর্ণ ৪ মাত্রা
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার !
—নজরুল, 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'।

সপ্তমাত্রিক

(১) নন্দ নন্দন | চন্দ চন্দন | গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ মাত্রা ৭+৭+৭+৩
জলদ সুন্দর | কম্বু কন্দর | নিন্দি সিন্দুর | ভঙ্গ। (অপূর্ণ মাত্রা ৪)
—গোবিন্দ দাস, 'গৌরলীলা'।

মাত্রাবৃত্ত ও অতিপর্ব :

পর্বে গতিবেগ সঞ্চার করতে পর্বের আগে যে অতিরিক্ত ধ্বনিগুচ্ছের ব্যবহার হয় তাকে অতিপর্ব বা অতিমাত্রিক পর্ব বলে। এই অতিপর্ব স্বগতোক্তির মতো ব্যবহৃত হয়ে দ্রুত উচ্চারিত হয়। হ্রস্বপর্বের গতি বেশি, তাই সাধারণত হ্রস্বপর্বের কবিতাতে অতিপর্বের ব্যবহার দেখা যায়।

মাত্রা ৬+৬+৬+২ প্রথমে তিন মাত্রায় অতিপর্ব :

(১) ও গো মা, রাজার দুলাল / যাবে আজি মোর / ঘরের সমুখ / পথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে রহিব বলো কী মতে
বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন্ বরণের বাস
মাগো, কী হ'ল তোমার, / অবাক্ নয়নে / মুখপানে কেন / চাস্ ?
—রবীন্দ্রনাথ, 'শুভক্ষণ'।

স্বরবৃত্তছন্দ : (শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ, বলবৃত্ত ছন্দ, প্রাকৃত ছন্দ, ছড়ার ছন্দ, প্রবল উচ্চারণভঙ্গির ছন্দ, দ্রুতলয়ের ছন্দ)।

চরণের প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত বা প্রস্বর পড়ে বলেই এই নাম। একে বলবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দও বলা হয়। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(১) ছন্দের পর্ব স্বরান্ত ও হলন্ত উভয়বিধ অক্ষরের মিশ্রণে গঠিত হয়। (২) প্রতি পর্বের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে প্রবলভাবে। (৩) পর্বের অক্ষরের কোনো স্বরই দীর্ঘ নয়, সব হ্রস্ব, যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরও হ্রস্ব। (৪) প্রতি পর্বে চারটি করে অক্ষর থাকে, বেশী অক্ষর থাকলেও দ্রুত উচ্চারণের দ্বারা চার অক্ষরে পরিণতি লাভ করে। (৫) চরণগুলি সাধারণত চার পর্বের বেশী হয় না, শেষের পর্বটি অপূর্ণ-পদী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় ৫।৬টি পর্বও ব্যবহার করেছেন। (৬) এই ছন্দের লয় দ্রুত। উদাহরণ দেওয়া যাক—

১। **কে** মেরেছে / **কে** ধরেছে / **কে** দিয়েছে / **গাল**
তাই তো খুকু / **রাগ** করেছে / **ভাত** খায়নি । **কাল**।

২। **আজি** ডাঙা / **কাজি** ডাঙা / **মধ্যে** ধনে- / **খালি**
সেখান থেকে / **এলো** ব্যাঙ / **চৌদ্দ** হাজার / **ঢালি**।

৩। **আমি** যদি / **জন্ম** নিতেম / **কালি** দাসের / **কালে**।
দৈবে হতাম / **দশম** রত্ন / **নব** রত্নের / **ভালে**॥

[উচ্চারণের সময় বড অক্ষরগুলির উপর জোর দিতে হবে]

মাত্রাবৃত্তের ঢঙে পড়লে পর্বগুলি কোনোটি চার কোনোটি পাঁচ হয়ে যাবে। শ্বাসাঘাত দিলে পর্বসমিতি ঠিক থাকবে। এগুলি যে স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত ছন্দের অন্তর্ভুক্ত হবে তা বিশেষ পর্বগুলি (কালে, ভালে ইত্যাদি) দেখলেই বোঝা যায়। কারণ এরা স্বরান্ত অক্ষর দ্বারা গঠিত। সর্বোপরি, পর্বের গোড়ায় প্রবল শ্বাসাঘাত তো আছেই। অবশ্য কখনো কখনো ব্যতিক্রম ঘটে।

স্বরবৃত্তের প্রতি পর্বে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। তাই এই ছন্দলক্ষণের জন্য একে প্রস্বরপ্রধান, শ্বাসাঘাতপ্রধান অথবা বলবৃত্ত ছন্দ বলা হয়ে থাকে। একে স্বরবৃত্ত বলা হয় কারণ মাত্রার হিসাব নির্ণীত হয় পর্বের স্বরসংখ্যা গণনা করে। ব্রতকথা, বাউল, ভাটিয়ালি গান, পল্লীগাথা, ঝাড়ফুঁক-মন্ত্র ইত্যাদি সমস্ত লোকসাহিত্যের প্রধান বাহনরূপে এই ছন্দের নাম লৌকিক ছন্দ। তাছাড়া গ্রাম্য ছড়াগুলিও মোটামুটিভাবে এই ছন্দে রচিত হয়, তাই একে বলা হয় ছড়ার ছন্দ। এ সম্পর্কে আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের বক্তব্য—"ছড়ার ছন্দটি যেমন ঘেঁষাঘেঁষি শব্দের জায়গা, তেমনি সেই সব ভাবের উপযুক্ত—যারা অসতর্ক চালে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলে, যারা পদাতিক, যারা

রথচক্রের মোটা চিহ্ন রেখে যায় না পথে পথে, যাদের হাটে মাঠে যাবার পায়ে-চলার চিহ্ন ধূলোর ওপর পড়ে আর লোপ পেয়ে যায়।"

যেহেতু এই ছন্দ লোকসাহিত্যের বাহন, তাই একে প্রাকৃত ছন্দও বলা হয়। প্রবোধচন্দ্রের ভাষায়—"এই প্রাকৃত ছন্দটি বাংলার একান্ত ঘরোয়া ছন্দ বা আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলাদেশের চিত্রটাকে একেবারে শ্যামল করিয়া ছাইয়া রাখিয়াছে।" স্বরবৃত্ত বাংলার লোক সাহিত্যে স্বমহিমায় স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। তাই, 'বাংলার প্রাণপাখি' এই ছন্দ সম্পর্কে ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য—"এ নিরক্ষরের ছন্দ। সংস্কৃতের উক্তিতে এর চেহারা বদলে যায় নি; সেইজন্যে ভাষার নিজস্ব রূপটি এতে বজায় আছে। তাই বাইরে থেকে বোঝা যায় এর বুকের ভিতর—

কত ঢেউয়ের টলমলানি কত স্রোতের টান!
পূর্ণিমাতে সাগর হতে কত পাগল বান।"

আবৃত্তিকারদের আর একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে—এই ছন্দ পয়ার ঘেঁষা। মাঝে মাঝে ফাঁক আছে। পাঠ বা আবৃত্তির সময় উচ্চারণের কৌশলে সেই ফাঁক পুরণ করতে হয়। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক—

(১) শোন শোন গল্প শোন, 'এক যে ছিল গুরু',
এই আমার গল্প হল শুরু।
যদু আর বংশীধর যমজ ভাই তারা,
এই আমার গল্প হল সারা। —সুকুমার রায়।

(২) তেলের শিশি ভাঙ্‌লো বলে' খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো

তার বেলা?

ভাঙ্‌ছো প্রদেশ ভাঙ্‌ছো জেলা জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা কারখানা আর রেলগাড়ী

তার বেলা?

যুদ্ধ জাহাজ জঙ্গী মোটর কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির চলছে যেন হরির লুট

তার বেলা?

চায়ের বাগান কয়লাখনি কলেজ থানা আপিসঘর
চেয়ারটেবিল দেয়ালঘড়ি পিওন পুলিস প্রোফেসর

তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙলো বলে' খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা বাংলা ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা ?

—অন্নদাশংকর রায়।

(৩) এই আমাদের শাপলা শালুক কদমকেয়ার দেশে
হিজল পিয়াল তাল তমালের ছায়ায় ঢাকা গ্রাম,
মন জুড়ানো মাটির সুবাস হাওয়ায় বেড়ায় ভেসে
ধানের দেশ আর গানের দেশ, এই দেশেরই নাম।

দোয়েল ঘুঘু পিক্ পাপিয়ার কূজন কলতান
সকাল-দুপুর-সন্ধ্যাবেলা মুখর করে রাখে,
মন কেড়ে নেয় মেঠো সুরে রাখাল ছেলের গান
রূপালী-চাঁদ-জোছনা ছড়ায় খেজুর বনের ফাঁকে।

বারো মাসে ষড় ঋতুর পরে নানান বেশ
এই আমাদের বউটুবানী, পান-সুপারীর দেশ ॥

—ইবনে সিরাজ, 'সোনার কাঠি রূপোর কাঠি'।

এই যে উদাহরণগুলি দেওয়া হলো তার বিস্তৃত ব্যাখ্যান বাহুল্যবোধে পরিহার করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

দেখা যাচ্ছে স্বরবৃত্ত ছন্দ একটু শিথিল হলেই পয়ারের অবয়বে প্রকাশমান হয়। তাই, পয়ারের প্রতি যেমন তার টান তেমনি টান আছে মাত্রাবৃত্তের প্রতিও। সেই জন্য এই ছন্দকে পণ্ডিতজন দ্বিধর্মী বলেছেন। ফাঁক থাকলে পয়ার আর কিছুটা বে-ফাঁকভাবে রচিত হলে মাত্রাবৃত্ত। উদাহরণ দেওয়া যাক—

(ক) **স্বরবৃত্ত—**

বৃষ্টি পড়ে / টাপুর টুপুর / নদে এল / বান।
শিবঠাকুরের / বিয়ে হবে / তিন কন্যে / দান ॥

—প্রাচীন ছড়া।

এই প্রাচীন ছড়াকে রবীন্দ্রনাথ পয়ার এবং মাত্রাবৃত্ত দুই ধরনেই রচনা করে দেখিয়েছেন। পয়ারের ধরনে—

জল পড়ে / টিপি টিপি / নদী এল / বান
শিব ঠাকু- / রের বিয়ে / তিন মেয়ে / দান।

মাত্রাবৃত্তের ধরনে—

বৃষ্টি পড়ছে / টাপুর টুপুর / নদেয় আসছে / বন্যা
শিব ঠাকুরের / বিয়ের বাসরে / দান হবে তিন / কন্যা।

প্রাচীন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে দ্রুতগতিলয়সম্পন্ন এক প্রকারের ছন্দের চল্ ছিল, তাকে বলা হোত ধামালি ছন্দ। অবশ্য এর 'দীর্ঘমূলপর্ব' চার অক্ষরে সীমাবদ্ধ থাকতো না এবং পর্বের মাত্রা সমষ্টিও চার বা চারের কম বেশী হোত। পাঠ অথবা আবৃত্তির সময় ধ্বনি-সংকোচন কিম্বা ধ্বনি সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে প্রতি পর্বের ধ্বনি-সংগতি রক্ষিত হোত।

উদাহরণঃ (১) ধ্বনি-সংকোচন (**নিম্নরেখাঙ্কিত** অংশে)

যমুনাবতী / সরস্বতী / কাল যমুনার / বিয়ে—
যমুনা যাবেন / শ্বশুর বাড়ী / **কাজিতলা** / দিয়ে।

—প্রাচীন ছড়া।

(২) ধ্বনি সম্প্রসারণ (**নিম্নরেখাঙ্কিত** অংশে)

কুঠেল সব— / শাহেবজাদা, / ধপ্‌ধপে / বাইরে সাদা,
ভিতরে— / পচাকাদার / ভড়ভড়ানি,
পেঁকো গন্ধ / তায়।

—ঈশ্বর গুপ্ত, 'নীলকর'।

[উচ্চারণের সময় বড় অক্ষরগুলির উপর জোর দিতে হবে]

ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে স্বরবৃত্ত ছন্দের আবৃত্তি প্রসঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন যা উদ্ধৃত করা হলো—"স্বরবৃত্তের প্রত্যেক পর্বের প্রথম অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। এতে যুগ্মধ্বনি কখনো বিশ্লিষ্ট হয়ে উচ্চারিত হয় না। এর সকল অক্ষর একমাত্রা মানের। এই ছন্দের লয়ও দ্রুত। স্বরবৃত্তের এক একটি পর্বে চার মাত্রার শব্দের মধ্যে পাঁচ বা ছয় মাত্রার সমাবেশ করার প্রচেষ্টা থাকে। অর্থাৎ পর্বে যুগ্মধ্বনির সমাবেশ করার চেষ্টা করা হয়। ওসব যুগ্মধ্বনিও একমাত্রা মাপের। স্বরবৃত্তে অযুগ্মঅক্ষর যেমন দ্রুত উচ্চারিত হয়, যুগ্মঅক্ষরও তেমনি দৃঢ়সংলগ্ন অবস্থায় দ্রুত উচ্চারিত হয়। এসবের ফলে স্বরবৃত্তে এক প্রকার নতুন ধ্বনিতরঙ্গ উদ্ভূত হয়। অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তে এ জাতীয় ধ্বনিতরঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাছাড়া স্বরবৃত্ত ছন্দ গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব অপেক্ষা চঞ্চল ভাব প্রকাশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। সমস্ত মিলিয়ে আবৃত্তির সময় স্বরবৃত্তের ধ্বনি-তরঙ্গ-সঙ্গীত অনেক সময় অতিরিক্ত স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায়, কবিতার ভাবকে ছাপিয়ে ছন্দের প্রাবল্য আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভাব ও রস কবিতার মুখ্য বস্তু ; ছন্দ ও ধ্বনি আনুষঙ্গিক ও সহায়ক মাত্র।

কণ্ঠস্বরভঙ্গি, উচ্চারণ-রীতি, শ্বাসাঘাত ও নতুন ধ্বনিতরঙ্গ-বৈশিষ্ট্য সব মিলিয়েও যেন আবৃত্তিতে কাব্য-ভাব ঢাকা না পড়ে এবং ছন্দোরীতিই যেন প্রাধান্য না পায়। উল্লিখিত বিষয়গুলিরও মর্যাদা দিতে হবে এবং কাব্য-ভাবও কণ্ঠে ফোটাতে হবে। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে না পারলে আবৃত্তিতে রসহানি হবে। স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতা আবৃত্তির সময় এ বিষয়ে যথেষ্ট খেয়াল রাখা দরকার।”

স্বরবৃত্তের রূপকল্প : শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দে পর্ব চার অক্ষরে ছয় মাত্রার সমাবেশ না করা গেলে সঠিক রূপ প্রকাশ করা যায় না—এ সত্য রবীন্দ্রনাথই প্রথম উপলব্ধি করেন। প্রাচীনকাল থেকে এর চল্ থাকলেও সাধুসাহিত্যের আসরে স্থানলাভের কৌলিন্য রবীন্দ্রনাথের হাতেই সম্ভবপর হয় সর্বপ্রথম। উদাহরণ—

আমি যদি । জন্ম নিতেম
কালিদাসের । কালে
বন্দী হতেম । না জানি কোন্।
মালবিকার । জালে। —রবীন্দ্রনাথ, 'সেকাল'।

যুগ্মঅক্ষরহীন চার মাত্রার পর্ব—

(১) বাইরে ছিল । সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু । ধর্ম-ধোয়া ।
পুণ্য-খাতায় । জমা শূন্য,
ভণ্ডামীতে । চারটি পোয়া ॥
—মধুসূদন, 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রেঁা', ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

(২) আমাদের এই । গ্রামের নামটি । অঞ্জনা,
আমাদের এই । নদীর নামটি । খঞ্জনা,
আমার নামতো । জানে গাঁয়ের । পাঁচজনা,
আমাদের সেই । তাঁহার নামটি । রঞ্জনা। —রবীন্দ্রনাথ, 'সুসময়'।
| | | |

(৩) সিন্ধু-সাগর, । বিন্দু সাগর, । লক্ষ পতি । শ্রীমন্ত
বক্ষে আজো । জাগিয়ে রাখে । লক্ষ্মী প্রদীপ । নিরন্ত।
কামরূপা তুই । কামাখ্যা তুই, । দাক্ষায়ণী । দক্ষিণা,
বিশ্বরূপা । শক্তিরূপা । নও তুমি নও । দীন-হীনা ।
—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি'।

[উচ্চারণের সময় বড় অক্ষরগুলির উপর জোর দিতে হবে]

(৪) যেতে যেতে 4 মাত্রা।
ঘরের দেয়াল | রাঙা আলোয় | জড়িয়ে ধরে ; 6 + 8 + 8 মাত্রা।
জানলা ধারে | রশ্মিমালা 8 + 8 মাত্রা।
চেনা গাছে 8 মাত্রা।
সব দেওয়া তার | চাওয়ায় ভরে, 8 + 8 মাত্রা।
যতই মেঘের | দূরে দাঁড়ায় 8 + 8 মাত্রা।
হাসে চির- | দিনের হাসি ॥ 8 + 8 মাত্রা।
—অমিয় চক্রবর্তী, 'দিনান্ত'।

(৫) নীল কমলের | আগে দেখি | লাল কমল যে | জাগে,
তৈরি হাতে | নিদ্রাহারা | একক তরো- | য়াল, |
লাল তিলকে | ললাট রাঙা, | উষার রক্ত | রাগে
কার এসেছে | কাল ? —বিষ্ণু দে, 'যৌভোগ'।

(৬) আলতা নুড়ি | গাছের গুঁড়ি | জোড় পুতুলের | বিয়ে।
এত টাকা | নিলে বাবা | দূরে দিলে | বিয়ে ॥ —প্রাচীন ছড়া।

স্বরবৃত্ত ছন্দ ও অতিপর্ব :

(১) হের কুঞ্জবনে / নাচে ময়ূর / কলাপখানি / তুলে
ওরে শাঙনমেঘের / ছায়া পড়ে / কালো তমাল / মূলে।
—রবীন্দ্রনাথ, 'জন্মান্তর'।

(২) ওরে বনমানুষের / হাড়ের পাশা / অন্ধ বনের / চিন.
মানুষের তুই / হাতের পাশা / হু'স কি কোন / দিন ?
কিম্বা বুনোই / এমনিরে তুই / আড়ির মতই / আড় !
ওরে বনমানুষের / হাড ! —সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বনমানুষের হাড়'।

[উচ্চারণের সময় বড় অক্ষরগুলির উপর জোর দিতে হবে]

বাংলা কাব্য-ছন্দের তিনটি ভাগ-অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত সম্পর্কে সারসংক্ষেপ স্বরূপ বলা যায় অক্ষরবৃত্তে অক্ষর, মাত্রাবৃত্তে মাত্রা এবং স্বরবৃত্তে স্বরই প্রাধান্য পায়। অবশ্য এই বৃত্তবিভাগ কিছুটা অবাস্তব এবং বিতর্কমূলক। অক্ষরবৃত্তের এমন অনেক চরণ উদ্ধৃত করা যায় যেখানে ১৪টি মাত্রা থাকলেও ১৪টি অক্ষর নেই যেমন—

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।

স্বরবৃত্তে স্বরই যে প্রধান তাও বলা যায় না। অবশ্য স্বরবৃত্তের ছন্দে প্রতিটি স্বরই

এক মাত্রার এবং প্রতিটি পর্বে ৪টি করে মাত্রা থাকে কিন্তু এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে ৪টি স্বর নেই কিন্তু ৪টি মাত্রা ঠিক আছে :

বাপ বললে, | কান্না তোমার | রাখো

চরণটির প্রথম পর্বে স্বর আছে তিনটি কিন্তু চার মাত্রার পর্ব ধরতে হবে। অতএব স্বরবৃত্ত ছন্দেও স্বরই প্রধান নয়, মাত্রাই প্রধান। আর মাত্রাবৃত্তে যে মাত্রাপ্রাধান্য থাকবে তা নামকরণেই বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং ছন্দকে তিন ভাগে ভাগ করার ক্ষেত্রে মাত্রাই প্রাধান্য পাচ্ছে, যদিও মাত্রা-গণনাপদ্ধতি সমান নয়, অক্ষরবৃত্তে দীর্ঘ অক্ষর শব্দের শেষে থাকলে দুই মাত্রার, আর সব স্থানে এক মাত্রার, মাত্রাবৃত্তে দীর্ঘ অক্ষর যেখানেই থাকুক দুই মাত্রার স্বরবৃত্তে সব অক্ষরই এক মাত্রার। কিন্তু এরও কোনো স্থিরতা নেই, অনেক ব্যতিক্রম আছে। সুতরাং মাত্রা গণনার পদ্ধতির দিক থেকে বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাজনও পরিপূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত নয়। এমনকি উচ্চারণরীতি ও পর্বের দৈর্ঘ্যের তারতম্য দিয়েও বাংলা ছন্দের বিভাজন প্রকৃতপক্ষে অসুবিধাজনক। কারণ বাংলা উচ্চারণে শিথিলতা ও অঞ্চলগত বৈচিত্র্য।

সুতরাং যতদিন পর্যন্ত বাংলা শব্দের উচ্চারণের নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরী না হবে ততদিন পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে ছন্দবিধি গড়ে উঠতে পারবে না।

নিয়মসিদ্ধ সংস্কৃত ছন্দের রীতি অনুসরণে অতীতে ভারতচন্দ্র, বলদেব পালিত, সত্যেন দত্ত প্রমুখ কবিগণ কিছু কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করলেও সর্বজনীনভাবে তা সার্থক হয়নি বলাই যুক্তিযুক্ত। পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এ জাতীয় প্রয়াসের দু'টি উদাহরণ উল্লেখ করছি :

(১) **মালিনী ছন্দে :**

উড়ে চলে গেছে বুলবুল শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

(২) **মন্দাক্রান্তা ছন্দে :**

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও।
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও॥

আবৃত্তির প্রাসঙ্গিকতায় পদ্যছন্দের বিধি ও রীতিনীতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা গেল। এবার গদ্যছন্দ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য নিবেদন করা যাক।

গদ্যছন্দ বা গদ্য কবিতার ছন্দ :

আমরা জানি যে কোন রচনায় বিশেষ করে কাব্যে রসই প্রাণবস্তু আর ছন্দ তার পরিচয়বাহী অনুষঙ্গ। আর রসসাহিত্য হলো অন্তরের জিনিস। তাই শব্দার্থের অতিরিক্ত কিছু বস্তুর কাজ করে ছন্দ। কারণ ছন্দ শুধু কয়েকটি রূপকল্পের মধ্যে

সীমাবদ্ধ নয়, ভাষার সহায়তায় ভাবকে প্রাণসত্তায় উদ্ভাসিত করে তোলা তার কাজ। কিন্তু পদ্যছন্দের কাঠামোর বাঁধুনি সব সময়ে ভাবকে রসমণ্ডিত করতে সাহায্য করে না। সাধারণভাবে গদ্যের আবেদন মস্তিষ্কে আর কবিতার আবেদন হৃদয়ে। কিন্তু আধুনিক কবিরা মনে করেন জীবনধর্মী কবিতা রচনায় পদ্য-ছন্দ অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। এবং আধুনিক কবিদের এই মনে হওয়া থেকেই গদ্যছন্দ বা গদ্য কবিতার সৃষ্টি এবং বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারেও আমাদের পথিকৃৎ। গদ্য কবিতার বাহ্যরূপ যাইই হোক না কেন অন্তররূপে ছন্দের গন্ধ ও স্পর্শ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত রবীন্দ্র-বক্তব্যই উদ্ধৃতিযোগ্য মনে করছি: "এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনাছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাইবা লাগল, তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব, না তার চলনকে? সে চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর, বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্য মালমশলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্য কাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গি আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি শাড়ীর প্রান্ত তুলে ধরা আধা ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।"

অতএব, মানুষের বাস্তব সামাজিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ভিত্তিক কবিতা রচনায় গদ্যরীতির ছন্দ বা গদ্য-ছন্দ বিশেষ উপযোগী, কারণ গদ্য কবিতার ছন্দ সংগীতধর্মী নয়। তাছাড়া ছন্দের স্বভাব যুক্ত হওয়ার ফলে গদ্যের চেয়ে মনের ওপর এর প্রভাব অনেক বেশী। অবশ্য গদ্যে ভাবকে ছন্দোবন্ধে বাঁধার জন্য সাধারণত গদ্যে অপ্রচলিত কিছু নামধাতু (বিষ > বিষাইছে, লতা > লতাইবে, হাত > হাতাইল); পুছ (জিজ্ঞাসা করা), নেহারো, হের (দেখা); উর (অবতরণ কর) প্রভৃতি ধাতু; সমাপিকা (চলিতেছে > চলিছে, ছিলাম > ছিনু) এবং অসমাপিকা (মিলিয়া > মিলি, লাগিয়া > লাগি) ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ—নিঠুর, তব, মম, সনে, দিঠি, পরাণ, সাথে, হেথা, নারে, যেমতি, তেমতি, পানে ইত্যাদি ছন্দোগন্ধী কৃত্রিম শব্দের ব্যবহার, মাত্রাবিন্যাস ও অনুপ্রাস সৃষ্টির জন্য স্বাভাবিক বাক্য-রীতিতে কিছুটা কৃত্রিমতা আনা হয়।

আমরা জানি গদ্যের অর্থবাহক শব্দগুলিকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজানো হয়, যার দ্বারা শব্দগুলির বলার শক্তি বাড়ে। পদ্যেও এই রীতি অনুসৃত হয়। আর যেহেতু চলতি গদ্যে অনেক রসও বক্তব্যকে একই সঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, সেহেতু গদ্য কবিতার ছন্দকে ভাবের অনুবর্তী করে সাজাতে হয় যার দ্বারা গদ্যের মধ্যেও পদ্যের

রঙ ফুটে ওঠে। ছন্দিত গদ্যের (Rhythimic Prose) এই বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ রবীন্দ্র রচনা থেকেই দেওয়া যাক—

কিন্তু গোয়ালার | গলি
দোতলা | বাড়ির
লোহার গরাদে দেওয়া | একতলা ঘর
পথের | ধারেই ;

—এটি নিঃসন্দেহে গদ্য কিন্তু কবিতাও বটে। কারণ এর মধ্যে স্বাভাবিক ছন্দ লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত। এই গদ্য-ছন্দ "মুক্তকছন্দ"-এর মতোই কবিতাকে অনেক বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। রবীন্দ্রনাথের লিপিকা, পুনশ্চ, শ্যামলী প্রভৃতি গ্রন্থে এই গদ্য কবিতার নিদর্শন পাওয়া যাবে। আমাদের বক্তব্য বিশ্লেষণের সুবিধার্থে রবীন্দ্র রচনা থেকেই আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

আমি বললেম, 'সুরসিকে, খুশি হবে না,
এ গদ্য কাব্য।'
কপালের ভ্রূকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে
বললে, 'আচ্ছা, তাই সই।'
সঙ্গে একটু স্তুতিবাক্য দিলে মিলিয়ে ;
বললে 'তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।'
বলে গলা ধরলে জড়িয়ে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'ময়ূরের দৃষ্টি'।

অনেকের জানা আছে 'বৃত্তগন্ধি রচনা' নামে সংস্কৃত-সাহিত্যে ছন্দোগুণযুক্ত গদ্য রচনার চল ছিল, যাতে গদ্যে কোনো কোনো সময়ে ছন্দের লক্ষণ পরিদৃশ্যমান হোত। কিন্তু গদ্য কবিতায় সর্বত্র যে ছন্দের অস্পষ্ট ঝঙ্কার তোলার রীতি আছে তা বলা যায় সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসারী নয়, বরং ইংরেজি সাহিত্যের অনুসরণ-কারী। ময়ূরের দৃষ্টি বা অন্যান্য রচনায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী কবিদেরই অনুসরণ করেছেন। ওয়াল্ট হুইটম্যানের "লীভস্ অফ গ্রাস্" কবিতা গ্রন্থের অংশ বিশেষ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

I am the poet of the Body and I am the poet
of the Soul,
The pleasure of the heaven are with me and the pains
of hell are with me,

The first I graft and increase upon myself,
The latter I translate into a new tongue.

—Whitman, 'Song of my soul, Leaves of Grass.'

প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন যে গদ্য কবিতার পথিকৃৎ-এর মর্যাদা রবীন্দ্রনাথের হলেও বাংলায় মিত্রাক্ষর ভেঙে বিদ্রোহী কবি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার মানসিকতায় কিন্তু গদ্য কবিতা রচনার প্রবনতা ছিল। ছন্দোমুক্তির এই সাধনার পথে উল্লেখযোগ্য পথিকরূপে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদানও স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের সীমানা পর্যন্ত কবিদের ছন্দিত পদ্য ও গদ্য কবিতার কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করছি—

(১) সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্র গুঞ্জন নিয়ে নববর্ষ নামুক
আমাদের বিচ্ছেদের পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয় তাই—
হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন
সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রঙটির মতো তার নীলাঞ্চল।
তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মীড়গুলি
আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে
জড়িয়ে উঠে।

—রবীন্দ্রনাথ, 'মেঘদূত : লিপিকা'।

(২) পরস্পরকে তারা শুধায়, কে আমাদের পথ দেখাবে।
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে, 'আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে!'
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, 'সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি;
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব—
কেননা মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়'—
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল; কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে—
জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়! —রবীন্দ্রনাথ, 'শিশুতীর্থ'।

(৩) ক্লাইভের আমলের পুরনো বাড়িটার হাড়-পাঁজরা খসিয়ে
আচমকা এল একটা দমকা হাওয়া

এমন হাওয়া আর কখনো আসেনি।
ঝরে গেল বালির পলেস্তারা, আলগা শুরকি,
ঘেঁসের গাঁথনির দেয়াল,
খচমচ করে উঠল জানলার ছিটকিনি খড়খড়ি কব্জাগুলো,
বাড়িটা যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে…।

—বিমলচন্দ্র ঘোষ, 'দম্‌কা হাওয়া'।

(৪) আমি ইতিহাস, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো,
মনে রেখো, দেরি হয়ে গেছে, অনেক—অনেক দেরি।
আর মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য, 'ঐতিহাসিক'।

(৫) … জানি জানি মুহূর্তেকেই জাগবে কলকাতা,
চলবে চাকার ঘড়ঘড়ানি, পথে পথে জ্বলবে গ্যাসের আলো,
দোকানপাটে আবার শুরু হবে
দর-করা আর চেঁচামেচি, গলি-ঘুঁজির ধারে
খড়ি মাখা বেশ্যারা ফের কাষ্ঠ হেসে থাকবে পেতে ওৎ
ছাত্র, মাতাল, মজুর, কুলির আশায়,
ভিক্ষা মেগে মেগে
ফিরবে আবার ঠগ, জুয়াচোর, কানা, খোড়া কুষ্ঠরোগীর দল।

—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'বিরাম'।

(৬) এই অকিঞ্চন পৃথিবীর মৃত্তিকায়
যে স্বর্ণবীজ তুমি রোপণ করেছ
তা ব্যর্থ হবার নয়
মোহাচ্ছন্ন বর্তমানের সমস্ত কুজ্ঝটিকা অতিক্রম করে
সুদূর যুগান্তে তার সংকেত প্রসারিত।
মানবতার গভীর উৎসমূলে অক্ষয় তার প্রেরণা।
হে মহাকাল, তোমার অনন্ত পারাবারে
আমরা ক্ষণিকের বুদ্‌বুদ,

তবু সেই সূর্যশিখা যে আমাদের প্রতিফলিত হয়
এই আমাদের গৌরব।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্য।

(৭) বজ্রের যিনি দেবতা
তিনি আমাদের বুকের মধ্যে বাজেন ভীমগম্ভীর স্বরে,
তাঁর প্রতিধ্বনিতে ফেটে যায় শরীরের দেয়াল,
আমরা মরে যাই।
তারপর চুম্বনের দেবতা আমাদের বাঁচিয়ে তোলেন,
নতুন হয়ে আমরা জেগে উঠি,
আমাদের শরীরে তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর মহিমা।
বজ্রের যিনি দেবতা তাঁকে প্রণাম করি,
তিনি ভয়ংকর ;
চুম্বনের যিনি দেবতা তাকে ভালবাসি,
তিনি অপরূপ।

—বুদ্ধদেব বসু, 'দেবতা : দুই'।

(৮) এ গলির এক কালো কুচ্ছিৎ আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধরে'
এই সব সাত পাঁচ ভাবছিল—
ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ ! পোড়ার মুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি !
তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।
অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়ি পাকানো সেই গাছ—
তখনও হাসছে।

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক'।

(৯) আবার ব্রাহ্ম মুহূর্তে
চিৎপুরের বারান্দায় কোকিল ডাকে,
অলস হাই তোলে বেকার কুকুর।
দেবনখরে লোলচর্ম, পীত চোখ
ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরে নিরানন্দ নারীদল জমে।

—সমর সেন, 'বকধার্মিক'।

(১০) যে রাজপথে চলে ট্রাম
ডবল-ডেকার আর লরি
আর মুখ বুজে যে শুয়ে থাকে
কান্নায় সে-ই বিদীর্ণ হয়ে গেল
একটা খড-বোঝাই গরুর গাড়ির চলায়
রাত তিনটায়।
জেগে আছে পার্কে গ্যাসের নীল আলো
গাছের সবুজ আয়নায় চুপি-চুপি মুখ দেখবে বলে।...

—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'নিশীথ-নগরী'।

(১১) এবং আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে,
অতীতের সঙ্গে সম্পর্কহীন
বর্তমানের এই কবন্ধ কলকাতাই আমার নিয়তি ;
যেখানে
কবিতীর্থ বলতে কোনো কবির কথা কারও মনে পড়ে না,
এবং 'বিদ্যাসাগর' বলতে—
তেজস্বী কোনো মানুষের মুখচ্ছবির বদলে—
ইসকুল, কলেজ, থানা, বস্তি, অট্টালিকা,
খাটাল, পোস্টার ও পয়ঃপ্রণালী-সহ
আস্ত একটা নির্বাচন কেন্দ্র
আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'এ কেমন বিদ্যাসাগর'।

(১২) লক্ষ লক্ষ শিশু
ফুটপাথ ছাড়িয়ে ভাঙা রাস্তায় পা দিতে
না-দিতেই পাথনায় থরথর
কলকাতা এমন রঙ বিলোয় যে কথায় কথায়
ঘাসপাতা প্রজাপতি এবং অগুন্তি তারা ছয়লাপ—
ট্রামলাইন ফুরিয়ে গেলে খোলা মাঠ...
তখনই সন্ধের ফুল ফুটে ওঠে
গড়িয়াহাট ছলাৎছল নদীর পাড়ের
দোলা নিয়ে নলখাগড়া কাশবন...

—অরুণ মিত্র, 'লক্ষ লক্ষ শিশু'।

(১৩) এসপ্ল্যানেডে মোড় নিতেই
আমার চোখের ওপর উদ্ভাসিত হয়
তোমার মুখ—
তোমার ব্রোঞ্জের মুখ
পৃথিবীর স্নিগ্ধতম ঝরণার চেয়েও যা
সুপেয় তৃপ্তির গভীরতর আহ্বান।

—মনীন্দ্র রায়, 'লেনিন'।

(১৪) দিগন্তে, দিগন্তে দূর রেল লাইন পার সেই ঈশানী কলকাতা,
ট্রাম বন্ধ, বাস বন্ধ, দোকানির ঝাঁপ বন্ধ,
দপ্তরে দপ্তরে কাজ বন্ধ কলকাতা,
কারখানায় কারখানায় লাখো বজ্রমুষ্টি তোলা
হরতালি কলকাতা
কাঁপে থমথমে যেখানে, কাঁপে ঝড়ের উদ্বেগে, কাঁপে
উনত্রিশে জুলাই।···

—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, '২৯শে জুলাই ১৯৪৮'।

(১৫) তোমার কূলকে ভালবেসেই তো কূলছাড়া আমি
যদি কোনোদিন কলঙের পারে বিহু-তলীর নাচে
আমি আনন্দ উদ্দাম, আমাকে ভুল বুঝো না, সখি;
কণ্ঠে আমার বসন্ত-বিহু, বুকে মূর্ছিতা বিরহিনী ভাটিয়ালী,
ব্রহ্মপুত্র আমার বিস্ময়, পদ্মা আমার শ্রদ্ধা, গঙ্গা আমার ভক্তি,
তুমি আমার ভালবাসা—খোয়াই।

—হেমাঙ্গ বিশ্বাস, 'সীমান্ত প্রহরী : খোয়াই'।

(১৬) ···তিনি তাঁর কলপ-দেওয়া গোছানো চুল থেকে
এক টুকরো শুকনো পাতা তুলে নিয়ে
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। এবং
হঠাৎ হুঙ্কার দিলেন—'মায়াকোভস্কির মত লিখুন,
কবিতায় জনগণের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে দিন।'
বলেই তিনি শেষবারের মত কফির ফেনায়
চুমুক দিয়ে
একটি বিলিতি সিগারেট ধরিয়ে
গদি-আঁটা চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।

আমি জানি, আমার অক্ষম কবিতাগুলিই
আমার সবচেয়ে বড় শত্রু।
'কিন্তু কী করব বলুন'—আমি
পরীক্ষায়-ফেল-করা ছাত্রের মতো হতাশ হয়ে
তাঁকে জানালাম—
'মায়াকোভস্কির নেতা ছিলেন স্বয়ং
লেনিন। আর আমার নেতা হলেন
আপনি।' —মণিভূষণ ভট্টাচার্য, 'কপাল'।

(১৭) এই শহরের নাম 'কলকাতা' দিয়েছে মানুষ।
যারা বানিয়েছে এই শহরের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, তারাও মানুষ।
গির্জার ঘড়িতে রাতদুপুর ; ঘড়ির ভিতর ঘণ্টা বেজে উঠছে—কে বাজায় ?
সেও মানুষ ? এক অদৃশ্য মানুষ ?
নির্জন রাস্তায় একা হেঁটে যায় শীতের ভিক্ষুক
সম্পূর্ণ উলঙ্গ ; তার অর্ধেক শরীর শুধু হাড়,
বাকি আধখানা ঈশ্বরের নৈবেদ্য।...
—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'শীতের ভিক্ষুক'।

(১৮) লোকে বলে বাংলাদেশে কবিতার আকাল এখন,
বিশেষতঃ তোমার মৃত্যুর পরে কাব্যের প্রতিমা
ললিতলাবণ্যচ্ছটা হারিয়ে ফেলেছে—পরিবর্তে রুক্ষতার
কাঠিন্য লেগেছে শুধু, আর চারদিকে পোড়োজমি,
করোটিতে জ্যোৎস্না দেখে ক্ষুধার্ত ইঁদুর কী আশ্বাসে
চমকে ওঠে কিছুতে বোঝে না ফণিমনসার ফুল।
—শামসুর রহমান, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি : রৌদ্র করোটিতে'

(১৯) কটা হলুদের পটে ক্রীমরেড, বড়ো সুন্দর
মানিয়েছিল একদিন।
তোমার অবর্তমানের কালোচিহ্ন এসে
সেই সৌভাগ্যকে বিচ্ছিন্ন করেছে
অপঘাতে,
অবিশ্বাসে, যেন—
এক অসম্ভব অলীক স্বরাজ আমাদের।
—নির্মলেন্দু গুণ, 'মানুষের মৃতমাংসে' : 'আনন্দকুসুম'।

(২০) অনতিদূরে, যতদূর দৃষ্টি গেল তোমার ; মানুষের অস্তিত্বের
খেলা, পল্লবহীন ; যেন যমনায় কবি উড়িয়েছে পতাকা।
—ফসলের ঘ্রাণ, অবসন্ন নদী, কুন্দকুসুম, শিমুলের মাঠ।
কতদূর দৃষ্টি গেল তোমার ?—আমার চোখ পুড়ে গেছে
গত কয়েক শতক, আরো পুড়বে প্রতি চৈতন্যে, এশিয়ায়, জনপদে
বিস্তৃত হবে মেঘের উল্লাস, রাজবাড়ী, সিংহাসন
অসম বণ্টন, কোষাগার, রাজনীতি, সংবিধান।

—দাউদ হায়দার, 'সেই কবিতা আজ সাধারণ্যে : দেশব্যাপী'।

(২১) মা, তোমার কিশোরী কন্যাটি আজ নিরুদ্দেশ
মা, আমারও পিঠোপিঠি ছোট ভাইটি নেই
নভেম্বরে দারুণ দুর্দিনে তাকে শেষ দেখি
ঘোর অন্ধকারে একা ছুটে গেল রাইফেল উদ্যত।

এখন জয়ের দিন, এখন বন্যার মত জয়ের উল্লাস
জননীর চোখ শুকনো, হারানো কন্যার জন্য বৃষ্টি নামে
হাতখানি সামনে রাখা, যেন হাত দর্পণ হয়েছে
আমারও সময় নেই, মাঠে মাঠে কনিষ্ঠের লাশ খুঁজে ফিরি।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'উনিশশো একাত্তর'।

(২২) বলো নারী, বলো জমি, বলো বীজ, বল সৌরহরী
আমি কি মোমিন নই ? কাফেরের মতো
আমি কি এখনো
প্রশ্নে প্রশ্নে বিদ্ধ করি আপন ঈমান ?

আমি তো নাপাক বান্দা, তাই কি আমাকে
দেখেই চকিতে তুমি দু'চোখ টাটাও ? তুমি যদি
আমার দু'চোখ জুড়ে নিষেধের পরোয়ানা এঁটে
জ্বেলে রাখো হাবিয়া দোজখ,
কি করে পরখ করি হারাম হালাল ?

—মুহম্মদ নুরুল হুদা, 'নির্বাচিত কবিতা'।

(২৩) কোথায় উঠবে ভেবে ভেবে সেদিন সন্ধ্যাতারাটা দিশাহারা।
চেনা প্রতিদিনের জানা আকাশটাকে আর খুঁজে পায় না। গেল

কোথায় ? এই তো গতকালও এখানেই ছিল। মেঘ-টেঘ উড়িয়ে
দিয়ে একেবারে নিপাট নীল। তারাটা শুনেছে, দিনের যৌবনে
এই আকাশটাই একদম গনগনে হয়ে থাকে। একটা কোণে
একটা লাল্‌চে ছিট ছড়িয়ে পড়ে, তো, সেই বিকেলের দিকে।
এখন এই সন্ধ্যাবেলা সেই আকাশ গা-ঢাকা দিল কোথায় ?
এদিকে তারাটা ফোটার সময় যে পেরিয়ে যায় ! সে কাতর
প্রার্থনা জানাতে থাকে, সময়টুকু ফুরোবার আগেই তুমি
ফিরে এসো, হে আকাশ, আমার আকাশ।

—সন্তোষকুমার ঘোষ, 'নিরাকাশ'।

(২৪) কয়েকটি আত্মা চৌচির হয়ে পড়েছিলো
জন্ম নিয়েছিল একটি দিন ;
আমি জানি না কী সে যন্ত্রণা
জানি না কেমন সে অনুভূতি
যার জ্বলন্ত অন্ধকার থেকে
বিদীর্ণ ধারালো সেই একটি দিন
জন্ম নিলো।

—ফজল শাহাবুদ্দীন, 'উনিশ বায়াত্তোর একটি দিন'।

(২৫) কি আশ্চর্য জননী আমার, চোখে জল নেই, মুখে নেই মলিনতা
তুমি কী ভীষণ লালে সজ্জিত হয়েছো। মনে তো আনন্দ নেই,
হৃদয়তরঙ্গে কই উচ্ছ্বসিত ঢেউ ? কতো যে বসন্ত এলো—
সেজেছো তো বহুবর্ণ ফুলবাসে তুমি, লাল-নীল-পীত বর্ণ
ঝিকিমিকি রঙিন মেখলা, দেখেছি তোমার অঙ্গে কিন্তু এতো
তীব্র লাল বসন্তে পরো না তুমি, ফিরে এলো সেই সব
দিন ? কোলজোড়া তোমার মানিক দিল প্রাণ ?
টকটকে লাল রক্ত মাখা দেখি সন্তানের তোমার শাড়িতে।

—নিয়ামত হোসেন, 'আশ্চর্য জননী'।

উদাহরণ বেশ কিছু দেওয়া গেল। এবার গদ্য কবিতার আবৃত্তি-প্রসঙ্গে সামান্য কিছু বক্তব্য নিবেদন করে ছন্দবিধি সম্পর্কে আলোচনা শেষ করব।

(১) ভাব অনুযায়ী ছোটো-বড়ো যতি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে গদ্য কবিতার আবৃত্তিতে। যতি ব্যবহারে সম বা বিষম মাত্রা সংখ্যা বিবেচনা করার প্রয়োজন আবশ্যিক নয়। ভাবের বিভাজনই আসল ব্যাপার।

(২) গদ্য কবিতায় প্রত্যেকটি অক্ষর এক মাত্রার হবে।

(৩) পদ্যছন্দের মতো চরণ-উপস্থাপনা ও নির্দিষ্ট মানের পর্ব-প্রযুক্তি গদ্য কবিতায় হয় না।

(৪) আকস্মিক অনুপ্রাস দেখা দিলেও গদ্য কবিতায় মিলের প্রয়োগ অত্যাবশ্যক নয়।

(৫) পদ্য কবিতার মতো গদ্য কবিতায় ছন্দের বন্ধন থাকে না, কিন্তু ছন্দের স্পন্দন থাকে এবং তাও অতি নিরূপিত নয়।

(৬) গদ্য কবিতা আবৃত্তিকালে পদ্যের মতো সুর লাগানো অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অবশ্য ভাবানুযায়ী কণ্ঠস্বর-ভঙ্গি প্রয়োগ না করার কোনো কারণ নেই, কিন্তু তা যেন অভিনয়ের মতো প্রবল না হয়, পদ্য-ছন্দের মতো তো অবশ্যই নয়।

মোট কথা, কণ্ঠভঙ্গিসঞ্জাত সুর ও ছন্দের আভাস সহ গদ্য কবিতার আবৃত্তির চলন হবে গদ্যের ভঙ্গিতে, এ কথাটা আবৃত্তিকারকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

বাংলা পদ্য ও গদ্য কবিতার ছন্দ নিয়ে এপারবাংলা-ওপারবাংলায় বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। বহুল উদ্ধৃতিসহ সেই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার রূপরেখাটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো মুখ্যত একটি কারণে, স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পরূপে শিক্ষণ ও প্রয়োগে আবৃত্তির দ্রুত জনপ্রিয়তার কথা মনে রেখে।

॥ চার : অর্থবহ স্বর, শব্দ ও চিত্রকল্প প্রক্ষেপণবিধি ॥

উচ্চারণবিধি আলোচনার পরিশেষে আমরা বলেছিলাম উচ্চারণবিধির সঙ্গে স্বরভঙ্গির বিভিন্ন বিষয়গুলি সুসমন্বিত করার অভ্যাস অত্যাবশ্যক। ইংরেজিতে একটি কথা আছে : Sound echoes the sense. পরিশীলিত কণ্ঠস্বর, সঠিক ও স্বাভাবিক উচ্চারণ এবং ছন্দসচেতনায় সমৃদ্ধ আবৃত্তিকারের বিষয়বস্তুর প্রত্যেকটি স্বর, শব্দ ও চিত্রকল্পের অর্থবহ প্রক্ষেপণ দ্বারা ব্যঞ্জিত করার সচেতন প্রয়াসে পারঙ্গম হওয়া দরকার। আমরা তো জানি শুধুমাত্র প্রক্ষেপণ ক্রিয়ার বৈচিত্র্যে একই শব্দের অর্থ-ব্যঞ্জনা ভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী' কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি : "আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী।" এই পঙ্‌ক্তিটি আমরা অনেক রকমে বলতে পারি, বিভিন্ন শব্দের ওপর ঝোঁক দিয়ে :

(১) **আজ** আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী।

(২) আজ **আমার** প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী।

(৩) আজ আমার **প্রণতি** গ্রহণ করো পৃথিবী।

(৪) আজ আমার প্রণতি **গ্রহণ** করো পৃথিবী।

(৫) আজ আমার প্রণতি গ্রহণ **করো** পৃথিবী।

(৬) আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো **পৃথিবী**।

এখন মূল কবিতার ভাববিন্যাসানুসারে আবৃত্তিকারকে ঠিক করতে হবে পঙ্‌ক্তিটির কোন্ বা কোন্-কোন্ শব্দের ওপর ঝোঁক দিলে সবচেয়ে ভালো অর্থপ্রকাশ সম্ভব হবে। বলাই বাহুল্য, ভালো কণ্ঠস্বর, ছন্দজ্ঞান ও উচ্চারণজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সঠিক প্রক্ষেপণ না ঘটলে আবৃত্তিকার 'ভালো' বিশেষণের যোগ্য হবেন না।

আমরা তো জানি, 'পৃথিবী' কবিতাটিতে বহুল তৎসম, তদ্ভব শব্দের প্রয়োগে পৃথিবীর ইতিহাসের বিবর্তনের স্ব-রূপটিকে কবি ঘনপিণদ্ধ ভাবব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত করেছেন। এখন কোনো আবৃত্তিকার যদি প্রথম থেকেই টেনে টেনে অযথা সুর প্রয়োগ করে আবৃত্তি করার চেষ্টা করেন তাহলে কিছুতেই ঘন-সংবদ্ধ অর্থ ও ভাব-ব্যঞ্জনা প্রস্ফুটিত হবে না পরন্তু মূল কবিতার ভাবরসের হানি ঘটিয়ে আবৃত্তিকার রসিক শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদনই করবেন। ফলে এই কাজটা আবৃত্তিকারের

পক্ষে 'হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে চায়'এর সামিল হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনো কবিতার অনুভব এবং প্রকাশ রমণীদেহের লাবণ্যের মতো এবং এই লাবণ্য তো শরীরের কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। কাঠামো না থাকলে বা ভাঙচুর হয়ে গেলে লাবণ্যেরও তো হেরফের ঘটবে। সুতরাং, কাঠামোটা অবশ্যই দরকার এবং কাঠামোর ওপরে আবৃত্তিশিল্পের চর্চা দ্বারা সঠিকভাবে অনুভূতি কিম্বা উপলব্ধির রক্ত-মাংসকে প্রতিষ্ঠা করাই আবৃত্তিকারের কাজ। অবশ্যই খুব শক্ত কাজ কবিতা বা বিষয়বস্তুর ভাবপ্রতিমাকে মানুষের (শ্রোতার) মনে সঞ্চারিত করা এবং সঞ্চারণ-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের রুচি তৈরী করা, রুচিকে উন্নত করা। তাই আবার বলি, কাজটা কবির কবিতা লেখার চেয়ে কম দায়িত্বপূর্ণ নয়। একজন কবি একটা বা একাধিক কবিতা লিখলেন, ছাপা হলো,—দশ-বিশ-পঞ্চাশ-একশোজন হয়ত তা পাঠ করলেন। কিন্তু সেই কবিতাই যখন কোনো আবৃত্তিকার আবৃত্তি করলেন তখন কয়েকশো—এমনকি কয়েক হাজার মানুষ তা শুনছেন এবং হয়তো অনেক অনেক দিন ধরে লাখো লাখো মানুষ তা শুনবেন। পাঠকের (এবং শ্রোতার) পুরোনো রুচি পাল্টে আধুনিককালের চিন্তার সামিল করার গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারেন আবৃত্তিকার। অর্থাৎ ওই **Communication process** দ্বারা আবৃত্তিকার কবির বা রচয়িতার সবচেয়ে বড় সহায়ক হলেন কিন্তু যদি কাজটা ঠিক-মতো না হয় তাহলে প্রতিক্রিয়াটা তো অবশ্যই ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষতিকর হবে। একজন কবি যখন আবৃত্তির প্রাসঙ্গিকতা বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে চিন্তা করেন তখন একজন আবৃত্তিকারকেও এই ব্যাপারটা খুব বেশী করে মনে রাখতে হবে যে, কবিতার যে মৌল কাঠামোটা থাকে তার বেশ কিছু নির্দিষ্ট ব্যাকরণগত দিক থাকে, এটা জানতেই হয়। একজন কবিকে জানতে হয় যে, একটা শব্দের ওজন বা গুরুত্ব কতখানি। তার ভাবনাকে প্রকাশ করার মতন শব্দের ওজনটা থাকা দরকার। কবিকে বুঝতে হয় তাঁর বাক্-প্রতিমা সঠিকভাবে কাব্য-ভাবনার সমতা রক্ষা করতে পারবে কিনা, তেমন কবিতাটি পাঠ করার সময় আবৃত্তিকারকেও জানতে হবে কোন বাক্-প্রতিমাকে উজ্জ্বল করে তুলতে কবির মনন-ক্রিয়াকে কিভাবে সবচেয়ে উপযুক্ত-ভাবে ব্যঞ্জিত করতে হবে। জানতে হবে একেবারে আঙ্কিক নিয়মে, তাঁর স্বরগ্রামের কোন্‌খানে কি রকম ওঠা-পড়া, কোন্‌খানে অল্প ছুঁয়ে যাওয়া, কোন্‌খানে খানিকটা আধো প্রকাশ্য রাখা এবং খানিকটা অপ্রকাশ্য রাখা, কোন্‌খানে তীব্র করে তোলা এবং কোন্‌খানে স্বরগ্রামের বিলম্বিত বিস্তার ঘটিয়ে কবিতার মূলভাবের অনুসারী করে তোলা যায়। একজন কবি যেমন কতকগুলি মূল ব্যাপার না জেনে একটা ভাল কবিতা কিছুতেই লিখতে পারেন না তেমনি একজন আবৃত্তিকারকে

ভাল আবৃত্তি করতে হলে কবির মানসিকতা যে সব মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে অবশ্যই চর্চা করে বুঝতে হবে…পরন্তু আরও সুন্দরতর শ্রাব্যরূপ দিয়ে অধিকতর পূর্ণতার দিকে নিতে হবে। প্রসঙ্গত, কোনো আবৃত্তিকার হয়তো প্রশ্ন তুলবেন আবৃত্তিকার কি কবির প্রচারক? উত্তরে সবিনয়ে বলব—কবির প্রচারক অবশ্যই নয় আবৃত্তিকার কিন্তু তিনি কবির মূল ভাব-ব্যঞ্জনার বিরুদ্ধ কোনো কিছু করারও অধিকারী নন। সাধারণভাবে কেউ কেউ দু'জাতের কবির কথা উল্লেখ করেন—প্রথম জাতের কবি মেধা, বুদ্ধি, বিবেচনা অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলে মনীষা—তার দ্বারাই কবিতা রচনা করেন, আর এক জাতের কবি আবেগতাড়িত—তীব্র স্পর্শকাতরতার দ্বারা তাঁর সৃষ্টিকর্ম—অভিভূত যে অনুভব সেই অনুভবকে তীব্র আবেগে প্রকাশ করেন। এই যে মেধাবী কবি ও আবেগতাড়িত কবি—এই দুটো ভাগ-এর উদাহরণস্বরূপ কেউ কেউ উল্লেখ করেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের দুই শ্রেষ্ঠ কবির নাম। প্রথম জন বিষ্ণু দে, দ্বিতীয় জন জীবনানন্দ দাশ। আমার মনে হয় যুক্তির দিক থেকে এ জাতীয় বিভাজন সঠিক নয়। কারণ প্রথমে একটা আবেগ যদি উৎসারিত না হয়ে ওঠে তবে কোনো কিছু অনুরণন তো সম্ভব হবে না এবং তা না-হলে কোনো কবিতা কি লেখা সম্ভব? যে কোনো কবি কোনো আবেগকে সময়োপযোগী অথবা যুগোপযোগী করে diction দেন, প্রয়োজনমত মার্জনা করেন (ইংরেজ কবি এলিয়ট যাকে বলেছেন Intellectualised Emotion) তবে একটা কবিতা সৃষ্টি হয়। শুধু intellect নয় শুধু emotion নয়, কথাটা বলা হচ্ছে—Intellectualised Emotion (মনে রাখা দরকার Emotionalised Intellect নয়)। অর্থাৎ আবেগ তাকে আদল দিচ্ছে, তাকে চেহারা দিচ্ছে। কোনো কবিতায়, মেধা কম বা বেশী থাকতেই পারে, কিন্তু থাকেই—এটা কখনই—এমন নয় যে নিছক অমার্জিত আবেগ বা নিছক বুদ্ধিই কেবলমাত্র কবিতা রচনার জন্মভূমি। তেমনি কোনো আবৃত্তিকার তিনি যত বড়ো কণ্ঠ-সম্পদে সম্পদশালীই হোন না কেন, নিছক কোনো বিশেষ ভঙ্গিতে যে কোনো কবিতাই পাঠ না করে, অনুশীলন না করে সুন্দরভাবে,—উপযুক্তভাবে আবৃত্তি করতে পারেন না—এটা বোধ হয় স্মরণে রাখা অবশ্য প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। এর কারণস্বরূপ একটি কথাই যথেষ্ট যে, কবিতায় involved না হয়ে আবৃত্তিকার তাঁর আবৃত্তিতে শ্রোতাদের involvement প্রত্যাশা করে তাঁর চাওয়ার মাত্রাটাকে যুক্তিহীন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'শেষসপ্তক' কাব্যগ্রন্থে নিজের সম্পর্কে লিখেছিলেন: 'নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা'। ছোটো বড়ো সব কবিরই এ জাতীয় মালা গাঁথার প্রয়াস থাকে এবং এই প্রয়াসে অনেক সময়েই 'অনন্ত রক্তপাত বুকের ভেতরে' ঘটে চলে।

শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে নিবেদিতব্য আবৃত্তি-বরণডালা সাজাতে সৎ আবৃত্তিকারেরও কম রক্তমোক্ষণ ঘটে না—বরং না ঘটাটাই অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। কিন্তু যাঁরা আবৃত্তির নামে সৌখীন মজদুরীর কারবারী তাঁদের অপপ্রয়াস নিবৃত্ত করার কলা-কৌশল কি আমরা জানি? এইসব সৌখীন মজদুরদের উৎপাতে শ্রোতাদের উৎসাহে স্বভাবতই ভাঁটা পড়ে, কখনো বা একঘেয়েমির ক্লান্তি দেখা দেয়। কারো কারো গলা কাঁপানো বেসুরো চীৎকারে ফুটে ওঠে শেষ কথার রেশ টানা বাসনফাটা আওয়াজ। কেউ বা অতি নাটকীয়তায় ক্ষেপে ওঠেন, কারো বা ন্যাকামিভরা কণ্ঠে উদ্ভট পরীক্ষার নামে নানান বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস, কারও কারও গলা শুনে মনে হয় আবৃত্তির নামে তারা কোনো এক ভৌতিক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসী, কেউ কেউ ভাবাধিক্যে কেঁদে ফেলেন, কারো আবৃত্তিপ্রয়াসে মনে হয় আবৃত্তি শিল্প-সাধনা নয়, ব্যায়ামচর্চা। এছাড়া দেখা যায় উচ্চারণ নিয়ে, ছন্দ নিয়ে নানান বিভ্রান্তি ও টালমাটাল অবস্থা। বলাই বাহুল্য, এই সব অপপ্রয়াসে সময়-অর্থ-পরিশ্রমেরই শুধু অপচয় ঘটে না, সামগ্রিকভাবে আবৃত্তি-শিল্পচর্চারই সমূহ ক্ষতি হয়।

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য তথা বর্তমানে 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠানের নির্দেশক অধ্যাপক কুমার রায়, তাঁর 'শব্দের প্রতিমা' নিবন্ধে বলেছেন: "কণ্ঠস্বরের অভিব্যক্তি দিয়েই আবৃত্তির শরীর গড়ে তুলতে হবে। এই স্বর ও সুরের বিস্তারের মূল ভিত্তি হলো—প্রত্যেক স্বরগ্রামের সঠিক শুদ্ধ ব্যবহার এবং প্রত্যেকটি কথার বিশুদ্ধ উচ্চারণ। আবার উচ্চারণ শুদ্ধ হবে তখনই যখন প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণে তার সম্পূর্ণ মর্যাদা পাবে, কিন্তু আবৃত্তি যেহেতু গান নয় তাই স্বরগ্রামের ব্যবহারটা এক্ষেত্রে আলাদা। আমরা যে কথা বলি তার মধ্যেও একটা স্বরগ্রামের ব্যবহার আছে কিন্তু তা গানের থেকে স্বতন্ত্র ব্যবহার। কিছু কিছু মানুষ কথা বললে আমাদের শুনতে ভাল লাগে, আবার কারো কারো কথা শুনতে আদৌ ইচ্ছা করে না। শুধু সুকণ্ঠের অধিকারী হলেই চলে না, সেই সঙ্গে অভিব্যক্তি-সক্ষম কণ্ঠস্বর হলে তবেই কানকে এবং মনকে তৃপ্তি দেয়, তখনই ইচ্ছে হয় এই আওয়াজ আরো শুনি। এটা ঘটে শুধু উচ্চারণ-স্পষ্টতায় নয়, সেই সঙ্গে কণ্ঠের ধ্বনি-বৈচিত্র্যে।

আবৃত্তি ও অভিনয়ের কারবার শব্দকে নিয়ে। শব্দের উচ্চারণ, শব্দের ভাব, শব্দের রূপ এমনকি রঙ, এই নিয়ে খেলা চলে আবৃত্তি ও অভিনয়ে। অভিনয় অবশ্যই সম্পূর্ণতা পায় আরও অনেক অলঙ্করণ অনেক ব্যঞ্জনায়। তখন তা অবশ্যই আবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র-সত্তা পায়। কিন্তু শব্দের অনুশীলনে এ'দুয়ের পথ এক।"

আমরা তো জানি সব শিল্পেরই একটা মূল মাধ্যম থাকে। একটা বিষয়, একটা ভাবনা, একটা চিন্তা, একটা অনুভবের জায়গা ছাড়াও থাকে একটা বৈশিষ্ট্য।

আবৃত্তির ক্ষেত্রে স্বর, ধ্বনি এটুকু তো না থাকলে নয়। আর এর মধ্য দিয়েই সব কিছু করতে হবে এবং আমরা তো এও জানি যে, স্বর, ধ্বনি চিরকালই একটা সময় এবং তার পরিবেশের ওপরে নির্ভর করে।

"প্রাচীন পদার্থবাদী শাস্ত্রকাররা শব্দকে শ্রোত্রেন্দ্রিয় একটা গুণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁদের মতে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির মত শব্দও একটি বিশেষ গুণ। শব্দকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—ধন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। পদার্থের অভিঘাত কিম্বা বিভাজনে যে শব্দ অর্থাৎ আওয়াজ, তাই ধ্বনি। আর কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতি শরীরস্থানের সংযোগ বিভাজন থেকে উৎপন্ন যে শব্দ তা বর্ণাত্মক। আবৃত্তি বা অভিনয়ে এই বর্ণাত্মক শব্দেরই ব্যবহার। কিন্তু শব্দের ব্যাপ্তি আরও ব্যাপক। আদিতম শব্দের রূপটি ধরা পড়ে না কানে—তা থাকে হৃদয়ের আকাশে, চিন্তায়, ভাবনায়, ক্রমপর্যায়ে সেটা প্রকাশিত হয় ইন্দ্রিয় স্তরে, তখন আমরা শুনতে পাই। কবির কবিতা-সূচনা ধন্যাত্মক। সেই 'পরা' রূপ শব্দ কবির হৃদয়ের আকাশে, চিন্তায়, ভাবনায় প্রথম ধরা দেয়, ধ্বনির অনুরণন তোলে। সেই ধ্বনিকে তাঁরা লিপিতে প্রকাশ করেন। আর আবৃত্তিকার তাকে প্রকাশ করেন বর্ণাত্মক শব্দের মাধ্যমে।" কোনো কোনো নাটকের অনেক স্তর থাকে, উন্নত মানের অভিনয় দ্বারা তাকে ফুটিয়ে তোলা যায়। কবিতার ক্ষেত্রেও এমন বক্তব্য থাকে যেগুলি অনেক স্তর স্পর্শ করে। আবৃত্তিকারকে সেই স্তরগুলি প্রথমে ভাল করে বুঝে নিতে হবে এবং গলার স্বরে সেই স্তর-ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে হবে। শ্রীকুমার রায় তাই যথার্থই বলেছেন : "যে কবিতা আমরা আবৃত্তি করি তার আসল ব্যাপারটা হলো অর্থ ও ধ্বনির সমন্বয়। কবির কবিতারও আসল বিষয় বোধ হয় এই সমন্বিত রূপ। এই পর্বে কবি এবং আবৃত্তিকারের কাজটা প্রায় একই। বাংলাতে 'শব্দ' কথাটির অর্থ দুটো—ধ্বনি এবং অভিধা। কবিতার যে শরীর গড়া হয় শব্দ দিয়ে তা আসলে ওই ধ্বনি ও অভিধা এবং কবিতার অন্তর্নিহিত রহস্য এতেই নিহিত। গানে নিছক ধ্বনির ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কবিতায় এবং কবিতার আবৃত্তিতে কথার তাৎপর্য-নিরপেক্ষ কোনও ধ্বনি থাকতে পারে না। তাই যেভাবে গানে কণ্ঠস্বরের উত্থানপতনের খেলা দেখা যায় কিন্তু কবিতা আবৃত্তিতে সে ধরনের কোনও খেলা দেখাবার অবকাশ নেই, যা আছে তা হলো শব্দের যে মূল ধ্বনিরূপ তাকে প্রকাশ করার দায়। কবিতা আবৃত্তিতে ধ্বনি কথার তাৎপর্যকে প্রকাশ করছে মাত্র, সেখানে ধ্বনি অবলম্বন বা বাহন গানের মত স্ব-প্রধান নয়।···

"···এই গরীয়ান বোধ দিয়ে আবৃত্তি যদি না করা যায়, যদি গভীরতার মধ্যে সে আবৃত্তি না নিয়ে যায় শব্দের প্রতিমা গড়ার কাজ তাহলে অসম্পূর্ণ থাকবে।"

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যাক। 'একুশে ফেব্রুয়ারী' কবিতায় কবি জসিমুদ্দিন লিখেছেন :

"আমার এমন মধুর বাংলা ভাষা
ভাইয়ের বোনের আদর মাখা
মায়ের বুকে ভালোবাসা।
বসনে এর রঙ মেখেছি
তাজা বুকের খুনে···
এভাষারই মান রাখিতে
হয় যদি বা জীবন দিতে
চার কোটি ভাই রক্ত দিয়ে
পুরবে মনের আশা।"

বাংলা ভাষা ও বাঙালীর গর্বের, স্মরণের আর শপথের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার যোগ্য আসনে। কিন্তু এই ব্যাপারটার পশ্চাৎপটের ইতিহাসটা তো আবৃত্তিকারের জানা থাকা দরকার। পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পরে যুবক সেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম ভাষারূপে গ্রহণ করার দাবী জানানো হয়, কিন্তু তা মানা হয়নি প্রথমে। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন হয়ে সালাম—রফিক—জব্বর—বরকত এবং আরো তিনজন বুকের রক্ত ঢেলে শহীদ হয়ে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার রাজপথে মহাজীবনের পুণ্যলগ্নের যে সূচনা করেন তারপর থেকে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে এবং ১৯৭১-এর পর বাংলাদেশে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু তারপর থেকে বাংলাদেশে তো বটেই এপার বাংলাতেও এই দিনটি পালিত হয় পরম শ্রদ্ধা ও গর্বের সঙ্গে—শুধু মাত্র অমর সাত শহীদের স্মরণের দিনরূপেই নয়, পরন্তু দিনটি সকল অত্যাচার ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সঙ্কল্প গ্রহণেরও। বলাবাহুল্য এই জানাটা আবৃত্তিকার যদি তাঁর উপলব্ধির গভীরে অনুভব করে যথাযথভাবে প্রকাশ করেন তবেই উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি উপযুক্তভাবে ব্যঞ্জিত হবে, শ্রোতৃমণ্ডলিকে যথাযথভাবে প্রাণিত করবে।

মুদ্রিত আকারে সব অক্ষর সব শব্দই এক মাপের হয় বলে আমরা জানি। কিন্তু আবৃত্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই মাপের ভিন্নতা ঘটে, আর বলাই বাহুল্য এই মাপের ভিন্নতার ক্ষেত্রগুলিই আবৃত্তির স্ব-ক্ষেত্র। "সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন।" জীবনানন্দ দাশের কবিতার এই পঙ্‌ক্তির তিনটি 'সব' ছাপার অক্ষরে এক মাপের হলেও কিন্তু আবৃত্তিতে তা হবে না।

উচ্চারণের ক্ষেত্রে ছোট-বড় মাপের দ্বারা ভাবব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য আনাই হবে আবৃত্তিকারের প্রধান কাজ। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাক বিমলচন্দ্র ঘোষের "মুখোস" কবিতাটি। কবিতাটির প্রতি স্ট্যাঞ্জার শেষে কবি তিনবার ব্যবহার করেছেন 'মুখোস' কথাটি (মুখোস ! মুখোস !! মুখোস !!!)। এখন তিনবার মুখোস কথাটি অতি অবশ্যই যে একইভাবে বলা যাবে না তা আবৃত্তিকারকে খেয়াল রাখতে হবে, আবার ফাঁকের মাপটা এমনভাবে বড় করা চলবে না যার ফলে ছন্দপতন হয়ে যায়। ছন্দ-প্রধান কোনো কবিতায় আবৃত্তিকারের পক্ষে ছন্দই একমাত্র শোনাবার বিষয় কিন্তু নয়, তবে ছন্দের পরিচয়টা অবশ্যই আয়ত্বে রাখতে হবে পরিবেশনের সময়। যেমন ধরা যাক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' কবিতার দু'টি ছত্র—

"বাংলার কবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে"

—এখানে যেমনভাবেই আবৃত্তি করি না কেন ছন্দ স্পষ্ট হয়ে উঠবেই কিন্তু সেই সঙ্গে কবি ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দে বা দু'টি-তিনটি শব্দ মিলে যে চিত্রকল্প আছে তাকে ব্যঞ্জিত করাও আবৃত্তিকারের কাজ। আবার—

"আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরুদুরু
পেয়েছে খবর পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু।"

—এখানে আবৃত্তিকারকে "কাঁপে" এবং "যেন তার" এই দু'য়ের মাঝখানে খুব সাবধানে একটু ফাঁক দিতে হবে (প্রয়োজনমতো চোরা দম নিয়ে) আবার ভাবটিকেও অখণ্ড রাখতে হবে। বলাই বাহুল্য, আলোচ্য বক্তব্য ঠিক বলে বোঝানোর নয়, করার ; করে দেখানোর ব্যাপার। ধরা যাক কেউ রবীন্দ্রনাথের 'নীলমণিলতা' কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। প্রথম দু'টি পঙ্‌ক্তি হল :

"ফাল্গুন মাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে
নীলমণি মঞ্জরীর গুঞ্জন বাজায়ে দিল কি রে !"

—দু'টি পঙ্‌ক্তিতে পাঁচটি M-Sound অক্ষর আছে, নয়টি N-Sound অক্ষর আছে। যিনি আবৃত্তি করবেন তাকে খেয়াল রাখতে হবে M ও N Soundগুলি যথাযথ উচ্চারণ করার অথচ নাকি সুর না আসে, ছন্দ বজায় থাকে এবং সর্বোপরি Sound echoes the sense শ্রোতৃমণ্ডলীর কানে পৌঁছয়। অন্য কবিতার সঙ্গে এই M ও N Sound ব্যবহৃত শব্দের বাহুল্যযুক্ত কবিতার ব্যঞ্জনা তো কিছুটা অবশ্যই স্বতন্ত্র। আবার কবির কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের আবৃত্তি করায় অসুবিধার প্রশ্নও আছে। যেমন ধরা যাক সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রাণার' কবিতাটির 'রাত্রির পথে

পথে চলে' পঙ্‌ক্তিটি। ছন্দের ক্ষেত্রে ভাগটা হবে "রাত্রির পথে—পথে চলে", কিন্তু অর্থের দিক থেকে 'পথে পথে' কথাটা একসঙ্গে বলা দরকার। পঙ্‌ক্তিটি যদি হোত —"চলে রাত্রির পথে পথে" অর্থাৎ "চলে" কথাটা যদি পথের পরে না থেকে রাত্রির আগে বসানো হোত তাহলে আবৃত্তির দিক থেকে খুবই সুবিধা হোত। রবীন্দ্রনাথের সুন্দর একটি ছন্দের কবিতায় দু'টি পঙ্‌ক্তি হলো :

"গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
দুমুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন।"

উচ্চারণগতভাবে সেনের সঙ্গে যে কথাটি মিল করা হয়েছে তা হলো "দ্যান"। রবীন্দ্রনাথকে কোনো একজন ব্যাপারটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে উত্তর দিয়েছিলেন 'সেন'টা পূর্ব বঙ্গের আঞ্চলিক উচ্চারণে (অর্থাৎ "শ্যান") লেখা হয়েছে।

আমরা জানি, কবিতা সাধারণভাবে চার রকমের—ভাব-প্রধান, ছন্দ-প্রধান, সুর-প্রধান এবং কাহিনী-প্রধান। এছাড়া কোনো কবিতা চিত্রময়, কোনো কোনো কবিতা আবার Content বা বিষয়াশ্রয়ী, কোনোটা আবার রূপক বা ব্যঞ্জনাধর্মী। অর্থাৎ কোনো কবিতার কবি প্রাণময়, কেউবা মনোময়, আবার কেউবা একের মধ্যে দুই-ই। ব্যঙ্গরচনাকার সাহিত্যিক নলিনীকান্ত গুপ্ত বিভিন্ন কবির বিচিত্র গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভৌতিক গুণের বিশ্লেষণ করে তাঁদের কাব্য-প্রকৃতি নিরূপণ করেছিলেন। পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটি বিভিন্ন গুণ আর শ্রী গুপ্তের মতে শেক্‌সপীয়ারে আছে আগুনের (তেজ) গুণ—তিনি তেজস্বান্‌, তপ্তপ্রাণ; মেটারলিংক-এর ভাব ও ভাষা উড়ে উড়ে চলে অর্থাৎ তিনি ব্যোম-চারী আর রবীন্দ্রনাথের ভাষা চলে স্রোতের (অপ্‌) মতো।

প্রসঙ্গত একটি উল্লেখ্য বিষয় নিবেদন করি। প্রায় সমস্ত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আসামের গণ-শিল্পী মঘাই ওজা যেভাবে ঢোলে বিস্ময়কর বোল তুলতেন তা যিনি না শুনেছেন এমন কি অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে না জেনেছেন তিনি কেমন করে আবৃত্তি করবেন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'মঘাই ওজার ঢোল' কবিতাটি। উদাহরণ দিই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

"দুর্গম পর্বতের চূড়ায় মানুষের প্রথম ঘোষণা ঢোলের চাপড়।
...ওজা ভাই, আজ আবার দরকার আরণ্যক ঢোলের আওয়াজ!
...ঝড়ের ঝাঁটা লাগে, লাগে আজ মাটিহীন চাষীর ঢোলের চাপড়,
লাগে লক্ষ জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে আদিম বাঘমারা গীত—
ধিনিকি ধিন্‌ ধাও, ধিনিকি ধিন্‌ ধাও।"

ঠিক তেমনিভাবেই জানা থাকা দরকার সলিল চৌধুরীর শপথ-এর লাইন "সেদিন সকালে সারা কাকদ্বীপে হরতাল হয়েছিল" ইত্যাদির পটভূমিকা কাকদ্বীপের ঐতিহাসিক কৃষক-আন্দোলন। অথবা আসামের গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অসমীয়া সাহিত্যিক জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার প্রশস্তি-কবিতা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের (অসমীয়া ও বাংলায় লেখা) "জ্যোতি প্রপাত"এর পশ্চাৎপট। 'দেবতার গ্রাস', 'পুরাতন ভৃত্য', দুই বিঘা জমি' ইত্যাদি কাহিনীপ্রধান কবিতা আবৃত্তির সময় ছন্দকে চেতনভাবে ভেঙে দিয়ে যথাসম্ভব কাহিনীকে স্পষ্ট করা দরকার। কিন্তু এর বাইরেও কাহিনী-ভিত্তিক ভাবপ্রধান কবিতা আছে যার শব্দার্থ বা বাচ্যার্থপ্রকাশে অনেক সমস্যা আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতাটির শেষ অংশ নিয়ে। অনেকেরই বোধহয় জানা আছে 'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই' কবিতার শেষাংশের অর্থ নিয়ে কবি সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বিতর্ক তুলেছিলেন খোদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ উত্তরে তার চিঠিতে বলেছিলেন: "...শেষ দুটি লাইনের সর্বনাম আমি ও সে—যে চলে যায় সেই হচ্ছে সে, তার স্মৃতিবন্ধন নেই। আর যে অহং কাঁদছে সেই তো ভার বওয়া পদার্থ। এখানে আমি বলতে কবি নয়, আমি-আমার করে যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। ...আমি জানি শাজাহানের এই অংশটি দুর্বোধ্য। তাই এক সময়ে এটাকে বর্জন করেছিলুম। তার পরে ভাবলুম কে বোঝে কে না বোঝে সে কথার বিচার আমি করতে যাব কেন, তোমাদের মত অধ্যাপকদের আক্কেল-দাঁতের চর্ব্য পদার্থ না রেখে গেলে ছাত্রমণ্ডলীদের ধাঁধা লাগবে কী উপায়ে?"—সুতরাং বোধহয় এখানে বোঝা গেল আবৃত্তিকারের এক্ষেত্রে দায়িত্বটা কত গুরুতর। শব্দকে সঞ্জীবিত করে শ্রোতার মনে ভাব ও অর্থকে সঞ্চারিত করা প্রক্রিয়ার তাই মনে হয় কোনো 'মেড-ইজি' নেই। তবে নিছক পাঠ বা উচ্চারণে কাজটা হবে না—সেটা জানা থাকা এবং বোঝা জরুরী ব্যাপার। আসলে কবি সুনিশ্চিত অর্থ নিয়ে পাঠক বা শ্রোতাকে যেখানে চালিত করতে চান সেখানে আবৃত্তিকারের কাজ মননধর্মী এবং হার্দ্র স্বর প্রক্ষেপণ দ্বারা শ্রোতাকে শুধু আকৃষ্ট বা আবিষ্ট করা নয়, প্রাণিত করা, উদ্বুদ্ধ করা ভাব ও রস-ব্যঞ্জনায়। প্রয়োজনে ছন্দের একটু-আধটু হেরফের ঘটিয়ে (মূল কাঠামোটা অতি অবশ্যই বদলানো যাবে না) ভাবের বৈচিত্র্য কিম্বা গভীরতা আনতে পারেন আবৃত্তিকার। কাজটাকে বলা যায় অনেকটা কবিতা-রূপ ভিতের ওপর শব্দের ইমারত গড়া কিম্বা নির্দিষ্ট কোনো ক্যানভাসে ছবি আঁকার মতো—নানান শেড, নানান আঁকি-বুকি দিয়ে চিত্রকর যেমন বিচিত্র মুড সৃষ্টি করেন, স্থপতি যেমন বিভিন্ন প্যাটার্ন সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সেই পুরোনো কথাটাই ঘুরে

ফিরে আসছে, আবৃত্তিকারের কাজ হলো শব্দের প্রতিমা গড়া। কি করে হবে, কেমন করে হবে সেটা ভাবার বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব আবৃত্তিকারের। মোট কথা কোনো দুটো চিত্রকর্ম বা স্থাপত্যকর্ম ঠিক এক হবে না অথচ এক মানসিকতা থাকতেও পারে আবার না-ও থাকতে পারে। মোট কথা অনেক—অনেক সংবেদনশীল মন নিয়ে আবৃত্তিকারকে কবিতা ও শ্রোতার মধ্যে ভাবের ও রসের সেতু-বন্ধনের দায় এবং দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে, নচেৎ স্বতন্ত্র প্রয়োগ শিল্পরূপে আবৃত্তিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা যাবে না। সুতরাং টেকনিক বা প্রকরণগত ব্যাপারটা আবৃত্তিকারের ক্ষেত্রে হেলাফেলা করার জিনিস নয়। একটু আলোচনা করা যাক। কেউ কেউ মনে করেন বেশী করে স্বর প্রক্ষেপণে আবেগ আরোপ করলে করুণ রসের কবিতাবৃত্তি সার্থক হয়ে ওঠে। আবার কেউ কেউ ভাবেন চীৎকার করে বা উচ্চস্বরে স্বর প্রক্ষেপণ করলে বীর-রসের পরিস্ফুটন সার্থক হবে। বলাই বাহুল্য দুটো ধারণাই ভুল। একটা সুনির্দিষ্ট ক্যানভাসে চিত্রশিল্পী যেমন কালোর সংঘাতে সাদাকে পরিস্ফুটিত করে তোলেন তেমনি করুণ-রস ফোটাতে আবৃত্তিকারের স্বর প্রক্ষেপণে এমন এক দৃঢ়তা কিংবা সংহত আবেগ আনতে হবে যার দ্বারা ঈপ্সিত করুণ-রসের প্রকাশ যথাযথভাবে মর্যাদামণ্ডিত হয়ে উঠবে। শব্দের ও বর্ণের মজ্জা উপলব্ধি করলেই তাকে শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করা যায় এবং বলাই বাহুল্য স্বরক্ষেপণের এই কৌশলটাই অনুশীলনলভ্য, মনন ও প্রাণনের সাধনা দরকার। পূর্বে আমরা M ও N Sound-এর ব্যবহার সম্পর্কে বলেছি, এবার 'L' বা 'ল' শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে বলা যাক। গানের ক্ষেত্রে হারমোনিয়ামের স্বর-সপ্তকে আমরা কোমল ও কড়ির ব্যবহারের কথা জানি। সাধারণভাবে ইংরেজি 'L' বা বাংলার 'ল' বর্ণটি নরম উচ্চারণসমন্বিত বলা হয়। যেমন Longing lingering look বাংলায় 'ললিত লবঙ্গলতা শতদলবাসিনী' কিন্তু ইংরেজিতে যদি বলি Loud কিম্বা বাংলায় 'লেলিহান শিখা' অমনি L এবং 'ল' কড়ি বা কঠিন হয়ে গেল। স্বর প্রক্ষেপণ ক্রিয়ায় এই দুই 'ল'-এর ব্যবহারই অভ্যাসসাপেক্ষ। প্রাচ্য দার্শনিকদের মতে চান্দ্রগুণকে রক্ষা করতে হয় সৌরশক্তি দিয়ে আর সৌর-শক্তির আধিক্যকে কোমল করতে হবে চান্দ্রগুণের প্রলেপের স্নিগ্ধতায়। পাশ্চাত্য রসতাত্ত্বিক মনীষী একই কথা বলেছেন—The heat must exist but we should know how to transfigure and overcome it অর্থাৎ গান ও অন্যান্য স্বতন্ত্র শিল্পের মতো আবৃত্তির অন্যতম প্রকরণসিদ্ধি হলো কড়ি ও কোমলের সুসমন্বিত প্রয়োগবিধি। বিজ্ঞানে বলে দু'ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মিলে জল হয়। কিন্তু জল যখন দেখি তখন কি হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

থাকে? দুধ, চিনি ও সুগন্ধি আতপ চালের উপযুক্ত রন্ধন দ্বারা তৈরী হয় পরমান্ন, যা আস্বাদনে তৃপ্তিলাভ ঘটে কিন্তু পরমান্নে কি দুধ বা চিনি বা সুগন্ধি চালের স্বতন্ত্র গুণ পরিলক্ষিত হয়? সৌন্দর্যতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের মূল কথাই এখানে। অ্যারিষ্টটলের ভাষায় **Organic unity and sense of the whole**—আসলে বিভিন্ন অংশের সুষমবিন্যাস।

আবৃত্তির ক্ষেত্রে এই সুষম সামঞ্জস্যবিন্যাস ঘটা চাই কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, ছন্দযতি, ভাব এবং লাবণ্যের পারিপাট্যে। অনুশীলনের সময় এর প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে বিচার্য হলেও প্রয়োগে কিন্তু এগুলির স্বরূপ হবে পরমান্নের।

আমরা তো জানি ব্যষ্টি মনই শিল্পসৃষ্টির আধার। কিন্তু মনেরও তৈরী হওয়া, শিক্ষিত হওয়া, পারিপার্শ্বিক সচেতনতা সম্পর্কে সজাগ হওয়া চাই, তবেই তো শিল্পীমন সামাজিক দায়বদ্ধ হয়ে উঠবেন এবং এইভাবেই একাধিক ব্যক্তিমন নিয়ে সমষ্টি-শিল্প প্রয়োগের শুভ সূচনা ঘটবে। জনৈক পাশ্চাত্য-শিল্প-সমালোচকের প্রাসঙ্গিক উক্তিকে স্মরণ করা যাক।

তিনি বলছেন: "মত্ত হওয়ার জন্যে দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই কিন্তু প্রকৃত শৈল্পিক-শ্রবণ নিজেই একটি শিল্প। শ্রোতাদের মধ্যে একটি শ্রেণী সহজেই তুষ্টিতে থাকে এবং এর ফলেই শিল্প-মর্যাদার মান ক্ষুন্ন হয়। এদের তেমন বিচার বোধ নেই যা শিল্প সুষমামণ্ডিত আনন্দ উপলব্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।" তাই, কারো কারো স্থূল ধারণার অনুবর্তী হয়ে আমরা যেন ভুলে না যাই যে আবৃত্তি শুধুমাত্র আবৃত্তিই, এটা অভিনয় নয়, গান নয় আর পাঠও নয়। তবে এই বৈশিষ্ট্য-বোধলাভের জন্য সামগ্রিক অনুশীলন প্রক্রিয়ার কোনো বিকল্পও নেই। তাছাড়া সৎ আবৃত্তিকার তিনিই যিনি শ্রোতাদের প্রাণ-মনকে নাড়া দেওয়ার চেয়েও শ্রোতাদের সচেতন কানকে বেশী মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেন।

রূপক বা ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতার আবৃত্তি সম্পর্কে প্রসঙ্গত কিছু বক্তব্য নিবেদন করা যাক। কবিতা বা নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রকৃত অর্থ শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করা আবৃত্তিকারের কাজ, এ কথা আমরা পূর্বে বলেছি। কেউ হয়ত প্রশ্ন করবেন—কেন দরকার। উত্তরে বলা যায়, আধুনিক যুগের কবি বা লেখকরা যা লেখেন সেখানে নিজের কথা যেমন থাকে, বাইরের জগতের অন্যান্য কথাও বেশ কিছু থাকে। ধরা যাক শঙ্খ ঘোষের 'যমুনাবতী' কবিতা। প্রথম কয়েকটি পংক্তি হলো:

"নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে।

নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী
দু'এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি'।"

এখন কবি শঙ্খ ঘোষের উদ্ধৃত পংক্তিগুলির ওপর ইংরেজ কবি Thomas Hoodএর চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন। যেমন :

One more unfortunate
Weary of breath
Rashly importunate
Gone to her death.

বলাবাহুল্য Thomas Hoodএর মূল কবিতার উদ্ধৃতাংশের ভাবসূত্র অবলম্বন করেই কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'যমুনাবতী' লিখেছেন। আবৃত্তিকার যখন শঙ্খ ঘোষের কবিতাটি আবৃত্তি করবেন তাঁকে অবশ্যই Thomas Hood-এর পংক্তি ক'টির ভাবসূত্র উপলব্ধি করতে এবং সেই উপলব্ধির নিরিখে বাংলা পংক্তিগুলি নিষিক্ত করে তার প্রকাশভঙ্গিতে যথাযথভাবে সঞ্চারিত করতে তৎপর হতে হবে। তা যদি না হয় তাহলে—

"নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটুকাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে।"

পংক্তিগুলি তিনি নিছক আর পাঁচটা পদ্য পাঠ করার মত বলবেন, বড়জোর ছন্দ রক্ষিত হবে কিন্তু কিছুতেই মূল ভাবের রসাস্বাদন করাতে পারবেন না শ্রোতাকে। একবার কবি বিষ্ণু দে তাঁর এক কবিতায় একটি পংক্তি লিখলেন—"শরতের মাতিস্ আকাশ"। আমার মনে আছে—এর অর্থ করা নিয়ে কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন পাঠকমহলে অনেক আলোচনা হয়েছিল। প্রশ্ন হলো, এই মাতিস্ কি কোনো রং? যিনি এ কথা জানেন না যে মাতিস্ একজন জগদ্বরেণ্য ফরাসী চিত্রশিল্পী, বিশ-শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিতর্কিত ফরাসী চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসোর গুরু ছিলেন তাঁর কাছে প্রথমত কবিতাটি দুর্বোধ্য মনে হবে। দ্বিতীয়ত হয়ত তিনি পাগলের মতো ডিক্সনারী হাতড়ে শব্দটি খুঁজে না পেয়ে ভেবে বসবেন 'বিষ্ণু দে কি যে ছাইপাঁশ লেখেন' বা ঐ জাতীয় কোনো কিছু। কিন্তু তাঁর যদি জানা থাকতো মাতিস তাঁর এক বিশ্ববিখ্যাত ছবিতে (অর্ধশায়িত নারীমূর্তি) এক

অপ্রচলিত ধরনের হাল্‌কা নীলরং ব্যবহার করেছিলেন এবং সেই নীল-রংকে মনে করেই কবি বিষ্ণু দে তাঁর লিখিত কবিতা-পঙ্‌ক্তিতে আকাশের সেই বিশেষ নীল-রং-এর ব্যঞ্জনা আনতে চাইছেন তাহলে আর কোনো গণ্ডগোল থাকে না। সুতরাং একজন আবৃত্তিকারকে যদি শিল্পী হয়ে উঠতে হয় প্রকৃত অর্থে তাহলে তাঁকে অতি অবশ্যই জগতের সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি অন্যান্য মাধ্যমগুলির সম্পর্কে সম্যক্‌-জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয়ে উঠতে হবে, নচেৎ তিনি নিজেই যা জানেন না তার রস শ্রোতাদের নিকট পরিবেশন করবেন কি করে? বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের একটি নিবন্ধ—"কবির চোখে আবৃত্তি" থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক :

"আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় আবৃত্তিকার, তাঁর কণ্ঠস্বর সত্যিই খুব ঈর্ষণীয় কিন্তু তাঁর কবিতা-পড়া শুনলেই আমার মনে হয় তিনি নিজে কবিতাটির অর্থ একেবারেই বোঝেন নি। কবি জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার একটি লাইন আমার মনে পড়ছে। পঙ্‌ক্তিটি আশা করি আপনারা সকলেই জানেন : 'আমাদের ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত করে'। কবি এই 'ক্লান্ত' শব্দটি তিনবার লিখলেন। যিনি কবিতাটি পড়বেন তিনি নিশ্চয়ই এই ভেবে পড়বেন যে, অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়, আরও এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের গভীরে খেলা করে, আমাদের ক্লান্ত, ক্লা…ন্ত, ক্লা…ন্…ত করে। অর্থাৎ লক্ষ্যণীয় যে ক্লান্তিটা বাড়ছে। 'ক্লান্ত' শব্দটি কবি লিখেছিলেন এই কারণে যে, তাঁর ক্লান্তিটা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর বিরক্তি, তাঁর দুঃখ, তাঁর হতাশা ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য। অথচ যদি কোনো আবৃত্তিকার এভাবে পড়েন—'আমাদের ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত করে' তাহলে আমার মনে হয় পড়াটা কোনোরকমে হলেও অর্থটা পৌঁছে দেওয়া গেল না। অর্থ বোঝার সঙ্গে সঙ্গে পড়ার ভঙ্গীর অনুধাবনেরও প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ণীত হয় আবৃত্তিকারের গুরুত্ব।

আজকাল বেশ কিছু তথাকথিত আবৃত্তিকারের কণ্ঠ মুহুর্মুহুঃ, নানান জায়গায় শোনা যায়। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁদের কবিতাপাঠ শ্রবণযোগ্য হয়ে ওঠে না। অথবা শুনতে ভালো লাগলেও অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা কবিতার অর্থ আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন না এবং পারেন না বলেই আবৃত্তিকার হিসেবে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।"

অর্থপ্রকাশের ব্যাপারেও অনেক রকম সংশয়, সংকট দেখা দেয়। এ সম্পর্কে আবৃত্তিকার শ্রীপ্রদীপ ঘোষের লিখিত বক্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করলে ব্যাপারটা বোধহয় পরিষ্কার হবে—

"কবি নিজেকে প্রকাশ করেন। আবৃত্তিকার তাঁর উপলব্ধিতে তা গ্রহণ করে

পৌঁছে দেন শ্রোতাকে—সেই সঙ্গে নিজের বোধ, বুদ্ধি, অনুভব, অভিজ্ঞতাও যুক্ত হতে পারে, বক্তব্যও এসে যায় হয়ত বা। শুধু কবিতা নিয়েও কম সংশয় নেই। যেমন সুকান্তের 'প্রিয়তমাসু' কি বৈপ্লবিক সমাজচেতনার পরিপন্থী কবিতা? আমাকে অনেকে তো তাই বলেছেন। বিষ্ণু দে'র 'ঘোড়সওয়ার' কেউ বলেন কুমারী-মনের আকাঙ্ক্ষার, কেউ বলেন বিপ্লবের। রবীন্দ্রনাথের 'জন্মান্তর'?—শুধুই ব্যঙ্গ না প্রচ্ছন্ন কৌতুক বেদনার! জীবনানন্দের দুঃখ কি বিষণ্ণতায় রিক্ত করে না প্রশান্ত নির্লিপ্তিতে মগ্ন? সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' কি ছোটদের জন্য, একি কমিক্যাল—হাসির কবিতা? আমার তো মনে হয়েছে সমাজসচেতনার কবিতা—নানা বৈষম্যের প্রতি বিদ্রূপের কবিতা বিচিত্র ছন্দে ও রূপকে। এমনি সব অর্থের সঙ্গে সঙ্গে পড়াও তো বদলে বদলে যাবে। যাওয়া উচিত।"—অত্যন্ত খাঁটি কথা। কবি যেখানে সুনিশ্চিত অর্থ নিয়ে পাঠক-শ্রোতাকে বোঝাতে বা পরিচালিত করতে চান আবৃত্তিকার সেখানে বহুবিচিত্র কল্পনার অবকাশে শ্রোতাকে শুধু আকৃষ্ট বা আবিষ্ট করারই চেষ্টা করেন না বা করবেন না, শ্রোতাকে প্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ করতেও তৎপর হবেন। এলিয়ট যখন 'ফোর কোয়ার্টেটস্' নামক তাঁর সুবিখ্যাত সুদীর্ঘ কবিতাগুলি রেকর্ড করার জন্য পাঠ করেছেন তখন রেকর্ডিং-এ তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কবিতার ধ্বনিতরঙ্গে পরম্পরার স্বরূপটিকে শ্রোতাদের কাছে নির্দেশ করা। পরবর্তীকালে কোনো আবৃত্তিকার যখন এই কবিতাগুলিই আবৃত্তি করেন তখন এলিয়টের কণ্ঠে ব্যবহৃত ধ্বনিস্রোতের অনুসরণ করা আবৃত্তিকারের পক্ষে অত্যাবশ্যক না হতে পারে এবং না হলে সবক্ষেত্রে তা যে দোষের হবে তা বলা যায় না।

অনেকেই কবিতা আবৃত্তির সময় নাটকীয়তা আরোপ পছন্দ করেন। প্রশ্ন উঠতে পারে আবৃত্তিতে নাটকীয়তার স্থান আছে কিনা। এর উত্তরস্বরূপ বলা যায় প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটা নির্ভর করে কবিতার রচনাপদ্ধতির ওপর। "কুবলাখান" তো খানিকটা নাটকীয়ভাবেই আবৃত্তি করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের 'হোরিখেলা', নজরুলের 'কামালপাশা' কবিতা আবৃত্তি তো নাটকীয় হবেই। কিন্তু যেটা খেয়াল রাখতে হবে তা হলো নাটকীয় অভিনয় হবে না—ছন্দ, যতি, শব্দের সঠিক উচ্চারণ, ব্যবহৃত চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনা ফোটাতে উপযুক্ত স্বরক্ষেপণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কিছুটা সংযত নাট্যাবেগসহ আবৃত্তি হবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য 'কর্ণকুন্তী সংবাদ'এর কবিকণ্ঠে রেকর্ড বোধহয় অনেকেরই শোনা আছে। কর্ণ ও কুন্তীর দ্বৈত-ভূমিকায় একজন পুরুষ ও একজন নারীকণ্ঠে আবৃত্তি হলে অবশ্যই আরো ভালো শোনাতো কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখতে হবে দু'টি চরিত্রই কবি একা বলেছেন। একদিকে কুন্তীর মাতৃহৃদয়ের

বেদনা, আকৃতি অন্যদিকে সত্যনিষ্ঠ বীর কিন্তু অভিমানী কর্ণের বহুবিচিত্র নাটকীয় আবেগ পরিস্ফুটন করেও কবি কখনো আবৃত্তির নিয়মবিধি লঙ্ঘন করেন নি। স্মরণ করুন শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি কী অসাধারণ সংযত ও সংহত ভঙ্গিতে বীর কর্ণের প্রবলতম অভিমান ও নির্লোভ সত্যভাষণ উচ্চারিত করেছেন কবি :

"জয়লোভে, যশোলোভে, রাজ্যলোভে অয়ি
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।"

কিন্তু কেউ যদি সব তরকারীতে গোলআলুর ব্যবহারের মত রবীন্দ্রনাথেরই গীতাঞ্জলি কাব্যের কোনো কবিতা নাট্যাবেগ দিয়ে আবৃত্তি করার চেষ্টা করেন তাহলে এক কথায় বলা যায় তা হবে হাস্যকর।

আবৃত্তির প্রকাশভঙ্গি প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন কেউ কেউ করতে পারেন—কবির কাছে তাঁর লেখা কবিতার যে অর্থ তা ছাড়াও আবৃত্তিকারের কাছে অন্য কোনো অর্থ যদি ফুটে ওঠে সেক্ষেত্রে আবৃত্তিকার কীভাবে আবৃত্তি করবেন—নিজের বোঝা অর্থে না কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে কোনো ভাল কবিতা হীরের টুকরোর মত। (রবীন্দ্রনাথ কাল্‌চারের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—কমলহীরের দ্যুতি।) হীরের যে কোনো কোণ থেকেই দেখা যাক না কেন দ্যুতি বিচ্ছুরিত হবেই। প্রকৃতপক্ষে এক একটা কোণে এক একটা আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটে থাকে। তেমনি কবি যা ভেবে কবিতাটি লিখেছেন তা আবৃত্তিকার যদি অন্য অর্থে গ্রহণ করেন এবং সেই অর্থ যদি শ্রোতার কাছে সার্থকভাবে সঞ্চারিত করতে পারেন তাতে নিশ্চয়ই দোষ নেই। কোনো অর্থ যদি অনর্থ না হয়ে আরো ব্যাপকতালাভ করে তবে ক্ষতি তো হয়ই না পরন্তু লাভজনক তো বটেই, সর্বতোভাবে কাম্যও।

সাম্প্রতিককালের অনেক আবৃত্তিকার (তার মধ্যে বেশ নামী বা গুণীও কয়েকজন আছেন) কেমন যেন এক type কণ্ঠের অধিকারী। ফলে নানান ধরনের কবিতা আবৃত্তির ব্যাপারে মনের দিক থেকে এঁরা কেন যেন তৈরী নয় বলে মনে হয়। ফলে, কেউ হয়ত নাটকীয় কবিতার কিম্বা উচ্ছল লিরিক কবিতার আবৃত্তিতে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখান কিন্তু অন্য জাতের বা অন্য মেজাজের কবিতায় সেই একই type কণ্ঠ প্রয়োগ করে হয়ত শ্রোতাকে আকর্ষণ করেন, আচ্ছন্ন করেন, এমনকি নিজস্ব জনপ্রিয়তার মূল্যে আপাত 'ধন্য ধন্য' ধ্বনিও শোনেন কিন্তু অনেক রসিক শ্রোতার প্রাণ ও মন ভরাতে ব্যর্থ হন। এর একটা কারণ বোধহয় এই যে, আজকের কবিতা-আবৃত্তির কাজটা আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয় আগের দিনের আবৃত্তিকারদের চেয়ে বর্তমানের আবৃত্তিকারদের অনেক বেশী কাব্যবোধসম্পন্ন হতে হবে, আর কাব্যবোধটা তো শেখানো যায় না, শিখে নিতে হয়। এ বিষয়ে

প্রবীণ কবি শ্রীঅরুণ মিত্রের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক: "আধুনিক বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত শব্দসমষ্টি অনেক সময়েই ব্যক্তিক বা সামাজিক সংকেতবাহী, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা যতো-না অখণ্ড তার চেয়ে বেশী টুকরো টুকরো এবং বাক্‌প্রতিমা বা রূপকল্প (অর্থাৎ image) প্রায়শ উপমা-উৎপ্রেক্ষার টুকরো-সমষ্টির মস্তাজ। আজকের কবিতায় যতো-না বিবৃতি, তার চেয়ে বেশি ব্যঞ্জনা—সূক্ষ্ম, জটিল, দূরাভিসারী। ফলত, এ-কবিতা যতোখানি কানে-শোনার ও শুনে যতোখানি উপভোগ করার, ততোখানিই, কিম্বা হয়তো তার চেয়েও বেশি চোখ-দিয়ে পড়ার, নিবিষ্ট অভিনিবেশের এবং উপলব্ধির।" তাইতো শ্রীমিত্রের মতে "আজকের দিনে কবিতার পরিবহনের কাজটিকে সফল করে তুলতে হলে আবৃত্তিকারকে যেমন রীতিমতো সূক্ষ্ম সংবেদনশীল কাব্য-পাঠক হতে হবে, লক্ষ্য করতে হবে কবির mood বা মেজাজের আচমকা রকমফের, তেমনই প্রায়শই ছন্দ, মিল, কাব্যিক ভাষা ও নাটকীয় গুণের আপাত অসদ্ভাব এবং এমন কি কোথাও-কোথাও কবিতায় স্পষ্ট বা যুক্তিসিদ্ধ কাঠামো বা structure-এর অভাবের দিকেও নজর রেখে আবৃত্তিকারের স্বরক্ষেপকে তার উপযোগী করে তুলতে হবে। তাঁকে স্বীয় শক্তিতে আবিষ্কার করতে হবে অ-নাটকীয়তার অন্তর্নিহিত নাটককে, বুকচাপা আবেগকে চেপে রেখেও তার থরথর কাঁপুনি শ্রোতার কানে সূক্ষ্মকৌশলে ধরিয়ে দিতে হবে।"

বিষয়টা সত্যিই বেশ কঠিন কিন্তু তবু বলি অসম্ভব নয়। অসম্ভব নয় বলেই অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে আবৃত্তিচর্চা (ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত-ভাবে) প্রয়াসে অনেক বেশি উদ্দীপনা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অতি অবশ্যই এসে পড়ে আবৃত্তিকারের পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক সচেতন-তার প্রশ্ন। সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো আবৃত্তির ক্ষেত্রেও যে চলতি কথাটা স্মরণে রাখা দরকার তা হলো পরিবেশানুযায়ী পরিবেশন। আবৃত্তিকার যত যোগ্যই হোক না কেন পরিবেশ-সচেতনতা না থাকলে তাকে ঠকতে হবে, হতাশ হতে হবে। আবৃত্তিকার মনে মনে ঠিক করে গেলেন তিনি পৃথিবী কবিতা কিম্বা বিষ্ণু দে'র 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' আবৃত্তি করবেন বা পাঠ করবেন। কিন্তু জায়গাটি হয়ত একটা পাঁচমিশেলি জলসার আসর, সেখানে serious কবিতা শোনার মতো serious শ্রোতার অভাব ঘটা বিচিত্র নয়। কিন্তু জায়গাটা যদি নিছক কবিতাপাঠ বা আবৃত্তির আসর হয় তাহলে আবৃত্তিকারের সততা-আন্তরিকতা-উপযুক্ততা প্রমাণের দ্বারা যথাযথ appreciation হবেই। এর অন্য কারণ হয়ত থাকতে পারে কিন্তু আমার মনে যে কারণটা প্রবলভাবে দেখা দেয় তা হলো কবির কবিতা-পড়া আর আবৃত্তিকারের আবৃত্তি করার মধ্যে প্রকরণগত প্রভেদ। কবি যখন কবিতা পড়েন

তখন কবির ব্যক্তিত্বই প্রধান আকর্ষণ কিন্তু আবৃত্তিকারকে শুধু ব্যক্তিত্ব হিসাবেই বিচার করা হয় না, তিনি কী পড়ছেন, কেমনভাবে পড়ছেন এটাই তাঁর সম্পর্কে শ্রোতাদের প্রধান আকর্ষণ হয়। এটা ঠিক কি বে-ঠিক সে বিচার না করেও বলা যায় শ্রোতারা চান আবৃত্তিকার তাঁর বিষয়বস্তুর (কবিতার) পরিবেশনায় তাঁর অনুভবকে শ্রোতাদের অনুভবের জগতে এমনভাবে ব্যঞ্জিত করুন সঞ্চারিত করুন যার ফলে সেই বিষয়বস্তুর নতুন মাত্রা উদ্ভাসিত হবে। ব্যাপারটি কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঘটে পরিবেশবিশেষে। উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যকে পরিষ্কার করি। রবীন্দ্রনাথের 'ত্রাণ' কবিতাটি স্মরণ করা যাক। এই কবিতার সাধারণ অর্থ—সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা "এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়, দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়"। কিন্তু এই পংক্তিটির মধ্যে একটি বিশেষ অর্থও তো আছে যা জাগ্রত প্রতিবাদী চরিত্রের মানুষের সংকল্পগ্রহণের অমোঘ মন্ত্ররূপে কাজ করে। পাঠকরা তো জানেন রবীন্দ্রনাথেরই রচনা (কোমলভাবের ব্যঞ্জনাস্বরূপ) 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' পংক্তিটি মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে কিভাবে আলোড়িত, উদ্বোধিত করেছিল এবং তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ বোধহয় এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি আজ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে Black Poetদের Black Poems-এর কথা এসে পড়ে। আমাদের কাছে মোলায়েজ একজন বীর শহিদ যিনি হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি বরণ করেছেন। আমাদের দেশের কোনো আবৃত্তিকার যখন মোলায়েজের কোনো কবিতার অনুবাদ আবৃত্তি করবেন তখন ঐ বীর শহিদের বীরত্বের এক কল্পিত চেহারাটিই তিনি অনুভব করেছেন। কিন্তু মোলায়েজের দেশের একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী কোনো কবি (যাঁরা নিজেদের Black Poetরূপে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে থাকেন) যখন ঐ মোলায়েজেরই কোনো কবিতা আবৃত্তি করবেন তখন তাঁর সামনে কোনো কল্পিত অনুভব নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ সেই Black Poet তখন একটা অত্যাচারিত, অপমানে লাঞ্ছিত দেশের মরণপণ-করা লড়াকু স্পর্ধিত মানুষ যে তার জীবন-আপনজন-সমাজ এমনকি সর্বস্ব পণ রেখেও জয়ের সম্বন্ধে অটল-অচল। হয়ত তাঁর উচ্চারণে কবিতার অনেক সর্ত লঙ্ঘিত হবে কিন্তু তবু সেই উচ্চারণে যে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র এক অনুভূতির প্রকাশ মিলবে তার মূল্য কিন্তু অপরিসীম। এটাকেই বোধহয় রমঁ্যা রলঁ্যা বলেছেন instigation,—যা কিনা শিল্পসৃষ্টির অন্য উদ্দেশ্য entertainment-এর থেকে আরো বেশী গভীর কোনো মাত্রা ব্যঞ্জিত করার উদ্দেশ্যকে সার্থক করে।

এখন এই যে Instigation-এর কথা বা সংহত প্রতিক্রিয়ার কথা বললাম সে সম্পর্কে অন্য একদিকের বিষয়ে নিবেদন করি বন্ধু-আবৃত্তিকার শ্রীপ্রদীপ ঘোষের

জবানিতে : "আমি অবশ্য এমন ধরনের প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি না যেমন করে 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবেই' ব'লে সেই fade in fade out ক'রে কণ্ঠস্বরের নানারকম খেলা দেখিয়ে আমরা খুব উদ্দেশ্যহীনভাবে অন্য একটা জায়গায় চলে যাই। আমাদের মানসিক প্রস্তুতি সেইভাবে বাঁধি না এবং শ্রোতাকেও আমরা সেইভাবে মানসিক প্রস্তুতির সুযোগ দিই না। মোটামুটি কণ্ঠের কারুকার্যে খুব মগ্ন-মুগ্ধ হয়ে তাঁরা যেমন কবিতার আসল বক্তব্য থেকে স'রে যান, আমি সেই পরিস্থিতির কথা বলছি না। খুব স্পষ্টভাবে 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' বলা যায় এবং ঠাণ্ডাঘরের প্রকোষ্ঠে নিছক বিনোদনের উদ্দেশ্যে তা যদি না হয়, যদি সে রকম অর্থে, সে রকম পরিবেশে সেটা পরিবেশন করা যায়, তাহলে সত্যিই 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই' এই কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কোনো সংগ্রামের প্রস্তুতি এবং যাত্রা শুরু হতে পারে।

"আপনারা নিশ্চয় জানেন এটা সিকান্দার আবু জাফরের কবিতা এবং এটা লেখাও হয়েছিল একটি সংগ্রামের পটভূমি থেকেই। যখন ফতিমা জিন্না হেরে গিয়েছিলেন মহম্মদ আলি—আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে, তখন এটা লেখা হয় এবং এই কবিতাকে কেন্দ্র ক'রে সেখানকার মানুষ শপথ নিয়েছিলেন যে, 'আমরা এই মিলিটারি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।' তাই এটা কিন্তু লড়াইয়ের কবিতা। কিন্তু আজ তাকে আমরা যখন এপারে পড়ি তখন কিন্তু কবিতার ব্যঞ্জনা ঐ অর্থে আমরা প্রকাশ করি না। শ্রোতারাও কণ্ঠের নানারকম কারুকাজে মোটামুটি তৃপ্ত হয়েই চ'লে যান। এখানে কবিতার মূল থেকে আবৃত্তিকার ও শ্রোতা উভয়েই স'রে আসছেন। তার যে পটভূমি, সেই পটভূমির সঙ্গে পরিচয় নেই ব'লেই এই ঘটনাটা ঘটছে।"

স্বভাবতই একটি বিষয়ে আলোচনার ব্যাপার এসে পড়ে যদি কিনা আবৃত্তিকে স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্প মনে করা হয় বা মেনে নেওয়া হয়। বিষয়টি হলো গণ-আবৃত্তির সম্ভাবনা এবং প্রাসঙ্গিকতা। আমার মনে হয় গণ-সঙ্গীত, গণ-নাট্যের মতোই গণ-আবৃত্তির প্রাসঙ্গিকতা আছে, তবে সম্ভাবনার ব্যাপারটা বিতর্কসাপেক্ষ, কারণ বঙ্গসংস্কৃতির আঙিনায় বয়সের দিক থেকে স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পরূপে আবৃত্তি কনিষ্ঠতম। অবশ্য এই কথা বলে আমি সম্ভাবনার সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করছি না যেমন, তেমনি সম্ভাবনার পথে বাধার ব্যাপারটাও মনে রাখতে বলছি। প্রাসঙ্গিকতা ও সম্ভাবনার স্ব-পক্ষে প্রথমে আমরা বক্তব্য ও যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখাবো, তারপর বিপক্ষের বক্তব্য ও যুক্তির কথা আসবে। গণ-আবৃত্তির স্ব-পক্ষে বর্তমান বাংলা তথা ভারতের প্রবীণতম নাট্যকার সন্তপ্রয়াত শ্রদ্ধেয় মন্মথ রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন :

"আবৃত্তি সাধারণতঃ শিক্ষিত মানুষেরই উপভোগ্য হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই নিরক্ষর দেশে গ্রামে গঞ্জে সাধারণ মানুষের কাছে আবৃত্তির মাধ্যমে কোনো ভাব প্রচার করতে গেলে সেই ভাবটিকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় বিশেষভাবে রচনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বক্তৃতার কথা আমার মনে হচ্ছে। বক্তৃতা শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষ সবাই শোনে এবং বোঝেও। তাই আমার বিশ্বাস সাধারণ মানুষ যদি বক্তৃতা বুঝতে পারে তবে আবৃত্তিও আরো বেশি ভালো বুঝতে পারবে।...আবৃত্তিকে গণশিল্পে পরিণত করতে হলে এ বিষয়ে আবৃত্তিশিল্পীকে অবহিত হতেই হবে।...আগেকার দিনে যাত্রাপালা, নাটক ইত্যাদি গ্রামে গঞ্জে পরিবেশিত হতো, সেখানেও গুরুগম্ভীর সংস্কৃতশব্দের উচ্চারণভঙ্গি এবং বক্তার চোখমুখ ও দৈহিক সঞ্চালন ঐসব দুরূহ শব্দগুলিকে অর্থবান এবং প্রাণবন্ত করে তুলতো—সঠিক উচ্চারণ তো আবৃত্তিরই একটি পরম বৈশিষ্ট্য।...জাতীয় প্রয়োজনে আমাদের নাটক উৎসর্গীকৃত, চিরদিনই একথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এসেছি।...আবৃত্তিও আমাদের জাতীয় সংগ্রামের একটি দুর্ধর্ষ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে এবং তার প্রয়োজনও খুব বেশি।...সমাজতন্ত্রের জন্য ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামে প্রচার মাধ্যম খুব সহজ ও সুলভ হওয়া দরকার। আজ আমার মনে হচ্ছে গণ-জাগরণের মহা অভিযানে আবৃত্তিও সহজেই জয়যুক্ত হতে পারে।"

এবার বক্তব্য নিবেদন করা যাক প্রখ্যাত জীবনরসিক প্রবীণ চিত্রশিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক ধারণা, যিনি বলে থাকেন "আমার ছবি আর বটুকদার (কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) 'মধু বংশীর গলি' দুটোই শাণিত অস্ত্র।" 'বাল্মীকি স্মরণ' পত্রিকা থেকে নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছিলেন :

"আমি সমবেত আবৃত্তি স্রষ্টাদের অন্যতম, **I. P. T. A.** মঞ্চে বটুকদার (কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) সহযোগী হবার সৌভাগ্য আমার অনেকবার হয়েছিল। স্বভাবতই দেখেছি জনসংযোগের ক্ষেত্রে সমবেত আবৃত্তির ভূমিকা অত্যন্ত সংবেদনশীল। দেখেছি জীবনধর্মী কবিতা আবৃত্তির সময় শ্রাবকবৃন্দের ভেতর থেকে প্রাণ খুলে যোগ দিতেন বহু আগ্রহী কণ্ঠ। এখানেই সমবেত আবৃত্তির জয় একক আবৃত্তির থেকে বেশি। একক আবৃত্তি অনেকটা দরবারী সঙ্গীতের মতো। তার তাল, লয় বা ছোট ছোট মীড়ের কাজ রসিক কর্ণকেই আনন্দ দেয়, জনসমষ্টিকে একাত্ম করতে পারে না।"

আবার আরো একটি মত শোনা যায় : "যে কবিতার ভেতর গল্প আছে এবং ছন্দ আছে সেই কবিতার আবৃত্তিই বেশি জনসংযোগ রক্ষা করে।"

গণ-আবৃত্তির বিপক্ষে যাঁরা বলেন তাঁদের প্রধান যুক্তিই হলো আবৃত্তিশিল্প

এখনো পর্যন্ত একটা Composite form পায়নি, ফলে গণশিল্পের বৃহৎ আঙিনায় কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবার মতো নিজস্ব ক্ষমতা এখনো সে অর্জন করেনি।

আবৃত্তিকে গণ-শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে কতকগুলি কাজ বোধহয় করা অসম্ভব নয়। যথা:

(১) সামাজিক আন্দোলনের কাজে লাগানো। জাতিভেদ, পণপ্রথা, বিচ্ছিন্নতা-বাদ ইত্যাদি জাতীয় সমস্যাগুলির ভয়াবহতা একক, দ্বৈত বা সমবেত আবৃত্তির মাধ্যমে তুলে ধরতে পারলে বক্তৃতা বা আলোচনার চেয়েও বেশী কাজ পাওয়া যেতে পারে।

(২) এদেশে আমরা সাধারণত বক্তৃতা দিয়ে মনীষী-তর্পণ সমাধান করি। হয়তো কখনো গানের ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু মনীষীদের বাণী বা রচনা যদি ভাল আবৃত্তির দ্বারা সম্প্রচারণের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আবেদনটা বোধহয় অনেক বেশী গভীর ও কার্যকরী হবে।

(৩) আমরা শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তনগানের ব্যবস্থা কেউ কেউ করি। ভাল কীর্তনগায়ক এখন নেই বললেই চলে। ফলে পারিবারিক ঐতিহ্য ও মর্যাদারক্ষার জন্য যেন-তেন-প্রকারেণ কীর্তনের আয়োজন অধিকাংশক্ষেত্রে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু উঁচুমানের শোক-কবিতা রচিত হয়েছে। এই কবিতাগুলি উপযুক্তভাবে যদি আবৃত্তি করানোর ব্যবস্থা করা যায় তাহলে শ্রাদ্ধ-বাসরের মর্যাদা ও গাম্ভীর্য যেমন বজায় থাকে তেমনি শোকার্ত আত্মীয়স্বজনেরও সান্ত্বনার অবলম্বন হয়।

আমার মনে হয় বিতর্কে প্রবেশ না করে বলা যেতে পারে ৩০/৪০ বছর আগে পর্যন্ত আবৃত্তির চল্ ছিল কিছু মানুষের ব্যক্তিগত আকর্ষণ-ক্ষেত্র, কিন্তু এখন সে অবস্থা কেটে গেছে। শুধুমাত্র আবৃত্তি পরিবেশন দিয়েই অনেক জায়গায় ৩/৪ ঘণ্টার অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাছাড়া আগে কবিতাপাঠ হবে শুনলে ভয় পেয়ে লোকে চলে যেতো, এখন কিন্তু কবিতা পড়া হবে শুনে লোকে আসতে আরম্ভ করেছে এবং তা ঐ আবৃত্তি করার ফলেই। সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গণ-আবৃত্তির সার্থকতার দিকে এগিয়ে যেতে পারা যায় বা সম্ভব।

আমরা পূর্ববর্তী অঙ্গীকার-পর্বতে বলেছি যে, আবৃত্তিকার হতে হলে প্রধানত প্রয়োজন অনুসরণ ও অনুশীলন, অনুকরণ নয়। এই কথাটিরই একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যান বোধহয় প্রয়োজন এবং তা করেই আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনায় উপসংহার টানব।

আমরা অনেকেই জানি কোনো বড় শিল্পীর অসাধারণ কৃতিত্ব (ইংরেজিতে থাকে

বলে মাস্টার-পিস্) দু'একটির বেশী হয় না। শ্রীশম্ভু মিত্রের আবৃত্তির মাস্টার-পিসরূপে উল্লেখ করা যায় (বলাই বাহুল্য এ নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের, সুতরাং মতান্তর হতেই পারে) 'মধুবংশীর গলি' ও 'নীলমণিলতা' ; কাজী সব্যসাচীর 'বিদ্রোহী' ও 'উদ্বাস্তু' ; দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জন্মভূমির প্রতি' ; প্রদীপ ঘোষের 'কামালপাশা' ও 'তোতাকাহিনী'।

এখন প্রশ্ন হলো, কোনো মাস্টার-পিস্ (এক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র রচিত 'মধুবংশীর গলি' এবং নজরুল-এর 'কামালপাশা') কবিতা অন্য কোনো আবৃত্তিকার কি আবৃত্তি করবেন না? সবিনয়ে বলব, না করাই ভাল। কারণ মধুবংশীর গলি এবং কামালপাশা কবিতা দু'টির আবৃত্তি শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীপ্রদীপ ঘোষ শহর-শহরতলী-গ্রাম-গঞ্জে অসংখ্যবার আবৃত্তি করে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন তা তাঁদেরই প্রাপ্য, অন্য কেউ তার ভাগ নিতে গেলে হয় নিছক অনুকরণ করে হাস্যাস্পদ হবেন নচেৎ অন্য কোনোভাবে করে নিজের গৌরববৃদ্ধির পরিবর্তে ব্যর্থ হবেন। তাছাড়া কবিতার তো অভাব নেই, অন্য আবৃত্তিকাররা অন্য কোনো কবিতা আবৃত্তি করে অনুরূপ গৌরব-লাভ তো অবশ্যই করতে পারেন।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এবং শিক্ষককেও কিছু-না-কিছু অনুসরণ করতেই হয়। তারপর আসে অনুশীলনের পালা। কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই নিজের মতো করে ভাবনাচিন্তা করতে ও শিখতে হয়। তাঁর প্রচেষ্টা হওয়া উচিত যাঁর কাছে শিখছেন বা যাঁকে অনুসরণ করছেন তাঁকে অতিক্রম করা অথবা স্বতন্ত্র কোনো ভূমিতে নিজের মতো করে দাঁড়াতে শেখা। আবৃত্তির সব কিছু প্রকরণেই যত বেশি তিনি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারবেন তত বেশী তিনি শিল্পীরূপে সার্থক হবেন। সুতরাং, তাঁর স্বতন্ত্র শিল্পীরূপে গড়ে উঠতে এবং প্রতিষ্ঠা পেতে শিক্ষকের অনুবর্তী হওয়া ভাল কিন্তু অনুকারী হওয়া কাঙ্ক্ষিত নয়।

প্রসঙ্গত তথ্যগত দিক থেকে উল্লেখ্য (১) শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্র থেকে আবৃত্তির তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে একটি চল্লিশ মিনিটের উদাহরণসহ আলোচনা শ্রীঅসীম বেজ-এর প্রযোজনায় বর্তমান নিবন্ধকার ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম করেন। (২) কলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে শ্রীঅজিত বসুই সম্ভবত সর্বপ্রথম আবৃত্তি বিষয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ বেতার-বিচিত্রা প্রযোজনা করেন (সাল তারিখ ঠিক স্মরণে নেই), যদিও কলকাতা কেন্দ্রে একক অনুষ্ঠান চল্লিশের দশকেই শুরু হয়।

॥ চতুর্থ ভাগ : দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তির রূপরেখা প্রসঙ্গে ॥

সাম্প্রতিককালের শ্রোতাদের কাছে অন্তত দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ব্যাপারটা বছর ৩০।৩৫ আগেও করতে হয়েছে, বোঝাতে হয়েছে সমবেত এবং দ্বৈত গানের মতো সমবেত ও দ্বৈত আবৃত্তির প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা আছে। তাছাড়া আবৃত্তিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে অধিকতর কার্যকরীরূপে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে একক আবৃত্তির চেয়ে দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তির উপযোগিতা ও তাৎপর্য উল্লেখযোগ্য। একক আবৃত্তি প্রধানত ব্যক্তিগত চর্চার জিনিস, যদিও কে আবৃত্তি করছেন সেই চিন্তা না করে কি আবৃত্তি করছেন সেই বিষয়টি অধিকতর জরুরী হওয়া উচিত। আর দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তির ক্ষেত্রে কি এবং কেমনভাবে করা হচ্ছে সেটাই জরুরী সুতরাং ব্যক্তিগত মেজাজে দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তি সার্থক হতে পারে না।

দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন :

প্রথমত, একজন কর্ণধার—যিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে একজোট করে একসুরে কথা বলবেন এবং তাঁকে যথেষ্ট স্থিতধী হতে হবে প্রয়োগের পদ্ধতিতে, নয়তো ঘন ঘন মত পাল্টালে কোনো কিছুই দানা বাঁধবে না।

দ্বিতীয়ত, বিষয় বা কবিতা নির্বাচন। আবৃত্তিযোগ্য সব বিষয় বা কবিতা দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তিতে উপযুক্ত না হতে পারে। সমবেত আবৃত্তির দলে যত বেশি লোক হবেন, শব্দায়ন, বাক্যবিন্যাস ও বিষয়বস্তু তত বেশি সাধারণ হওয়া প্রয়োজন।

তৃতীয়ত এবং সর্বোপরি সুশৃঙ্খল, কঠোর অনুশীলনসিদ্ধ ও ঋদ্ধ একক আবৃত্তিকার যদি দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তির শিল্পী হন তবেই ঈপ্সিত সার্থকতা পাওয়া যেতে পারে। অনেকের ধারণা প্রচলিত একক আবৃত্তির চেয়ে দ্বৈত বা সমবেত আবৃত্তি করা অনেক সহজ কাজ। সবিনয়ে বলব—এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। গানের ক্ষেত্রে যেমন একক গীত-কুশলতা দ্বৈত ও সমবেত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সার্থকতাবাহী, আবৃত্তির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকমের সত্য।

দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রতিককালের নতুন আবিষ্কার নয়, যদিও সাম্প্রতিককালে বহুবিচিত্র প্রয়োগের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

একক কণ্ঠে কিছু কিছু জিনিস বলা বা পৌঁছে দেওয়া অনেক সময় বেশ দুরূহ মনে হয় সেক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য একাধিক কণ্ঠে তা অনেক বেশী জোরালোভাবে (এবং বোধহয়, কম আয়াসে) অনেক সার্থকভাবে অনেকদূর পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু

দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তিতে কোনো বিষয়বস্তু উচ্চকিত এককস্বররূপে পৌঁছে দিতে গেলে যে ধৈর্যশীল কঠোর অনুশীলন প্রয়োজন সেটা ভুলে গেলে চলবে না। উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যাক :—আমরা জানি মধুসূদনের কোনো কোনো কবিতা আবৃত্তি করতে গেলে শব্দের ব্যঞ্জনাকে অর্গানের শব্দের মতো বিধৃত করতে হবে। যেমন—

"ভূতরূপ সিন্ধুজলে গড়ায়ে পড়িল বৎসর
কালের ঢেউ, ঢেউয়ের গমনে। নিত্যগামী রথচক্র
নীরবে ঘুরিল আবার আয়ুর পথে। হৃদয়কাননে
কতশত আশালতা শুকায়ে মরিল, হায়রে
কবো তা কারে, কবো তা কেমনে?"

—এই যে প্রতিটি শব্দের ভিতর ধ্বনির বিস্তার, ইংরেজিতে যাকে বলে **occeanic rolling**-এর মেজাজ, অথচ বেশ গভীর মহৎ বিষাদের সুর, এটাকে পরিশীলিত একক আবৃত্তিকণ্ঠে পরিবেশন করা হয়ত সম্ভব কিন্তু সমবেত কণ্ঠে কি করা যাবে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এবার ফিরাও মোরে কবিতায় যেখানে বলা হচ্ছে : "অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু। চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু। সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট"। এখানে কিন্তু সমবেত আবৃত্তিতে অনেক বেশী **effect** পাওয়া যাবে যদি ঐ পঙ্ক্তিগুলিকে অনুশীলনলব্ধ পরিশীলিত কণ্ঠস্বরে একক স্বররূপে পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বভাবতই সংশয় ও প্রশ্ন দেখা দেবে। এতো অনুশীলন, সময়, ধৈর্য কি আমাদের এই ব্যস্তসমস্ত যুগে সহজলভ্য হবে? স্বভাবতই অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুখ্যাত সংগীত প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের সমবেত-সংগীতে যেমন বেশ কিছু বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় বা যাচ্ছে তেমনি সাম্প্রতিককালের অনেক আবৃত্তি সংস্থার সমবেত আবৃত্তিতেও উচ্চকিত একক স্বর হয়ে ওঠার পথে বাধাস্বরূপ নানান ত্রুটী পরিলক্ষিত করা যায়। একটা আপাত সহজ রাস্তা অবশ্য অনেকেই গ্রহণ করেছেন এবং তা হলো হারমোনাইজেশন, যে পদ্ধতি অতীতে গ্রীক নাটকের কোরাসে কিম্বা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে ব্যবহৃত হোত। কিন্তু সব কবিতা তো হারমোনাইজ করা যায় না। ধরা যাক সত্যেন দত্তের 'দূরের পাল্লা' কবিতা। এর কয়েকটি লাইন সমবেত আবৃত্তির পক্ষে খুবই উপযোগী। যেমন :

ছিপখান্ তিন দাঁড়— তিন্‌জন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর ছায় দূর পাল্লা।
চুপচাপ এই ডুব ছায় পান-কৌটি,
ছায় ডুব টুপটুপ ঘোমটার বউটি।

—এই পঙ্‌ক্তিগুলি হারমোনাইজ করলে যে এফেক্‌ট পাওয়া যাবে তার চেয়ে অনেক বেশী এফেক্‌ট মিলবে যদি ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তি ভিন্ন গলায় ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায়। আবার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক কাব্যের একটি কবিতায় যেখানে বলা হচ্ছে :

"অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে
দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি
খুন হয়ে যায় সাদা সাদা ফেনা
ঘুমভাঙা দলবদ্ধ ঢেউয়ের
ক্ষুরধার তলোয়ারে।
বনেজঙ্গলে ঝটপট করে
প্রতিহিংসার পাখা...... ।"

—এই পঙ্‌ক্তিগুলি কিন্তু জোরালো সমবেতকণ্ঠে বক্তব্যধর্মী প্রতিস্পর্ধী কিম্বা প্রতিবাদের বা সঙ্কল্পের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে পারলে শ্রোতাদের সত্যিসত্যিই উদ্দীপ্ত করে তোলা যাবে। বলা বাহুল্য একক আবৃত্তির ক্ষেত্রে শব্দের মুখ্য ব্যঞ্জনা প্রকাশের কারুকাজের চেয়ে সোজাসুজি শ্রোতার দিকে নিক্ষিপ্ত করার ব্যাপারটাই এখানে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়, নচেৎ ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশের অতি আগ্রহে এ জাতীয় প্রতিবাদী কবিতায় অর্থহানি ঘটে যেতে পারে। মন্ত্রের মতো মন্ত্রিত হয়ে শ্রোতাদের আলোড়িত করানোটাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কাজে, আবার বলছি, কর্ণধারের নির্দেশমত সমবেত কণ্ঠগুলির প্রত্যেকের সুশৃঙ্খল অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই যা হবে সার্থকতাবাহী। আবার, একক কণ্ঠের চেয়ে সমবেতকণ্ঠে (শিশুদের দ্বারা) যদি অন্নদাশংকর রায়ের ছড়ার পঙ্‌ক্তিগুলি—

তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো
তারবেলা ...... ইত্যাদি

আবৃত্তি করা হয় তবে আমি মনে করি অনেক বেশী কার্যকরী হবে। ইদানীং সমবেত আবৃত্তি নিয়ে বহুবিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে এবং বলাই বাহুল্য, তা শেষ পর্যন্ত বোধহয় শুভকর হবে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীমূলক কবিতা 'দেবতার গ্রাস', 'হোরি-খেলা' কিম্বা 'শিশুতীর্থ'; বিষ্ণু দের 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ', রাম বসুর 'পরান মাঝি ডাক দিয়েছে', এমন কি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার সমবেতকণ্ঠে প্রয়োগপরীক্ষা করা যেতে পারে বলে আমার মনে হয়।

পাঠকপাঠিকাদের কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য কয়েকটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি যেগুলি দ্বৈত বা সমবেত আবৃত্তির জন্য পরীক্ষা করা যেতে পারে। যেমন—

(১) মুক্তি যুদ্ধের পর বাঙলাদেশে যখন গঠমানতার জন্য নতুন চেতনার সঞ্চার হলো সেই অবস্থায় প্রবাসী এক মুক্তিফৌজের জবানীতে লেখা দাউদ হায়দারের কবিতা 'যদি ফেরাও' থেকে :

…তুমি শ্মশানে গিয়েছ কোনদিন—পুড়েছ ?—ভ্যাখো এই আমি
পুড়েছি এবং জল ও আগুনকে একই সঙ্গে ধারণ করে বেঁচে আছি
—তাহলে এবার আমি হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে এনে বলতে পারি,
বাংলাদেশ আমার জনক।
লোকশ্রুত নাগরিক আমি নই, তবু আত্মার অধিক মৃত্যুকে ঘেঁটে দেখি
রক্ত, প্রেম, যুদ্ধ, বন্যা, মহামারী সবই প্রসন্ন গেরুয়া রঙে
এই আমারি অণুতে পরমাণুতে
কনকলতার মতো তীব্র জড়িয়ে আছে।
আমাকে ফিরতে বলো, কিন্তু মনে রেখো
আমার নির্মাণ এবং অবস্থান কুমারীর স্তনের মতো
গম্ভীর এবং অটল। অবশ্য যদি ভাবো, 'আমার, আমার ব'লে
কিছু নেই', তবে কুরুক্ষেত্রে আমি একাই কৃষ্ণ এবং অর্জুন।
যে তোমার স্বজন তাকে তুমি অন্তরীক্ষে পাঠাও, দেখবে
প্রত্যেকটি মানচিত্রে এই আমারি অবস্থান।

যদি আমাকে দৃশ্যাবলী থেকে চোখ ফিরাতে বলো, জেনে রেখো
আমার হাতে সেই মারণাস্ত্র আছে, যা ঈশ্বরপাটনীর কাছে—
অবশ্যই অপরাহ্নকাল !

যদি ফেরাও আমি আবার ফিরে যাবো ; তখন দূরের আকাশ
আবার সূর্যত্ব প্রাপ্ত হবে, আবার পাখিদের গান উঠবে রণিয়ে, আবার
স্বজাতি চিনবে আমাকে, আমার বাংলাদেশ।

(২) সাম্রাজ্যবাদী শয়তানীর বিরুদ্ধে আফ্রিকার কালো মানুষদের সংগ্রামে হাজারো শহীদের মধ্যে প্যাট্রিস লুমুম্বা একটি উজ্জ্বল নাম। নিহত লুমুম্বাকে মনে রেখে এপারবাংলার চিরপ্রতিবাদী কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন সনেট—'আফ্রিকা' :

রক্তাক্ত শিশুর দেহ লুফে নেবে রাক্ষসী গ্রহণ
নিষ্পাপ পিতার কণ্ঠে স্তব্ধ হবে বীভৎস গোঙানি
যে মাটিতে কান পাতবো, শুনবো নরকের কানাকানি

পশুর থাবায় নষ্ট প্রেম হাঁটবে প্রেতের মতন
আমাদের হৃৎপিণ্ডে : ভ্রষ্ট চাঁদ-সূর্যের বসন
ত্রিভুবন বিষ করবে, কেঁদে উঠবে বেশ্যা ও জননী।

সব ছবি মনে আছে : পূতিগন্ধময় বেইমানী!
ঘৃণায় সর্বাঙ্গ পাপ, স্মৃতি পাপ, জীবনধারণ
ভয়ঙ্কর অপরাধ! জায়া-পুত্র-জন্মভূমি পণ—
চোখে ভাসছে পাশাখেলা, গৃহযুদ্ধ; একফোঁটা আমানি
কোথাও ক্ষুধার জন্য থাকবে না।···সব দৃশ্য জানি;
ভ্রাতৃহন্তা দানবেরা উপড়ে নেবে তৃতীয় নয়ন!

আফ্রিকা! সমস্ত জেনে তোমার প্রলয় বুকে টানি—
মৃত্যু পরিত্যক্ত ক্রোধ, মৃত্যু আজ মন্ত্র-উচ্চারণ!

(৩) বাঙলাদেশের প্রথম সারির কবি শ্রীনির্মলেন্দু গুণ-এর 'আনন্দকুসুম' কাব্যের 'তামসকাহিনী' কবিতা থেকে :

এই পৃথিবীর নিরিবিলিগুলি
পদতলে মাখা শেষ ধূলিগুলি
আজ বুঝি এই তাপসকবির
কিছুটা হইল চেনা,
সবুজপাতার আড়ালে যে পাখি
প্রাণের শাখায় উঠেছিল ডাকি
আজ বুঝি তার একটি পালক
লভিল বনের রাখাল বালক
একটি চুমোয় শোধ হল আজ
হাজার চুমোর দেনা।

একে যদি বলি মুখবন্ধন
অন্তিম তবে হবে কোন্ ধন?
ভাবে বিমোহনে সলিলে ভাসিয়া
আমার সকল সর্বনাশিয়া
কে যোগাবে ক্রুর জীবনে আসিয়া
ইন্দ্রিয় ইন্ধন?

এই ধরণীর নিরিবিলিগুলি
যদি না এখনি প্রাণ মন খুলি
তৃপ্তির সুখে জাগে
যদি না এখনি সোনালি হাসিতে
সুচিরকালের তৃষিত বাঁশিতে
ঝিল্লির ধ্বনি লাগে,
মহাপ্রলয়ের এই মহারাতে
সঙ্গীত তবে হবে কার সাথে ?
কার চঞ্চুতে চঞ্চু রাখিয়া
কোন্ অগ্নির ভস্ম মাখিয়া
দেখিব স্পৃহার শেষে
দ্বার হতে দ্বারে আমার বাউল
মাগিয়া ফিরিছে ভিক্ষা চাউল
জাগিয়া নবীন বেশে ?

তুমি দিয়েছিলে অঞ্জু সুষমা
প্রাণের প্রতিমা করিল না ক্ষমা
স্বদেশ আমার শিহরি উঠিল
চৈত্রের চুয়া আপনি লুটিল
তারার কুসুমে যে ফুল ফুটিল
তাহাতে গন্ধভরে
একটি চুমোয় হাজার জীবন
গাঁথলে বাঁধলে করলে সীবন ;
দিশেহারা তরী কূলেতে ভিড়ালে
রূপরসে ভরি ফুলেতে ফিরালে
লেখালে তৃপ্ত তামসকাহিনী
রাত্রির অক্ষরে।

(৪) মধ্যবয়সী প্রগতিশীল কবি হিসাবে শ্রীঅরিন্দম চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে মোটামুটি একটি পরিচিত নাম। ১৯৭৫-এ নজরুলকে মনে রেখে রচিত তাঁর কাল-বোশেখীর কবিতা গ্রন্থের 'অনন্ত আকাশে ধূমকেতু' কবিতা থেকে :

তোমাকে খুঁজি কবি,
অন্ধকারে জংলা জলায়—
ক্ষেতে, আলপথে বন্ধজমিতে মোহানায়।
তোমাকে খুঁজে খুঁজে বাউলপাড়ায় যাই
তীব্র অনন্ত এক
নীলকণ্ঠ জ্বালায়
বিদীর্ণ আমার বুক
বারংবার অন্বেষণ করে
দামাল জীবন—
উল্কার মতন এক উত্তাল যৌবন…
তোমাকে খুঁজি
অনন্ত আকাশে ধূমকেতু…

কারা যে সাজালো তোমায়
কৃত্রিম আলোর মালায়,
অন্তহীন প্রসাদনে
কে তোমায় মাল্যদান করে,
সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চে
হাসিগান কৌতুক ইঙ্গিতে…

নীরবতা শেষ হোক—
কবি,
ফিরে এসো আবার এ বাংলায়—
ঘামে রক্তে—নিজ বাসভূমে পরবাসী এই
রুদ্ধবাক সময়ের মৃতপ্রায় শরীরে ও মনে
উল্কার মতন হানো—রণহুঙ্কার…

তোমাকে খুঁজি কবি,
আলপথে, ক্ষেতে—
অন্ধকারে জংলা জলায়…

(৫) পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল প্রবীণ কবিদের অন্যতম হলেন শ্রীমণীন্দ্র রায়। তাঁর লেখা 'মুখদেখি কাঁসের আলোতে' কবিতা :

শস্ত প্রতীক্ষায় থাকে,
বোবাবীজ পাথুরে চাতালে
নিষ্ফলা ; মাটিকে আমি
কোপাই, লাঙলে বিঁধি
জল ঢেলে কাদা ছানি,
রোদ্দুরে ওল্টাই ; দিনে দিনে
বদলায় নিঃশব্দ গূঢ় গবেষণাগারে
জড়ের চেতনা ; ক্রমে
মাটি কথা বলে ;
ভরে মাঠ শ্রমের ফসলে।

আমি মাঠ ছেড়ে যাব আকাশে ; উধাও
ওড়ে এরোপ্লেন ; ভেবে ছাখো
গতির শিরায় তার কেমন গণিত ;
দ্রুত প্রপেলারে, পাখা, পুচ্ছ-তাড়নায়
বেতারে রেডারে শত জটিল আলোর
সুইচের লাল-নীল বোতামের চোখে
ঝড়ের ঝাপটে, হাওয়া, শূন্যের থাবায়
সে আমার কালজয় তৃষা—
তৃপ্ত করে আমারই মনীষা।

হে আমার অধ্যুষিত দেশ !
মাটি ও নদীতে তুমি,
বৃক্ষে তুমি, শস্যে ও সেবায় ;
তুমি আছ যন্ত্রে বাষ্পে বিদ্যুতে খনিতে,
গন্‌গন্‌ বয়লারে তুমি, কর্মের চাকায়—
তবুও তোমাকে আমি পাইনা কেন-যে ?
আছি কার খোঁজে ?

সে কি—তুমি মাঠ নও, গাছ নও,
নও জলধারা ?
নও শুধু অন্ন, নও কেবলি নির্মাণ ?

যন্ত্রের পিছনে মন, লাঙলের পিছে
মানুষ, মানুষ তুমি, চেতনা, হৃদয়।
তুমি স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ ইতিহাস
পাণিপথে, পলাশিতে, ব্যারাকপুরের
তোপের আগুনে, ক্রোধে, আর যুগে যুগে
ঘর বাঁধা, বুকে টানা, পথে পথে হাঁটা
ঢেউয়ের উত্থান আর পতনের মতো
ক্রমাগত, যুগপৎ, সংঘর্ষে সবল
খণ্ড খণ্ড কামনায় সমগ্র ভুবন
ভেঙে গড়ে ধাবমান, হে মানুষী দেশ,
চলন্ত স্বপ্নের ওই দ্রুত খরস্রোতে
মুখ দেখি কীসের আলোতে?

(৬) সাম্প্রতিকালে হুগলি জেলার "সংহতিচেতনা" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীদেবব্রত রায়ের 'এই সময়' শীর্ষক কবিতা। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিককালের গণতন্ত্র-প্রেমী সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার প্রকাশ পাওয়া যাবে কবিতাটিতে। সমবেত আবৃত্তির পক্ষে কবিতাটি বেশ উপযোগী:

এই সময় নাও শপথ
ভুল ভাঙাও
অন্ধ ভয় যাও ভুলে
পথ দেখাও।
ভয় কিসের ভয় তাড়ুয়ার
আঁধার রাতে?
শপথবাঁধা বিশ্বাসী মন
সবার সাথে।
ওপর ভালোর কুটিল কালোর
মুখোস খোলো।
হাত বাড়িয়ে সোনার আলোর
আগল তোলো।
ওদের কাছে তোতার বুলি
জীর্ণ আওয়াজ।
তোমার কাছে প্রাণের কথা
শুনবো আজ।

থাটির চেয়ে অনেক খাটি
তোমার মন।
এনে দেবে শান্তিটুকু
কি নেবে পণ?
কথা দিলাম টলব না আর
বেইমানি নয়,
ঝড়ের বুকে উড়িয়ে দেব
মিথ্যা ভয়।
সকাল সাঁঝের মিথ্যা আপস
লোভের সাথে,
চূর্ণ কর জোয়াল তুমি
তোমার হাতে।
তুফান ঐ থাকবে না আর
রাত পোহালে
হিসাব ছাড় অতীত দিনের
কি হারালে।
তোমার কাছে অমূল্য ধন
হারায়ো না
মনের মুক্ত শপথ মন্ত্র
খোয়ায়ো না।
দেখছি ঐ সূর্যতিলক
তোমার ভালে।
নেই দেরি পাবই দিশা
রাত পোহালে।

এবার মূল আলোচনায় ফেরা যাক। সমবেত আবৃত্তি প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন স্বভাবই উঠতে পারে (বলা ভাল, উঠেছে) এবং তা হলো সমবেত আবৃত্তিতে আবহসঙ্গীত, শব্দসংযোজন (নেপথ্য থেকে), আলোকসম্পাত ইত্যাদির সহযোগী প্রয়োগ কি কাঙ্ক্ষিত? উত্তরে বলা যায়—বিশেষ আলোকসম্পাত মনে হয়, সম্পূর্ণভাবেই অপ্রয়োজনীয় এবং আবহসঙ্গীত ও শব্দ-সংযোজনের বিষয়গুলি না রাখলেই বোধহয় ভাল হয়। অবশ্য ইদানীংকালে, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠিত আবৃত্তিকার একক

আবৃত্তিতেও এই সব বিষয় অনুসঙ্গরূপে গ্রহণ করছেন। মূলরসের হানি না ঘটিয়ে এই সব করে যদি আবৃত্তিকে অধিকতর জনপ্রিয় করা যায় বা করার চেষ্টা করা হয় তাহলে হয়তো তর্কটা জমবে না। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, কি একক কি সমবেত (বা দ্বৈত) সব রকমের আবৃত্তিতেই আবৃত্তিকারের কাছে যা আশা করা হয় তা হচ্ছে বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্য, কণ্ঠস্বরের সুকৌশলী উত্থানপতন ও শব্দের উচ্চারণে বিশেষ ধরনের ঝোঁক এবং সর্বোপরি সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গিতে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব আরোপ করে তিনি বা তাঁরা কাঙ্ক্ষিত ফলশ্রুতি শ্রোতাকে বা শ্রোতাদের উপহার দিতে পারেন, দেওয়া সম্ভব। শম্ভু মিত্রের 'মধুবংশীর গলি' বা প্রদীপ ঘোষের 'কামালপাশা'র ঐতিহাসিক সার্থকতা তো আঙ্গিক সহযোগিতা ব্যতিরেকেই সম্ভবপর হয়েছিল।

পরিশেষ বক্তব্য হিসাবে উল্লেখ্য, গণশিল্পরূপে আবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এককের চেয়ে দ্বৈত বা সমবেত আবৃত্তি অধিকতর সার্থকতাবাহী হবে বলে মনে হয়।

॥ চতুর্থ ভাগ : আবৃত্তি সংশ্লিষ্ট বাকশিল্পের অন্যান্য প্রয়োগশিল্প ॥

(কাব্যনাটকপাঠ, নাটকপাঠ, শ্রুতিনাট্য, অভিনয়—মঞ্চ-বেতার-দূরদর্শন-চলচ্চিত্র-রেকর্ড ইত্যাদিতে এবং সংবাদপাঠ, কথিকাপাঠ, ধারাভাষ্যপাঠ) **সম্পর্কে কিছু বক্তব্য।**

কাব্যনাটকপাঠ বা অভিনয়।

শুরু করা যাক বিশিষ্ট ইংরেজ কবি ও সমালোচক টি. এস. এলিয়টের বক্তব্য দিয়ে (বাংলা ভাবানুবাদ শ্রীস্নেহাশিষ সুর, বাল্মীকি স্মরণ পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৪। ইংলণ্ডের ন্যাশনাল বুক লীগের একাদশতম বার্ষিক বক্তৃতায় ১৯৫৩ সালে এলিয়ট যে বক্তৃতা দেন এবং পরে যা কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়, শ্রীসুর তারই কিয়দংশ বাংলায় ভাবানুবাদ করেন)।

এলিয়ট বলছেন—"কবিতার প্রথম মাত্রা হলো কবিতার মাধ্যমে কবির নিজের সঙ্গে কথা বলা অথবা কারুর সঙ্গেই নয়। দ্বিতীয় মাত্রা হলো ছোটো বা বড়ো কোনো শ্রোতৃমণ্ডলীকে কবিতার মাধ্যমে কিছু বলা। আর তৃতীয় মাত্রা হলো যখন কবি কোনো নাটকীয় চরিত্র তৈরী করতে চান যারা কথা বলবে কবিতায়, যে কথা কবির নিজের কথা নয়,…কাব্যনাট্যের সংলাপ হলো তৃতীয় মাত্রার কবিতা। একটা কাব্য-নাট্যের অনেক চরিত্রের মুখে কথা যোগাতে হয় যাদের সংস্কৃতিগতভাবে একের সঙ্গে অপরের অনেক তফাৎ। এই বিশালসংখ্যক চরিত্রের সঙ্গে কবির মিশে যাওয়া সম্ভব নয় অথবা সকলকে একই ধরনের কিম্বা সকলকে বা একজনকে সব কবিতাই দেওয়া যায় না। এই কবিতা ভাগ করা আবার ভীষণভাবে চরিত্রানুগ হওয়া প্রয়োজন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে চরিত্ররা কিন্তু কবির মুখপত্র নয়, তারা তাদের চরিত্রেরই রূপকার। সুতরাং চরিত্রের তারতম্যের কথা বিবেচনা ক'রে কবির কিছু সীমারেখা থেকে যায় কাব্যনাট্যের সংলাপ প্রসঙ্গে। সংলাপের কবিতাগুলোকে আবার নাটকের পট-পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। আবার, কোনো কবিতা শুধু চরিত্রানুগ হ'লেই হয় না তাৎক্ষণিক এ্যাক্‌শনের সঙ্গেও মিলতে হয়।

"এই তৃতীয় মাত্রার কবিতা বা নাটকের সংলাপের কবিতার বৈশিষ্ট্য তখনই বেশি ক'রে ধরা পড়ে যখন কোনো সাধারণ কবিতা যেখানে নাটকীয়তা আছে তার সঙ্গে এই নাটকের কবিতার তুলনা করা যায়।…

আমি বলতে চাইছি (হয়তো পাঠকেরা এও ভাবতে শুরু করেছেন যে, প্রথম মাত্রার মতো আমিও বোধহয় নিজের সঙ্গেই কথা বলছি, কিন্তু তা নয়, আমি

পাঠকদেরই বলছি) যে এই তিনটি মাত্রার বিষয়টা পাঠকেরা নিজেরাই বিচার করবেন কোনো কবিতা পড়ার অথবা কাব্যনাট্য দেখার সময়।..."

এলিয়টের বক্তব্য থেকে কাব্যনাট্যরচনার রীতিনীতি প্রসঙ্গে কিছু জানা গেল। এবার আসা যাক প্রয়োগের ব্যাপারে। প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার কাব্যনাট্য আসলে নাটক এবং তার সংলাপগুলি হলো কবিতায়। সুতরাং এখানে অভিনেতাই প্রধান, সুতরাং অভিনয় করার জন্য যে নাটকীয় আবেগ দরকার তা পুরোপুরি বজায় রাখতে হবে, তবে সে আবেগ সংযমে বাঁধা থাকবে কবিতার ছন্দের কিম্বা ছেদ বা যতির বন্ধনে। গদ্যসংলাপের থেকে পদ্যসংলাপ উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যই শিল্পীর পক্ষে সবচেয়ে বেশি মনে রাখার দরকার। প্রশ্ন উঠতে পারে কাব্য-নাট্য প্রযোজনায় আবহসঙ্গীত, শব্দসংযোজন, দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাতের প্রয়োজনীয়তা কতখানি? কাব্যনাট্যের অভিনয় প্রয়োগের ক্ষেত্রে, মঞ্চনাটকের মতো—আমার মনে হয় আবহসঙ্গীত, শব্দসংযোজন, দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাতের সহযোগিতা গ্রহণ কোনো দোষের নয়, এবং এই সমস্ত আঙ্গিক সহায়তায় মঞ্চনাটকের মতো কাব্যনাট্যও অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। তবে ব্যাপারটা পাঁঠার ইচ্ছেয় কালীপুজো যেন না হয়ে ওঠে অর্থাৎ সংগৎ যেন গানকে ছাপিয়ে না যায়। আর কাব্য-নাট্যপাঠের ক্ষেত্রে এই সব আঙ্গিক সহযোগিতা না নিলেই বোধ হয় শ্রোতাদের কাছে অনেক অন্তরঙ্গভাবে পাঠের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা সম্ভব। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রে অভিনয়টা শুধুমাত্র সঠিক বলেই গ্রাহ্য হবে।

বঙ্গসাহিত্যসংস্কৃতির আরো অনেক শিল্পশাখার মতো কাব্যনাট্যের সার্থক রচনা ও প্রয়োগের পথিকৃৎ-এর সম্মানও রবীন্দ্রনাথের। 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'বিদায় অভিশাপ' প্রভৃতি সার্থক কাব্যনাট্যের রচয়িতা ও প্রয়োগকর্তা তিনি। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন বাঙালী কবি কাব্যনাট্যরচনাকে (প্রয়োগচর্চাও বটে) সমৃদ্ধ করেছেন যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বুদ্ধদেব বসু, বনফুল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, নীরেন চক্রবর্তী, রাম বসু প্রমুখ। ষাটের দশকের মাঝামঝি সময়ে কাব্যনাট্যের প্রযোজনা শুরু হয় কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে। প্রথমদিকের প্রযোজনাগুলিতে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কবি রাম বসু এবং আরো অনেকে অংশগ্রহণ করেন, বর্তমান নিবন্ধকারও ২।৩টি অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগলাভ করেছিলেন। এ সময়ে কলকাতা ও শহরতলীর ছোটো-বড়ো মঞ্চে এবং সাহিত্য ও কাব্যপাঠের আসরেও কাব্যনাট্যচর্চার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। পরবর্তীকালে বেতার-কর্তৃপক্ষ, যে কোনো কারণেই হোক, কাব্যনাট্য প্রযোজনা-প্রয়াস বন্ধ করে দেন।

নাটকপাঠ। নাটক বা নাটকাংশ পাঠের রেওয়াজে আমাদের ঐতিহ্য প্রায় দেড়শো বছরের। মধুসূদনের সময় থেকেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের ঘরোয়া আসরে নতুন নাটক পাঠের রেওয়াজের কথা সমসাময়িক ইতিহাস থেকেই জানা যায়। ইদানীংকালে নাট্যাংশপাঠের চল্ অনেক বেশী দেখা যাচ্ছে নানান সাংস্কৃতিক মঞ্চে। নাটককে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকাররা বলেছেন দৃশ্যকাব্য। সুতরাং মুখ্যত দৃশ্য হলেও নাটকের উপযুক্ত পাঠমূল্যও কম নয়। কাব্যনাট্যপাঠের আলোচনায় যে কথাগুলি বলা হয়েছে আমার মনে হয় নাটক বা নাট্যাংশ পাঠের ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রযোজ্য।

শ্রুতিনাট্য। সাম্প্রতিককালে আর একটি প্রয়োগশিল্প নবকলেবরে যথেষ্ট জনপ্রিয় হতে চাইছে এবং তা হলো শ্রুতিনাট্য। কিন্তু একথা বলাই বাহুল্য যে, শ্রুতিনাট্য বেতার-কেন্দ্রের স্টুডিওর বাইরে বেতারনাট্যেরই যাকে বলে কমার্সিয়ালাইজড্ এ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগকৌশল। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের প্রারম্ভে রেডিও ব্রডকাস্টীং কর্পোরেশনের সময় থেকেই বাংলা বেতারনাট্যের প্রচলন হয়। একে জনপ্রিয় করে তুলতে অসাধারণ অবদান রাখেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং প্রয়াত বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য) ও শ্রীধর ভট্টাচার্য। তখন ১নং গার্স্টিং প্লেসে বেতার কেন্দ্রের স্টুডিও থেকে ডাইরেক্ট ব্রডকাস্ট বা সরাসরি নাট্যাভিনয় সম্প্রচারিত হোত। ষাটের দশকে ইডেন গার্ডেন্সে বেতারকেন্দ্র চলে আসার পর সরাসরি সম্প্রচারণ বন্ধ হয়ে যায়, এইসময় থেকে টেপরেকর্ড করা নাট্যানুষ্ঠানকে সম্পাদনা করে পুনঃ সম্প্রচারণের ব্যবস্থা হয়। বেতারকেন্দ্রের বাইরে মঞ্চোপরি পূর্বতন ডাইরেক্ট, ব্রডকাস্ট পদ্ধতিরই প্রকৃতপক্ষে নতুন নামকরণ হয়েছে শ্রুতিনাট্য। সুতরাং শ্রুতিনাট্য সম্পর্কে প্রথম কথাই হলো নামকরণ অনুযায়ী এটি যখন শ্রব্য তখন মঞ্চোপরি কিভাবে দৃশ্যরূপে হাজির হয়? দ্বিতীয়ত নাটকপাঠ ব্যাপারটা অন্য হলেও নাট্য ব্যাপারটা তো মুখ্যত দৃশ্য, গৌণত শ্রব্য ["দৃশ্যম্ তত্রাভিনেয়ম্"—সাহিত্যদর্পণ। "সোঽঙ্গাদ্যভিনয়োপেতঃ নাট্যমিত্যভিধীয়তে"—অভিনয়দর্পণ। **"Spectacular equipment will be a part of tragredy"—Aristotle**]। তবে মঞ্চনাটকে দৃশ্য ছাড়াও অবশ্যই কিছু শ্রব্যগুণ থাকে। যেমন—কণ্ঠসঙ্গীত, বাচিক অভিনয়, বাদ্যসঙ্গীত, শব্দ-প্রক্ষেপণ ইত্যাদি। তবে নাট্য (মঞ্চে উপস্থাপিত) কখনই যে প্রধানত শ্রব্য নয় এটা সর্বজনস্বীকৃত।

তৃতীয়ত, যথার্থ শ্রুতিনাটক রেকর্ড-নাটক এবং বেতার-নাটককেই বলা যায়। কেননা সেখানে শ্রুতির মাধ্যমেই নাটকের সামগ্রিক রস উপভোগ্য। বেতার নাটক বা যথার্থ শ্রুতিনাটকের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো দৃশ্যনাটকের মতো এটি স্থানের

নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, তাছাড়া দৃশ্যনাটকের সীমাবদ্ধতা (দর্শকের সংখ্যানুসারে) আছে কিন্তু শ্রুতিনাটকে শ্রোতার সংখ্যাধিক্য ঘটার ফলে ব্যাপক, দূরতম ও দরিদ্রতম জনসমষ্টির মধ্যে তা ব্যাপৃত হয়। সুতরাং, বর্তমান শ্রুতিনাট্য বা শ্রুতিনাটক বলে যা চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তাকে নাট্যপাঠ, নাট্যাংশপাঠ, কাব্যনাট্যপাঠ ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত। যেখানে চরিত্রগুলি দর্শকদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে অভিনয় করছে তাকে শ্রুতিনাট্য বলব কোন যুক্তিতে?

অতএব, নামকরণে গোড়ায় গলদ থাকা সত্ত্বেও এটা পশ্চিমবঙ্গের এখানে সেখানে কি করে যে চলছে এবং বাঙালী রসজ্ঞ মানুষ কি করে এটা মেনে নিচ্ছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। পশ্চিমবঙ্গের শ্রীশম্ভু মিত্র, শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র এবং আরো অনেক প্রবীণ নবীন শিল্পী এবং বুধমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনা করে আমার বক্তব্যের সমর্থন পেয়েছি। এমনকি বাঙলাদেশে ড. হায়াৎ মামুদ, ড. আহমদ শরীফ ও অন্যান্য বিদগ্ধজনদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরাও এটা কিছুতেই মানতে রাজি নন। জনপ্রিয়তার কথা স্মরণে রেখে উপযুক্ত নামকরণসহ নতুন প্রয়োগশিল্পটির পরীক্ষা অবশ্য চলতে পারে।

অভিনয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বাচিক অভিনয়। নিছক বাচিক অভিনয় হয় বেতারনাটকে এবং ডিস্ক-নাটকে। সাউণ্ডপ্রুফ স্টুডিও, শক্তিশালী মাইক্রোফোন ইত্যাদি যান্ত্রিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য এই অভিনয়ে অবশ্য প্রয়োজন। এছাড়া বাচিক অভিনয়ের ক্ষেত্রে শিল্পীদের স্বরপ্রক্ষেপণগত বিশেষ কয়েকটি মাত্রাবোধ আয়ত্ত করতে হয় যেগুলি ঠিক লিখিতভাবে বলা বোধহয় সম্ভব নয়। তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিনয়ে উচ্চারণশুদ্ধি, অর্থকরী ও ব্যঞ্জনাধর্মী স্বরপ্রক্ষেপণ কৌশল, সংযত আবেগ-সমৃদ্ধ কণ্ঠস্বর-এর ব্যবহারজ্ঞান খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। মঞ্চ-দূরদর্শন-চলচ্চিত্র অভিনয়ে বাক্‌শিল্পের আংশিক প্রয়োগনৈপুণ্য প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু তদুপরি কায়িক ও মানসিক অভিনয় এবং রূপসজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদগত অন্যান্য উপকরণগুলিরও প্রয়োজন থাকে।

সংবাদ ও কথিকাপাঠ। নিরাবেগ কণ্ঠে সুস্পষ্ট অর্থকরী উচ্চারণের মাধ্যমেই সংবাদপাঠ ও কথিকাপাঠ করা বিধেয়। যদিও উভয়ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে কথিকাপাঠের সময় অধিকাংশ শিল্পীই আবেগতাড়িত কণ্ঠের প্রয়োগ করে থাকেন। সংবাদপাঠ মুখ্যত বেতারে এবং দূরদর্শনে হয়ে থাকে। দূরদর্শনে পাঠক বা পাঠিকা দৃশ্য হলেও

বেতারসংবাদপাঠে তাঁরা অদৃশ্যই থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলা সংবাদপাঠে কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড আজ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। বোধহয় সকলেই স্বীকার করবেন যে এক সময়ে (৩০/৩৫ বছর পূর্বে) বেতার সংবাদপাঠে বেশ কয়েকজন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন—যে ধারা এখনও কেউ কেউ রক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এমন অনেকেই আছেন যাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হওয়া বোধহয় অসমীচীন না, উচ্চারণ অশুদ্ধি এবং যাকে বলে বাক্যের টেল-ড্রপিং বা শেষাংশের উচ্চারণ নেমে যাওয়ার দোষ খুবই শ্রুতিপীড়াকর হয়। জানি না, সংবাদপাঠক-নিয়োগের ক্ষেত্রে ইদানিং যোগ্যতার পরীক্ষা কিভাবে করা হয়। জয়ন্ত চৌধুরীর কাছে শুনেছিলাম এবং পরবর্তীকালে শ্রীপ্রদীপ ঘোষ, শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের লেখা পড়ে জেনেছি যে, বি. বি. সি-তে ১৯২৭ সাল থেকেই এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়াস প্রচেষ্টা শুরু হয়—যার দ্বারা অশুদ্ধ উচ্চারণ, উচ্চারণ-বৈষম্যের কর্ণপীড়া থেকে শ্রোতাদের রেহাই দেওয়ার জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চারণ-বিধি প্রণয়ন করা হয়, প্রকাশিত হয় ব্রডকাস্ট ইংলিশ নামে পুস্তিকা। এই পুস্তিকাটি তারপর থেকে বেশ কয়েক বৎসর অন্তর পুর্নসংশোধিত হয়ে চলেছে। এই কাজে জি. বি. এস-কে সভাপতি করে বৃটেনের বেশ কয়েকজন খ্যাতকীর্তি বিশেষজ্ঞকে নিয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিই সব কিছু ঠিক করেছেন আজ থেকে প্রায় ৫০ বৎসর আগে। বৃটিশ এ্যাকাদেমি, রয়াল একাডেমি অফ্ ড্রামাটিক আর্ট, ইংলিশ এ্যাসোসিয়েশন, রয়াল সোসাইটি অফ্ লিটারেচর প্রমুখ বিদ্বৎসভার প্রতিনিধিরা যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে এখনো পযন্ত বি. বি. সি-র স্ট্যাণ্ডাড ইংলিশ-এর কাজ সুসম্পন্ন করে চলেছেন। আর এরই পাশাপাশি আমাদের দেশে কি শোচনীয় অবস্থা! বেতারের (এবং দুরদর্শনের) সংবাদপাঠকদের উচ্চারণে সমতা আনয়নের কোনো চেষ্টাই আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি, ফলে এক এক সংবাদপাঠক এক এক রকম উচ্চারণ করে চলেছেন, ঘোষকদের মুখেও এই বিভ্রান্তি অহরহ ঘটে চলেছে—কেউ বলছেন 'লোক-গীতি', কেউ আবার বলছেন 'লোকোগীতি'; কারো মুখে 'অ-প্রীতিকর' এবং অন্য একজনের উচ্চারণে তা হচ্ছে 'অপ্-প্রীতিকর' ইত্যাদি।

একই বিভ্রান্তি শুধু বেতার-এ নয়, বিভিন্ন মঞ্চের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অহরহ দেখা যাচ্ছে। এমন কি কথিকাপাঠের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের উচ্চারণ-দোষ ছাড়াও আবেগতাড়িত কণ্ঠস্বরের দাপটে অধিকাংশ গীতি-আলেখ্য বা নৃত্য-আলেখ্যের অনুষ্ঠানগুলি দূষণীয় হচ্ছে। বলাই বাহুল্য, এই গড্ডালিকা-প্রবাহতরঙ্গ রোধ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে আমরা যত দেরী করব ততই আরো নতুন নতুন বিভ্রান্তির জগঝম্প সৃষ্টি হবে। সংবেদনশীল শ্রোতারা যতই মর্মপীড়া অনুভব করুন

না কেন, সংস্কৃতির পদ্মবনে মত্ত-হস্তির এ জাতীয় দাপাদাপি বন্ধের দায়িত্ব বেতার কর্তৃপক্ষ যতদিন না গ্রহণ করছেন ততদিন এ যন্ত্রণাভোগের অবসান হবে না।

বি.বি.সি-তে স্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চারণের সম্বন্ধে আবৃত্তিকার শ্রীপ্রদীপ ঘোষের একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁরই জবানীতে উদ্ধৃত করা যাক: "আমরা তো বলি অমুক বাবু সফরে এসেছেন। তো, বি.বি.সি-তে আমাকে বলা হলো—মিস্টার ঘোষ, আপনি কিছু মনে করবেন না, এখানে আপনাকে 'সফর' কথাটি দয়া করে 'স(s)ফর' উচ্চারণ করতে হবে। আপনার ব্যক্তিগত ইন্টারভ্যুতে অবশ্য আপনি আপনার ইচ্ছে মতো উচ্চারণ করতে পারেন কিন্তু আমাদের সংবাদ-বুলেটিনে আপনি দয়া করে স(s)ফর বলবেন, শ(sh)ফর নয়।"

বলাই বাহুল্য আমাদের বেতার কর্তৃপক্ষ যে ব্যাপারটা জানেন না তা নয়, কিন্তু জেনেও তাঁরা এখনো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিকারে তৎপর নন, এটাই বাস্তব ঘটনা। আর বাংলাভাষায় মুখ্যত এই উচ্চারণ সমস্যাই সামগ্রিকভাবে বাক্‌শিল্পের সমস্যারূপে আজও রয়ে যাচ্ছে।

ধারাভাষ্য পাঠ। যতদূর জানি ধারাভাষ্যপাঠের সূচনাও ঘটিয়েছেন কলকাতা বেতার কেন্দ্র। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি খেলার ধারাভাষ্যের ব্যবস্থা স্বাধীন ভারতে পাঁচের দশক থেকেই শুরু হয়। এমন কি দুর্গাপূজার বিসর্জনের ধারাভাষ্যদানে স্বনামধন্য শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এককালে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। চলমান ঘটনার নিজস্ব আবেগ-উত্তেজনাকে ধারাভাষ্যকার নিজকণ্ঠে উচ্চনীচ স্বরক্ষেপণ দ্বারা বাঙ্ময় করে তুলে ঘটনার জীবন্ত চিত্রটি শ্রোতাদের কানের মধ্য দিয়ে মরমে পশিয়ে দেবার প্রচেষ্টা করেন। অন্যান্য দেশের অন্য ভাষায় ধারাভাষ্যদানের মতো বাংলায় ধারাভাষ্য-প্রয়োগরীতি মোটামুটি সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছে, এটা বোধহয় নির্দ্বিধায় বলা যায়।

৩। ভাষাভেদে (ইংরেজি, জার্মান, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি) আবৃত্তির প্রয়োগরূপরীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা:

বাংলা আবৃত্তির প্রয়োগরূপরীতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে সুবিধা-অসুবিধার কথা নিবেদন করেছি। এবার একে একে ইংরেজি, সংস্কৃত, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় আবৃত্তি বা পাঠের রূপরেখা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিবেদন করা যাক।

ইংরেজি। আমরা জানি ইংরেজি স্ট্যাণ্ডার্ড প্রোনাংসিয়েশন সম্পর্কে যথেষ্ট গভীর চিন্তা-প্রসূত নিয়মবিধি বর্তমান আছে। আমরা আরো জানি যে, ইংরেজি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ছেদচিহ্ন ব্যবহারের বিধান আছে। ইংরেজি কবিতার পংক্তি বিশ্লেষণ (স্ক্যানসান্) করারও সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি যে আছে তা যে কোনো

Rhetoric and Prosody-র অনুসন্ধিৎসু অবহিত আছেন। এর ফলে ইংরেজি ভাষার আবৃত্তি করতে হলে আবৃত্তিকারকেও প্রচলিত নিয়মবিধি অবশ্যই মেনে চলতে হয়, যদিও ব্যক্তিগত স্বর, স্বরপ্রক্ষেপণকৌশল, প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবশ্যই থাকে আবৃত্তিকারের। বক্তব্যবিষয়ের-ব্যাখ্যাস্বরূপ তিনটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হলো :

(১) John Milton (1608—1674 A.D.), On His Blindness থেকে—
when I consider how my light is spent
Ere half my days, in this dark world and wide,
And that one talent which is death to hide
Lodged with me unless, though my soul more bent
To serve there with my Maker, and present
My true account, lest He returning chide,—

(২) W. Shakespeare (1564—1616 A.D.), Sonnet No. 115.
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove :
O, no ! it is an everfixed mark,
That looks on tempests and is never shaken ;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth's unknown, although his height be taken.

Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come ;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But hears it out even to the edge of doom.

If this be error, and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.

(৩) P. B. Shelly (1792—1822 A.D.)
We look before and after
And pine for what is not
Our sincenst laughter
With some pain is fraugth
Our sweetest songs are those
That tell of the saddest thought.

বলাই বাহুল্য, উপরে উদ্ধৃত তিনটি নমুনার আবৃত্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য অবশ্যই থাকবে : বৈচিত্র্য শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণে, বৈচিত্র্য ভাবব্যঞ্জনা-পরিস্ফুটনে এবং বৈচিত্র্য বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রকাশভঙ্গির তারতম্যে। যেহেতু পূর্বকথন (ক) অধ্যায়েও এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য নিবেদিত হয়েছে এবং আলোচ্য অধ্যায়েও আমাদের নিবেদিত বক্তব্য হলো ইঙ্গিতধর্মী ও সংক্ষিপ্ত, সেহেতু ইংরেজি আবৃত্তির আলোচনা এখানেই শেষ করা হলো।

জার্মান। আমরা জানি জার্মানভাষা পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা। আমরা আরো জানি, রাজনৈতিক দিক থেকে পূর্ব ও পশ্চিমভাগে জার্মানী বিভক্ত হলেও ভাষাগত দিক থেকে এই বিভাজন উত্তরে ও দক্ষিণে। আর বহুভাষাবিদ মনীষী ডঃ সুনীতিকুমারের জবানিতে বলি—রুশ, জার্মান প্রভৃতি ভাষার যথার্থ উচ্চারণ করতে গেলে 'ষাঁড়ের ডাল্‌না খেতে হবে' অর্থাৎ যাকে আমরা বলি জোরালো ও জোয়ারী বেস্‌-ভয়েজ তা থাকা দরকার। জার্মান ভাষা যাঁরা জানেন তাঁরা অবগত আছেন যে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের একবচন ও বহুবচনে জার্মানভাষার ক্রিয়াপদের রূপের হেরফের ঘটে, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গে তো বটেই। তাছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণ ঠিক ইংরেজি ভাষার মতো নয়। এ-র উচ্চারণ আ, ই-র উচ্চারণ এ, জেড্‌-এর উচ্চারণ এস্‌, এস্‌-এর উচ্চারণ কঠিন জেড্‌-এর মতো এবং ভি-র উচ্চারণ এফ্‌-এর মতো হয়। অনুসন্ধিৎসু আবৃত্তিকারদের সুবিধার্থে দু'টি মাত্র কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে এবং মূল ভাষায় উদ্ধৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রখ্যাত কবি-সঙ্গীতসাধক দিলীপকুমার রায়ের বঙ্গানুবাদও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে :

(১) **Woher sind wir geboren ? Aus Lieb**
Wie waren wir verloren ? Ohn Lieb
Was hilft uns uberwinden ? Die Lieb.
Kann man auch Liebe finden ? Durch Lieb.
Was laszt nict lange weinen ? Die Lieb.
Was soll uns stets vereinen ? Die Lieb. —Goethe.

কার বরে জনমি সদাই ?—প্রেমের মিলনে।
কারে বিনা আপনা হারাই ?—প্রেমের বিহনে।
কার মন্ত্রে বাধা হয় দূর ?—প্রেমের সাধনে।
কোন্‌ সুরে সাধি প্রীতি সুর ?—প্রেমের বন্ধনে।
বেদনাশ্রু কে তূর্ণ মুছায় ?—প্রেমের অভয়।
বুকে বুকে বাসর জাগায় ?—প্রেম পরিচয়।

(২) **Eure Liebe Zum Leben sei Liebe zu eurer hochsten Hoffnung ; und eure hochte Hoffnung sei der hochste Gedanke des. Lebens ! Euren hochsten Gedanken aber sollt ihr ench von mir befehlen lassen und er lantet : "Der Mensch ist etwas das uberwunden werden soll. —Nietzsche.**

অতি মানব

জীবনেরে ভালোবাসো তুমি ?
সেই প্রেম উঠুক কুসুমি'
তোমার নিগূঢ় কামনায়।
সে-অপরাজেয় অভীপ্সায়
উঠুক ঝলকি দীপ্ততম
অনাগত স্বপ্ন নিরুপম।
কান পেতে শোনো—নীলিমার
বিপুল বাঁশরী ওই গায় :
"আপনারে অতিক্রমি' তবে
মানবতা ভবে ধন্য হবে।"

জার্মান কবিতা কিভাবে পড়তে হবে সে সম্পর্কে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিতর্কিত কবি-নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের একটি রচনা থেকে (অধ্যাপক দিলীপ ঘোষ কর্তৃক মূল জার্মান থেকে বঙ্গানুবাদিত এবং ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি.ডি.আর. পত্রিকায় প্রকাশিত "আমার মতে কবিতা কেমন করে পড়া উচিত" শীর্ষক প্রবন্ধ) কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হলো :

…কবিতা সব সময়েই ক্যানারি পাখির কূজনের মত নয়। ঐ পাখির গান সুন্দর, কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। ভেতরের সৌন্দর্যকে বের করে আনার জন্য কবিতাকে কিন্তু থেমে থেমে পড়তে হয়। উদাহরণ হিসাবে আমি উল্লেখ করছি ইয়োহানেস এ্যার বেশারের 'ডয়েচলাণ্ড' গানটির প্রথম স্তবকটির কথা, ওটি আপনারা নিশ্চয়ই হান্স আইস্‌লারের দেওয়া সুরে গেয়েছেন।

স্বদেশ, আমার যন্ত্রণা,
গোধূলিতে ঢাকা,
আকাশ, আমার গাঢ়তর নীল আকাশ,
তুমিই আমার শান্তি।

এর মধ্যে কি আছে যা সুন্দর ?

এই কবি তাঁর স্বদেশকে বলছেন 'গোধূলিতে ঢাকা'। গোধূলি হলো দিন ও রাতের মাঝখানের একটি সময়, অথবা রাত ও দিনের, যখন আলো হারিয়ে যায় অন্ধকারে অথবা অন্ধকার আলোয়। এ হলো সেই ধূসর মুহূর্ত যাকে ফরাসীরা বলেছেন 'Entre chien of loup' যার জার্মান হলো 'Zwischen Hund und Wolf' সেই সময় যখন মানুষ, ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করতে পারে না। এই রকম এক গোধূলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি তাঁর নিজের দেশের ফ্যাসিজম ও অমানুষিকতার অন্ধকার যখন যায়-যায় এবং সমাজবাদের প্রত্যূষ আসন্ন। এই জন্যই কবির কাছে তাঁর স্বদেশ 'স্বদেশ, আমার যন্ত্রণা' এবং একই সঙ্গে 'তুমিই আমার শান্তি'। আর সব সময় তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর স্বদেশের সৌন্দর্য যার কথা রয়েছে তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে ('আকাশ, আমার গাঢ়তর নীল আকাশ') এই সৌন্দর্য অনাহত, এমন কি নেকড়ের রাজত্বেও। এই হলো কবিতাটির মর্মবাণী, এবং এ সুন্দর—কেন না কবির অনুভূতি গভীর ও মহৎ, কেন না কবি তাঁর দেশকে ভালবাসেন যন্ত্রণায়, যখন অশুভের শাসন, এবং সুখে, যখন শুভ প্রতিষ্ঠিত।

এবং যথেষ্ট সৌন্দর্য রয়েছে কবির বলার ভঙ্গীতে। 'স্বদেশ, আমার যন্ত্রণা'—কথাটা এর থেকে ভাল করে বলা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় ভালতর করে বলা—'তুমিই আমার শান্তি'। এ যেন এমন কোনো লোক যে শোকে আক্রান্ত এবং আচ্ছাদিত কালো পোশাকে, সেই লোক যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কেন তার যন্ত্রণা এবং সে উত্তরে বলছে : 'আমার দেশ এখন ঘাতকদের কবলে।' আবার একই সঙ্গে, এ হলো এক উৎফুল্ল এবং সঙ্গীতমুখর মানুষ, উৎফুল্ল ও সঙ্গীতমুখর কেননা আমার দেশ গড়া হয়েছে শান্তি দিয়ে। অর্থাৎ এই মানুষটির মুখ অন্যান্য মানুষের মুখের ওপর নির্ভরশীল। 'শান্তি' শব্দটি বিশেষভাবে সুন্দর। অতি পরিচিত এই কথা, তবু এতে রয়েছে এক নতুনত্বের ছাপ কেননা এমনি করে এই কথাটা আগে কেউ কোনোদিন ব্যবহার করেনি। 'আকাশ, আমার গাঢ়তর নীল আকাশ'-ও সুন্দর। কেননা এ উচ্চারিত এক আশ্চর্য নম্রতায়। কবির প্রয়োজন শুধু 'নীল' কথাটার (আর যেই ব্যবহৃত হলো কথাটি) অমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশ। এবং ভারী সুন্দর কবিতাটির ছন্দ, তাতে রয়েছে এক বিশাল তৃপ্তির প্রতিভাস।

সংস্কৃত। পূর্বকথন—ক অধ্যায়ে আমরা ইতিপূর্বে বৈদিক স্তোত্র এবং অন্যান্য সংস্কৃত কবিতার উচ্চারণবিধির ভিন্নতা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছি। সুতরাং প্রসঙ্গত সংস্কৃত আবৃত্তির রূপরীতি সম্পর্কেও সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য নিবেদন করা হচ্ছে। প্রথম কথা : হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ অতি অবশ্যই শুদ্ধভাবে মেনে চলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, স, শ, ষ এবং ন ও ণ-র উচ্চারণ-স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। তৃতীয়ত, সংস্কৃত-আবৃত্তিতে কণ্ঠস্বরে, স্বরপরিবর্তনে ও প্রকাশভঙ্গিতে ধীরোদাত্ত মেজাজ প্রকৃত ভাব ও অর্থ-পরিস্ফুটনের সহায়ক হবে। উদাহরণস্বরূপ চারটি ভিন্ন ভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে যেগুলির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গির দ্বারা (আবৃত্তিতে) শ্রোতাদের মধ্যে প্রকৃত রসব্যঞ্জনার পরিস্ফুটন সম্ভবপর হবে বলে মনে করি।

উদাহরণ—

(১) ন তৎ জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
নাসৌ যোগো ন তৎ কর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে ॥

—'নাট্যশাস্ত্রম্', ১ম অধ্যায়, ১১৬ শ্লোক।

(২) যে কেচিদিহ নামহি প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালোঽয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।

—ভবভূতি, 'মালতীমাধবম্'।

(৩) পশ্যামি দেবাং স্তব দেবদেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্—
ঋষিংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥

অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বরঃ বিশ্বরূপ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

. স্বরব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতন স্তং পুরুষো মতো মে ॥

—'ভগবদ্গীতা', একাদশ অধ্যায়।

(৪) আপরিতোষাদ বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥

—কালিদাস, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক ও সংস্কৃত আবৃত্তি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বুধমণ্ডলী যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছেন এবং তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বেদপাঠের অধিকার ও অনধিকার সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় বলা হয়েছে—

ন করালো ন লম্বোষ্ঠো নাব্যক্তো নানুনাসিকঃ।
গদ্গদো বদ্ধজিহ্বশ্চ ন বর্ণান্ বক্তুমর্হতি ॥

অর্থাৎ যাঁর বদন করাল, ওষ্ঠ লম্বা, স্বর আনুনাসিক, কণ্ঠস্বর গদ্গদ (অস্পষ্ট) ও জিহ্বা জড (তোত্‌লা), অর্থাৎ শারীরিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী, তাঁর বর্ণোচ্চারণ কখনও শুদ্ধ হতে পারে না, তিনি বেদপাঠে অনধিকারী। আর বেদপাঠে অধিকারী হলেন—

প্রকৃতির্যস্য কল্যাণী দন্তোষ্ঠৌ যস্য শোভনৌ।
অপ্রগল্ভশ্চ বিনীতশ্চ স বর্ণান্ বক্তুমর্হতি ॥

অর্থাৎ যাঁর প্রকৃতি শান্ত, দন্ত ও ওষ্ঠ সুগঠিত, উচ্চারণ সুস্পষ্ট এবং যিনি বিনীত ও সংযমী তিনিই বেদপাঠে অধিকারী।

এমনকি বেদপাঠের (প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতভাষায় সর্ববিধ পাঠে) ১৪ রকমের দোষ ও ৬ রকমের গুণের কথা বলা হয়েছে—যেগুলি, আমার মনে হয়, সামগ্রিকভাবে আবৃত্তিশিক্ষু ও আবৃত্তিশিক্ষকদের মনে রাখা প্রয়োজন।

১৪টি দোষ ঃ অক্ষর সম্বন্ধে শঙ্কা, সাধারণ ভীতি, উচ্চস্বর, অব্যক্ত বা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, আনুনসিক স্বর, কর্কশ স্বর, অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ, স্থানভ্রষ্ট উচ্চারণ (কণ্ঠস্বর জিহ্বা দ্বারা, তালব্য স্বর দন্ত্য দ্বারা উচ্চারণ), কুস্বর, বিরসকণ্ঠ, বিশ্লিষ্ট (এক অক্ষরে অনেক অক্ষরের) উচ্চারণ, বিষমরূপে অক্ষরকে আঘাতপূর্বক উচ্চারণ, ব্যাকুল হয়ে পাঠ, তানলয়-হীনভাবে পাঠ।

৬টি গুণ ঃ মধুরকণ্ঠে পাঠ, প্রত্যেকটি অক্ষরের সুস্পষ্ট উচ্চারণ, পদচ্ছেদ করে পাঠ, ধৈর্যের সঙ্গে পাঠ এবং তান-লয়যুক্ত পাঠ।

উর্দু। ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে উর্দু এক শক্তিশালী ভাষা। কণ্ঠস্বরে বলিষ্ঠতা এবং উচ্চারণে Glutteral sound-এর ওপর জোর দিয়ে হ্রস্ব-দীর্ঘস্বরের বৈশিষ্ট্য বজায়

রেখে উর্দু কবিতা বা শের-এর আবৃত্তি করা বিধেয়। প্রয়াত প্রখ্যাত মূশায়ারা-প্রয়োগশিল্পী পারভেজ শাহিদী এবং বন্ধু-সাহিত্যিক শ্রীশান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে জেনেছি যে উর্দু আবৃত্তিতে Sound echoes the sense-ই প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অ-উর্দুভাষী মানুষও উর্দু আবৃত্তির রূপরেখা আয়ত্ত করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ চারটি শের বা বয়েত উদ্ধৃত করা হলো :

(১) মেরী আবাজ গর্ নহী আতী
দাগে দিল গর্ নজর্ নহী আতা
বু ভী এ চারাগর নহী আতী।
হম্ বহাঁ হায় জঁহাসে হমকোভী
আপ আপনি খবর্ নহী আতী
মরতে হায় আরজু মে মরণে কী
মৌত আতী পর নহী আতী।
কাবে কিস মুহ্সে যাওগে 'গালিব'
শরম তুমকো মগর নহী আতী। - গালিব।

বঙ্গানুবাদ :—

বুকের আগুন জ্বলছে আমার ধিকিধিকি
হয়তো বুঝতে পারি না।
দগ্ধ হৃৎপিণ্ড পোড়ার যে গন্ধ
সেও কি আমি পাই না॥
নিজেকে খুঁজতে আমি নিজেই যে
রোজ হারিয়ে গেছি।
মরণ যে আমার আসে না
কতই তো কেঁদেছি॥

(২) মুঝে ইয়ে কফস্ অজীজ হায়, ইহাঁ জিতো লুজা করার সে
মুঝে অব চমন মে না লে চলো, মায় ঘাবড়া জায় হুঁ বহার সে॥ —জাফর।

বঙ্গানুবাদ :—এই কয়েদই আমার ভালো লাগে, এখানে শান্তিতে বাঁচতে পারবো। আমাকে আর ফুলবাগানে নিয়ে যেয়ো না, মুকুলিত সৌন্দর্য আমার আর সহ্য হয় না।

(৩) গোসল্খানা পঁহুচ গয়া বাবুর্চিখানা সমঝ্কে।
বোরীমে হাত ডাল দিয়া দজানা সমঝ্কে॥

দিল্লী পঁহুচ গয়া, লুধিয়ানা সমঝ্‌কে।
মস্‌জিদ পঁহুচ গয়া ময়খানা সমঝ্‌কে ॥ —ইক্‌বাল।

বঙ্গানুবাদ :—বাবুর্চিখানা ভেবে গোসলখানায় পৌঁছে গেলাম। দস্তানা ভেবে হাত ঢোকালাম চটের থলিতে। লুধিয়ানা ভেবে চলে গেলাম দিল্লী আর পানাগার মনে করে মসজিদে ঢুকলাম।

(৪) ইচেহ্‌ শোরীস্ত কেহ দর দৌরে কমর মী বিনম্‌।
হামা আফাক্‌ পুর আজ ফিতনা ব সরমী বিনম্‌॥
আবলহাঁ বা হামা সরবৎ যে গুলাব বো কান্দস্ত্‌।
কুতে দানা হামা আজ খুনে জীগর মী বীনম্‌॥ —হাফিজ।

বঙ্গানুবাদ :—ঝগড়া আর মারামারিতে জর্জরিত কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীর এ কী রূপ আমি দেখছি !

বোকারা গোলাপ আর মধুর সরবৎ পান করে আনন্দ করছে, আর বুদ্ধিমান জ্ঞানীরা হৃদয়ের রক্ত পান করছে !

(৫) মতাএ-লৌহ্‌-কলম্‌ ছিন গইতো ক্যায়া, গম্‌ হ্যায়,
কি খুনে-দিল্‌মে ডুবোলী হ্যায় উঙ্গলিয়া ময়নে ;
লবোঁ পে মুহব্‌ লগী হ্যায়তো ক্যায়া, কি রখ্‌দী হ্যায়
হর এক হল্‌কয়ে জন্‌জীর যে জবাঁ ময়নে ॥ —ফৈজ আহ্‌মদ ফৈজ।

বঙ্গানুবাদ :—আমার হাতের কলম কেড়ে নেওয়াতে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি আমার আঙুল ডুবিয়ে নিয়েছি রক্তরাঙা হৃদয়ে। আমার মুখ বন্ধ করে দেওয়াতে কী হয়েছে, প্রত্যেক শৃঙ্খলের গলায় আমার ভাষা আমি রেখে দিয়েছি।

আর একটি উর্দু শের-এর বঙ্গানুবাদ ছাড়াই (সহজবোধ্য বলে) উদ্ধৃত করছি, ঐতিহাসিক কারণে। রচনাকার ভারতের শেষ স্বাধীন-সম্রাট বাহাদুর শাহ। এই শেরটি আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ রেডিও থেকে প্রতিদিন প্রচার করা হতো।

(৬) "মজা আয়েগা যব্‌ হামারা রাজ দেখেঙ্গী
কে আপনি থি জমিন হোঙ্গী আপ্‌না আসমান হোগা
শহীদোঁকী চিতায়োঁপর লাগেঙ্গে হারা বরস্‌ মেলে
ওয়াতনপর মরনেওয়ালোঁকা য়্যাহি নামোনিসান হোঙ্গা।"

হিন্দী। ভারতীয় ভাষা-জননী সংস্কৃত-র রূপরেখা অনুসরণে হিন্দীভাষা সবচেয়ে আন্তরিক। হ্রস্ব-দীর্ঘস্বর, স, শ, ষ এবং ন ও ণ-র স্বতন্ত্র উচ্চারণপ্রয়াস হিন্দীভাষায় সযত্নে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক

হিন্দীভাষা বর্তমান ভারতের সবচেয়ে বেশীসংখ্যক মানুষের মাতৃভাষাই শুধু নয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষারূপে অতি দ্রুত সমৃদ্ধিলাভে সর্বতোভাবে প্রয়াসমুখী হয়েছে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে।

প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো তুলসীদাসের রামায়ণ বা রামচরিত-মানস। এই প্রসঙ্গে হিন্দী কাব্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পরিচয়বাহী কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

(১) **কবীরদাস-এর রচনা :**

করম গতি টারে নাহি টরী।
মুনি বসিষ্ঠ সে পণ্ডিত জানী সোধি কে লগন ধরী।
সীতা হরন মরন দসরথ বন মেঁ বিপতি পরী।
নীচ হাথ হরিচন্দ্র বিকানে বলি পাতাল ধরী।
কোটি গায় নিত পুন্ন করত নৃপ গিরগিট জোনি পরী॥
ভারত মে ভরদ্বল কো অণ্ডা ঘণ্টা টুটি পরী।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো, হোনী হোইকে রহী॥

—লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো মৈথিলীভাষায় (হিন্দীর পূর্ব রূপ) তালব্য শ, মূর্ধন্য না থাকায় বানানের প্রাচীনরূপ।

(২) **তুলসীদাস-এর রচনা :**

অব লোঁ নসানী অব নসৈহোঁ।
রাম কৃপা ভব নিসা সিরানি জাগে পুনি ন ডসৈ হোঁ।
পরবস্থ জানি হঁসয়ো ইন ইন্দ্রিন্ নিজ বস হৈব্‌ ন হঁসহোঁ।
শ্যাম রূপ সুচি রুচির কসৌটি চিত কঁথনহিঁ কসৈহোঁ॥
পায়ো নাম চারু চিন্তামনি উর-কর'তেন খসৈহোঁ॥
মন মধুকর পন করি তুলসী রঘুপতি পদ কমল বসৈহোঁ॥

(৩) **সুরদাস-এর রচনা :**

অবিগত গতি কছু কহতি ন আবে
জ্যোঁ গুঁগহিঁ মীঠে ফল কো রস অন্তরগত হী ভাবে।
পরম স্বাদ সবহী জু নিরন্তর অমিত তোষ উপজাবে।
মন বানী কো অগম অগোচর সোজানে জো পাবে॥

রূপরেখ গুন জাতি জুগতি বিছু নিরালম্বমন চক্রত ধাবে।
সববিধি অগম বিচারহিঁ তাতে সুর সগুন লীলাপদ গাবে।।

(৪) পণ্ডিত সূর্যকান্ত ত্রিপাঠীর রচনা—নিরালা:

বরদে, বীণাবাদিনী বরদে।
প্রিয় স্বতন্ত্র রব অমৃত মন্ত্র নব, ভারত মে ভরদে।
কাট অন্ধ উরকে বন্ধন স্তর
বহা জননি জ্যোতির্ময় নির্ঝর
কলুষভেদ তমহর প্রকাশভর, জগমগ জগ করদে।
নবগতি নবলয় তালছন্দ নব
বনগীত নব জলদমন্দ্র রব
নবযুগকে নব বিহগবৃন্দ কো, নব পর নব স্বরদে।
বরদে বীণাবাদিনী বরদে।।

পরিশেষ-বক্তব্য:

পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধ্যায় ও পর্বের আলোচনায় স্বতন্ত্র-প্রয়োগশিল্প আবৃত্তির তত্ত্ব, তথ্য ও প্রয়োগ সম্পর্কে সমীক্ষামূলক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। এখন সেই আলোচনার প্রেক্ষাপটে পরিশেষ-বক্তব্যরূপে কিছু নিবেদন করা হচ্ছে।

আবৃত্তি সাহিত্য-নির্ভরশীল শিল্পচর্চা, কারণ সাহিত্য ও আবৃত্তির মূল উপাদান শব্দ। শব্দের প্রকাশ ঘটে সাহিত্যকর্মে, বর্ণে আত্মগোপন করে, আর আবৃত্তিতে ধ্বনিময় উচ্চারণে। আমরা তো জানি সভ্যতার আদিমযুগে ধ্বনির জন্ম হয়েছিল আবেগ, উচ্ছ্বাস, বেদনা, আনন্দ, শোক প্রভৃতি বিবিধ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের প্রয়োজনে। এবং সভ্যতার বিবর্তনে অনুভূতি ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে থাকে, অনুভূতির আবেগকে সংযত থেকে সংযততর করার নানান প্রয়োগ দেখা দেয় অনুভূতির সর্বজনীনতা সাধনের জন্য এবং এরই ফলে অনুভবের স্মৃতিকে বিকল্পে রাখতে নানান চিত্রময় মাধ্যমের উদ্ভব হয়। স্বভাবতই লিপিতে আশ্রিত শব্দের, সাহিত্যে প্রথম, মধ্য ও শেষ ভূমিকা। এবং যেহেতু সাহিত্যে লেখক ও পাঠক মুখোমুখি নয়, সেহেতু আবেগ-উচ্ছ্বাস সরাসরি সঞ্চারিত হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু একজন আবৃত্তিকার সাহিত্যের বিষয়কে ধ্বনিরূপে তাঁর উচ্চারণে তুলে এনে উচ্চারণের বিশিষ্টতা, ছন্দের প্রকাশ, ধ্বনির তারতম্য ও কণ্ঠের মাধুর্যদানে শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত করার দায়ভাগী।

সুতরাং আবৃত্তি শ্রোতামুখি। আর এই শ্রোতামুখিনতার জন্যই সামগ্রিক

সংস্কৃতিচর্চার আঙিনায়-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কারণ, সংস্কৃতি মানুষে মানুষে ভাববিনিময়ের দ্বারা অসম্পূর্ণতার পূরণে ঐতিহ্যবাহী ভূমিকাপালনে সতত প্রয়াসী। শ্রোতামুখি শিল্পরূপে আবৃত্তিকে স্বভাবতই কতকগুলি প্রক্রিয়াপালনে সচেষ্ট হতে হয়—(১) সমস্ত শ্রোতাকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করতে হবে। (২) শ্রোতাকে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঙ্গী করে নেবেন। (৩) শ্রোতাকে উদ্বেলিত বা উদ্বুদ্ধ করবেন। এবং বলাই বাহুল্য, শ্রোতা সম্পর্কে আবৃত্তিকারের ধারণা বা অভিজ্ঞতা যত পরিষ্কার হবে তত বেশী তিনি ঐ সমস্ত প্রক্রিয়াপালনে সিদ্ধিলাভ করবেন এবং সিদ্ধিলাভের মাধ্যম হবে পরিষ্কার কণ্ঠস্বর, ছন্দ-জ্ঞান, উচ্চারণ-ভঙ্গি এবং ভাবোপযোগী স্বরের প্রয়োগের মাত্রাজ্ঞান। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ভালো কোনো আবৃত্তি শেষ হওয়ার পর শিল্পী ও শ্রোতারা কেমন যেন সম্মোহনস্তব্ধ হয়ে ওঠেন। কিছুক্ষণ পর শ্রোতারা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যে যার গন্তব্যস্থানে চলে যান কিন্তু সম্মোহনের স্মৃতি ভেতরে থেকে যায়। এই ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পরিস্থিতিটা যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবেই বোঝা যাবে শিল্পী ও শ্রোতার সংযোগপ্রক্রিয়ার স্বরূপটি। কোনো বিষয়কে শিল্পী যখন তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে মূর্ত করে তুলতে চান নানান কলাকৌশলে, তখন সেই বিষয় কিন্তু শ্রোতার কাছে উপস্থিত হচ্ছে প্রত্যক্ষরূপে নয়, পরোক্ষরূপে। যে বিষয়টি শিল্পী মূর্ত করলেন এবং যা শ্রোতা গ্রহণ করলেন তা অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন হতে পারে কারণ উভয়ের অভিজ্ঞতা, মানসিকতা, সংস্কার তো ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তাই শিল্প-প্রক্রিয়ার সাফল্য-অসাফল্য আসবে শিল্পী ও শ্রোতার একাত্মতা এবং বিষমতার হেরফের অনুযায়ী।

আদিম নিরক্ষরতার কাল থেকেই সাহিত্য বাহিত হয়েছে ধ্বনিসহযোগে, এবং এই ধ্বনির প্রকাশে উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী করে স্বীকৃত হয়েছে। এক এক দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া, জলবায়ু, রীতিনীতি অনুযায়ী এক এক জাতির সাহিত্যের ধ্বনিময় উচ্চারণরীতি গড়ে ওঠে। বাঙালীজাতির উচ্চারণ-রীতিতেও স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য জাতির বা অন্য ভাষার সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই এক নয়। কারণ আমরা তো জানি শৃঙ্খলাপরায়ণ ও বিশৃঙ্খলাপরায়ণ জাতির উচ্চারণরীতি অবশ্যই ভিন্ন হবে।

আধুনিক বাংলা কবিতার ভাবের দুরূহতা একটা সমস্যারূপে দেখা দিতে পারে আবৃত্তিকারদের কাছে—যদি না অধ্যয়ন, অনুশীলন দ্বারা তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। আমরা পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ের আলোচনায় বিষ্ণু দের "শরতের মাতিস আকাশ" পংক্তিটির উল্লেখ করেছি, তেমনি উল্লেখ করা যেতে পারে জীবনানন্দ দাশের "বেতের ফলের মত তার ম্লান মুখ মনে পড়ে" পংক্তিটি। অন্তরে এর অর্থ

অনুভব করেও কোনো আবৃত্তিকারের পক্ষে এটি সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সেই ব্যঞ্জনাময় ধ্বনিটি কণ্ঠে আনতে পারছেন, যা শ্রোতাদের মধ্যে এই পঙ্‌ক্তির অর্থটিকে রসমণ্ডিতভাবে সঞ্চারিত করতে পারে। তাছাড়া স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে আবৃত্তিকারকেও আবৃত্তির বিষয় নির্বাচন ঠিক-ঠিক-মতো জানতে হবে। গ্রামের মধ্যে যেখানে মাইক্রোফোনও হয়ত অলভ্য সেখানে যে বিষয়াশ্রয়ী কবিতা নিবেদিত হবে তা কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত মেকানিকাল, ইলেকট্রিকাল, ইলেকট্রনিক্‌স্ ফেসিলিটিসমৃদ্ধ মঞ্চে কাঙ্খিত নয়—কারণ পরবর্তী ক্ষেত্রে হারমোনাইজেশন, ভয়েস-থ্রোয়িং বা মডুলেশনের বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষায় যে সহজ সুযোগগুলি আছে গ্রামে তা সম্পূর্ণরূপে অলভ্য। তাছাড়া শ্রোতারূপে শহুরে মঞ্চের শ্রোতা এবং গ্রামের শ্রোতা তো বিভিন্ন হবেনই।

স্বতন্ত্র প্রয়োগ শিল্পরূপে বাংলা আবৃত্তি গত ৩০।৩৫ বছর ধরে যেভাবে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিমণ্ডিত হচ্ছে একক ও প্রতিষ্ঠানিক প্রয়োগের দ্বারা ঠিক সেভাবে ভারতের অন্যান্য ভাষায় কবিতা কিন্তু আবৃত্তি করা হয় না। হিন্দী, উর্দু বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় যেভাবে এবং যে পরিমাণে কবিতাপাঠের আসর হয় (এমন কি সম্মানদক্ষিণার বিনিময়ে) পশ্চিমবঙ্গে আবৃত্তিচর্চার রূপরেখা কিন্তু প্রায় পরিপূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ধারায় ও রীতিতে প্রবহমান। এমন কি বাংলাদেশেতেও বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের মতো আবৃত্তিশিল্পের চর্চা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। সবিনয়ে বলা যেতে পারে সেখানে কবির কণ্ঠে কবিতাপাঠ, আবৃত্তিকারের কণ্ঠে আবৃত্তির চেয়ে এখনো বেশী জনপ্রিয় তো বটেই, বোধহয় কাঙ্ক্ষিতও। কিন্তু কবি যদি তাঁর কবিতার আবৃত্তিকার হন তবে কবির প্রত্যক্ষ ও গোপন অনুভবের সবচেয়ে বেশী বিকাশ লক্ষ্য করা যাবে তাঁর পাঠে, কিন্তু স্বতন্ত্র আবৃত্তিকারের কণ্ঠে কবির কবিতা তেমনই ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারে যার সৌরভ শ্রোতাদের শুধু মুগ্ধ করবে না, উদ্বুদ্ধ—এমনকি রসের মাধুর্যে সম্পদশালীও করে তুলতে পারে।

ইদানীং একটা প্রশ্ন কোনো কোনো মহলে আলোচনায় এসে পড়ে এবং তা হলো —বাংলা আবৃত্তিচর্চায় আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ কতখানি যুক্তিযুক্ত। আমার মনে হয় সমগ্র পূর্বভারতের (আসামের কাছাড় ও শিলচর, ত্রিপুরা, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে বাংলা উপভাষার চল আছে) বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমীক্ষা করলে একটা সামগ্রিক পরিচয়-চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে শ্রীনীলাদ্রিশেখর বসু এবং আরো দু-একজন আবৃত্তিকার এ ব্যাপারে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রকাশ পরিবেশন করেছেন বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার ভাষায় রচিত কবিতা নিয়ে এবং ব্যক্তিগতভাবে

অন্তত আমার সেগুলি ভালই লেগেছে। আমার মনে হয়, বাংলা আবৃত্তিশিল্পকে জনপ্রিয় করে তুলতে এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। তবে আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে, কলকাতা শহরে বসে ইদানীং যেমন কেউ কেউ মূল পল্লীসঙ্গীতের বাণীকে এধার ওধার করে নতুন পল্লীসঙ্গীত রচনা করছেন এবং তাদের সুর করে এক ধরনের বিচিত্র শহুরে পল্লীগীতি চালাচ্ছেন, সেরকম ভেজাল আধুনিকভাষার উপাদান যেন আবৃত্তির ক্ষেত্রে চালানোর চেষ্টা করা না হয়। কারণ তাতে আঞ্চলিক উপভাষার পরিচিতির মর্যাদা যেমন বাড়বে না তেমনি ভেজাল বিষয়ভিত্তিক আবৃত্তিও 'ভেজাল' বিশেষণে বিশেষিত হবে এবং পরিণামে দুধপুকুর জলপুকুর হওয়ার মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের শহর ও শহরতলীতে ইদানীং বেশ কিছু আবৃত্তিশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং উঠছে সেহেতু সব প্রতিষ্ঠানেই মোটামুটি প্রয়োজনভিত্তিক শিক্ষণ-সিলেবাস চালু হওয়া দরকার এবং সমতারক্ষা করে সিলেবাস ঠিক করার ব্যাপারে মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কিম্বা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা আবৃত্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কোনো বেসরকারী সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি, বিহারের বেঙ্গলি একাডেমি জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। আর সব ক্ষেত্রেই যদি প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা করা শুরু হয় এবং সমগ্র বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল মিলে যৌথভাবে **standard** বাংলা উচ্চারণ স্থিরীকরণ এবং আবৃত্তিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যাগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ বুধমণ্ডলী যদি অদূরভবিষ্যতে কর্মজ্ঞানপ্রয়াসে তৎপর হন তবে ভবিষ্যৎ আবৃত্তিচর্চার উন্নতিবিধানে সত্যিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং বলাই বাহুল্য কাজটা অসম্ভব নয় বলেই একান্তভাবে কাঙ্ক্ষিত।

●

॥ পরিশিষ্ট ॥

[প্রশ্নোত্তর ও অন্যান্য তথ্য]

বাংলা আবৃত্তির প্রয়োগরূপরেখা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক চর্চা সম্বন্ধে বিহার-পশ্চিমবঙ্গ-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ-আসামের বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজনের কাছে দশটি প্রশ্ন-সম্বলিত পত্র দিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, নানাকারণে অধিকাংশেরই উত্তর পাইনি। ফলে, উত্তরগুলির বিশ্লেষণসহ সমীক্ষার কাজটি আদৌ করা গেল না। যাঁদের কাছে পত্রসহ প্রশ্নমালা পাঠিয়েছিলাম তাঁরা হলেন—শ্রীশম্ভু মিত্র, শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি : বিহার বাংলা একাডেমি; শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, সভাপতি : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি; ড. আবু হেনা মুস্তাফা কামাল, মহাপরিচালক: ঢাকা বাংলা একাডেমি; সভাপতি, বাংলাভাষা প্রচার সমিতি, কাছাড়, আসাম; সাধারণ সম্পাদক, গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘ, আগরতলা, ত্রিপুরা; শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র; ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য; কবি ও আবৃত্তিকার শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; আবৃত্তিকার শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়; আবৃত্তিকার শ্রীপ্রদীপ ঘোষ; আবৃত্তিকার শ্রীদেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; আবৃত্তিকার শ্রীনীলাদ্রিশেখর বসু; আবৃত্তিকার শ্রীউৎপল কুণ্ডু; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ; রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্টার ও আবৃত্তিকার শ্রীনাজিম মাহমুদ; বাংলাদেশ আবৃত্তি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আবৃত্তিকার শ্রীভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, খুলনার কবিতালাপ গোষ্ঠীর শ্রীআবদুস সবুর খান চৌধুরী এবং বাংলাদেশের ঢাকানিবাসী প্রখ্যাত আবৃত্তিকার কাজী আরিফ। এঁদের মধ্যে পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করেন নি কিম্বা প্রশ্নমালারও উত্তর দেন নি যথাক্রমে সর্বশ্রী সভাপতি, বাংলাভাষা প্রচার সমিতি, কাছাড়; সাধারণ সম্পাদক, গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘ, ত্রিপুরা; বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র; ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য; কবি-আবৃত্তিকার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; আবৃত্তিকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়; আবৃত্তিকার দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; আবৃত্তিকার নীলাদ্রিশেখর বসু; আবৃত্তিকার উৎপল কুণ্ডু ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ।

ডাকবিভাগের গণ্ডগোল কিম্বা কিছুকাল যাবৎ বাংলাদেশের অস্বাভাবিক অবস্থা হয়ত এর অন্যতম কারণ। পত্র ও প্রশ্নমালা পাঠানোর কয়েক মাস পরে সাক্ষাৎ করি শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে।

শ্রীশম্ভু মিত্র পরিষ্কারভাবে বলেন : "নাটক ও আবৃত্তি বিষয়ে কোনো আলোচনা বা সাক্ষাৎকার আমি করব না বা দেবো না, অতীতে এ ব্যাপারে আমাকে ঠকানো হয়েছে ; আমার অনুমতি ছাড়াই অনেকে আমার বক্তব্য বলে অনেক কিছু ছেপেছে।"

শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র বললেন : "এ সব প্রশ্নের উত্তর করে দেখানো যায়, বলে বা লিখে সম্ভব নয়। তাছাড়া এ সব করার কোনো অর্থ হয় না —এ সব বিষয়ে বলা বা লেখার সময়ও আমার নেই। তবে তোমার একটি প্রশ্নের উত্তরে আমি বলছি যে ইদানীং শ্রুতিনাটক বলে যা চলছে তাতে আমার সম্মতি নেই। যাঁরা এ সব করছেন তাঁদেরও বলেছি, তুমিও লিখে দিতে পারো যে, এগুলিকে নাট্যপাঠ বা নাট্যাংশপাঠ বলাই যুক্তিযুক্ত।"

সম্প্রতি প্রয়াত প্রবীন সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম আমার প্রশ্নমালার উত্তর দিয়েছিলেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এসেছিলাম তাঁকে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তাঁর জীবিতকালে তাঁর দেওয়া উত্তরগুলি মুদ্রিত করা গেল না।

ঢাকা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ডক্টর কামাল দু'বার লোক মারফত পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করেন কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক প্রশ্নমালার কোনো উত্তর তাঁর কাছ থেকে আমি পাই নি।

বাংলাদেশের দুই প্রখ্যাত আবৃত্তিকার শ্রীনাজিম মাহমুদ এবং শ্রীভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক নাজমুল আহসানকে জানিয়েছিলেন আমার প্রশ্নমালার উত্তর পাঠাবেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁদের লিখিত উত্তরও আমার হস্তগত হয়নি। কাজী আরিফ কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছিলেন তিনি উত্তর দেবেন, কিন্তু দেন নি, বা তাঁর উত্তর পৌঁছয়নি। জানি না, কেন ?

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমির সভাপতি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় আমার পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন কিন্তু সাক্ষাতে আলোচনা করেও আমার প্রশ্নমালার উত্তর তাঁর কাছ থেকে পাইনি।

আমার প্রশ্নমালা (স্থানভেদে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ) ছিল নিম্নরূপ :—

প্রশ্নমালা

১। বাংলা আবৃত্তি যে স্বতন্ত্র একটি প্রয়োগশিল্প, এটা আপনি স্বীকার করেন কিনা ; যদি করেন তবে স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পরূপে পশ্চিমবাংলায় আবৃত্তিচর্চার রূপরেখা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

২। যে কোনো কবিতা বা সাহিত্য-বিষয় কি আবৃত্তির বিষয় হতে পারে ? আবৃত্তি, কবিতা বা অন্য যে কোনো বিষয়ভিত্তিক, করার সময় মুখস্থ করা কিম্বা তা না করে দেখে বলা, কোন্‌টি ঠিক এবং কেন ? পাঠ ও আবৃত্তির মৌলিক পার্থক্য কি ?

৩। পশ্চিমবাংলার কলকাতা শহরে এবং মফঃস্বলের বেশ কিছু জায়গায় ইদানীং অনেকগুলি আবৃত্তিশিক্ষণ-সংস্থা চালু হয়েছে বলে জানি। এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে কি কোনো নির্দিষ্ট সিলেবাস আছে? শিক্ষণশেষে প্রতিষ্ঠান থেকে কি কোনো স্বীকৃতিপত্র দেওয়া হয় এবং যদি হয় তবে তাকে সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে কি রকম মর্যাদা দেওয়া হয় এবং অথবা দেওয়া যেতে পারে? শিক্ষণ ব্যাপারে এই সব সংস্থাকে সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত কিনা, আবৃত্তি-চর্চার সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে এ ব্যাপারে কি রকম প্রয়াস প্রচেষ্টা হতে পারে বলে মনে করেন।

৪। ভাব ও ছন্দপ্রকাশের ক্ষেত্রে আবৃত্তিকার কি কবি বা লেখকের প্রতিনিধি বা প্রচারক নাকি নিজস্ব অনুভবের প্রেরণায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক স্বাধীন শিল্পস্রষ্টা?

৫। পশ্চিমবঙ্গের আবৃত্তি বিষয়ভিত্তিক প্রকাশিত গ্রন্থাদি, পত্র-পত্রিকা বা জার্নাল সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই। দয়া করে জানান।

৬। কেউ কেউ আঞ্চলিক উপভাষায় আবৃত্তি করার চেষ্টা করেন। এর কার্যকারিতা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? আবৃত্তিচর্চার সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে এর প্রয়োজনীয়তা কি রকম?

৭। স্বরচর্চা সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশে অনেক প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাদিও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও প্রয়াস-প্রচেষ্টার আয়োজন সম্পর্কে আপনার বক্তব্য জানতে চাই।

৮। আমার মনে হয় শ্রুতিনাটক ব্যাপারটি বেতার নাটক ছাড়া আর কিছু নয়। এটি কখনই মঞ্চোপরি প্রত্যক্ষ-দৃশ্যরূপে পরিবেশিত হওয়া উচিত নয়। ইদানীং প্রত্যক্ষদৃশ্যরূপে শ্রুতিনাটক পরিবেশনের অবশ্য হিড়িক দেখা দিয়েছে। যেভাবে এগুলি পরিবেশিত হচ্ছে তাকে নাট্যপাঠ, কাব্যনাট্যপাঠ বলা সমীচীন বলে আপনি কি মনে করেন? এ বিষয়ে ব্যক্তিগত এবং সংগঠনগতভাবে আবৃত্তিকারদের কি কোনো দায়িত্ব পালন করার প্রয়োজন নেই?

৯। একক, দ্বৈত ও সমবেত আবৃত্তি পরিবেশনায় যন্ত্রসঙ্গীত, আলোকসম্পাত এবং দৃশ্যসজ্জার সঙ্গতকারী ভূমিকা কি কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করেন?

১০। স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পরূপে বাংলা আবৃত্তিচর্চার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার কি নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা বা পরামর্শ আছে?

যাঁদের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছি সেগুলি যথাযথভাবে এইসঙ্গে মুদ্রিত করা হলো। বাঙলাদেশে আবৃত্তিচর্চা সম্পর্কে শ্রীআল্ মাহমুদের একটি নিবন্ধ এবং শ্রীআমিনুর রহমান টুটুল-এর "প্রসঙ্গ : কথা" নিবন্ধটিও কৃতজ্ঞচিত্তে এইসঙ্গে মুদ্রিত করা হলো। ওপার-বাংলার আবৃত্তিচর্চার কিছু তথ্যের পুনর্মুদ্রণও সংযোজিত হলো।

॥ এক ॥

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু !

আপনার প্রশ্নাবলী ও পত্রের উত্তর দিতে বেশ দেরী হয়ে গেলো। আমি কিছু অত্যাবশ্যকীয় কাজে জড়িয়ে পড়েছিলুম তাই অনিচ্ছাকৃত এই বিলম্ব।

আপনি একটী প্রায় অবহেলিত বিষয়কে গবেষণার স্তরে তুলে নিয়ে বাঙালী-মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হয়ে পড়েছেন। নাট্যজগতের সঙ্গে আমার যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ—কতটা সহযোগিতা করতে পারলুম জানি না। আর অজ্ঞতার দরুণই পত্রাচার এখানেই শেষ করলুম।

আশা করি কুশল। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

॥ বাংলা আবৃত্তির তত্ত্ব, তথ্য ও প্রয়োগ সম্পর্কিত ॥

প্রঃ—(১) বাংলা আবৃত্তি যে একটী স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্প—প্রবাসী বাঙালীরা তা মনে করেন কী না? এই স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্পের চর্চা বিহার প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে কী রকম? বিহার বাংলা আকাদেমি এব্যাপারে কোনরূপ আনুকূল্য প্রদর্শন করেন কী না?

উঃ—বিহারে বাঙালীর সংখ্যা অনুপাতে সাংস্কৃতিক সম্মেলনগুলিতে আবৃত্তির প্রচেষ্টা মন্দ নয়; সুতরাং এটা একটা প্রয়োগশিল্প হিসাবে কৃষ্টি-সম্পন্ন বাঙালী পরিবারে আছে বলেই ধরে নেওয়া যায়। বি. বাং. আ. এ-বিষয়ে যথাসাধ্য আনুকূল্যও দেখিয়ে থাকেন।

প্রঃ—(২) আবৃত্তি করার সময় মুখস্থ বলা কিংবা দেখে পড়া—কোন্‌টি ঠিক এবং কেন? পাঠ ও আবৃত্তির মৌলিক পার্থক্য কী? প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে খ্যাত আবৃত্তিকারদের নাম, ঠিকানা এবং তাঁদের উল্লেখ্য অবদানের বিবরণ। যে কোনো কবিতা বা সাহিত্য-বিষয়ই কী আবৃত্তির বিষয় হতে পারে?

উঃ—আবৃত্তি সম্পূর্ণ স্মৃতি-নির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ দেখে পড়া বা **prompt** সহযোগে পড়া কতকটা নিকৃষ্টস্তরের বলেই মনে হয়। এই ভাবটা বেড়ে

গেলে স্মৃতি-শক্তির মত একটা মূল্যবান মানসিক সম্পদ দুর্ব্বল হয়ে পড়বে বলেই আমার ধারণা। খ্যাত আবৃত্তিকারদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি আমার জানা নেই। আবৃত্তি রস পরিবেশনার একটি ভাল মাধ্যম—তাই স-রস বিষয় বেছে নেওয়াই সমীচীন।

প্রঃ—(৩) বিহারে আবৃত্তি-শিক্ষণ-সংস্থা আছে কী? থাকলে তাঁদের কর্ম-প্রচেষ্টার উল্লেখ্য বিবরণ জানান। এ-পর্য্যন্ত আপনার নির্দেশনায় বি. বাং. আকাদমির কোনো পরিকল্পনা হয়েছে কী?

উঃ—বিহারে এ-জাতীয় কোনো শিক্ষণ-সংস্থা আছে বলে আমার জানা নেই। বি. বাং. আ.-রও এখন পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনা নেই পৃথকভাবে প্রচেষ্টার। আমাদের প্রতিষ্ঠানটির হাতে এখন কয়েকটি গুরুতর বিষয় রয়েছে।

প্রঃ—(৪) ভাব ও ছন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে আবৃত্তিকার কী কবি বা লেখকের প্রতিনিধি বা প্রচারক নাকি নিজস্ব অনুভবের প্রেরণায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক কোনো স্বাধীন শিল্প-স্রষ্টা।

উঃ—ভাব-ছন্দ-আবৃত্তি—তিনটিই কবিমনের রসচেতনার প্রকাশ, শুধু আঙ্গিক বিভিন্ন।

প্রঃ—(৫) আবৃত্তি বিষয়ভিত্তিক কোনো গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা বা জার্নাল কী আপনার অঞ্চল থেকে মুদ্রিত হয়েছে? অথবা নিয়মিত প্রকাশিত হয়?

উঃ—না, অন্ততঃ আমার জানা নেই।

প্রঃ—(৬) আঞ্চলিক বাংলা উপভাষায় কী আবৃত্তির চল্ আছে? যদি থাকে, তার বিবরণ এবং শিল্পীদের পরিচয় সহ কাজের সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচীর পরিচয়।

উঃ—না, আমার জানা নেই।

প্রঃ—(৭) শ্রুতিনাটক ব্যাপারটি বেতার নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়, এটা কখনই প্রত্যক্ষ দৃশ্যরূপে মঞ্চোপরি উপস্থাপিত হ'তে পারে না—এ সম্পর্কে আপনার মত কী? পশ্চিমবঙ্গে ইদানীং প্রত্যক্ষ দৃশ্যরূপে শ্রুতিনাটক প্রযোজনার হিড়িক পড়ে গেছে। বিহারে কী এর চলন হয়েছে? এই প্রয়াসকে নাট্য বা নাট্যাংশপাঠ কিংবা নাট্য-কাব্য পাঠ ছাড়া অন্য কিছু কি বলা যায়?

উঃ—আমার মতে, শ্রুতিনাটককে দৃশ্যরূপে পরিবর্ত্তিত করে মঞ্চে প্রদর্শন করা যেতে পারে। বিহারের বড়-বড় শহরে সম্ভবতঃ এজাতীয় জিনিসের প্রচলন হয়ে থাকবে—আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। যদি মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয় তাহলে যত ছোট বা বড় হোক্ না কেন—তাকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে বাধা কোথায়?

॥ দুই ॥

শ্রদ্ধাস্পদেষু!

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। বাংলা আকাদেমি আপাতত আবৃত্তি নিয়ে চিন্তা করছে না। আপনি সঙ্গীত নাটক আকাদেমির কাছে আপনার প্রশ্নটি পাঠালে হয়তো কিছু ফল হবে।

নমস্কার। ইতি—বিনীত

অন্নদাশঙ্কর রায়

॥ তিন ॥

ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আবৃত্তি বিষয়ে একটি গবেষণামূলক কাজে আপনি আমার মত অকিঞ্চিৎকর এক আবৃত্তিপ্রেমীর সহযোগিতা প্রার্থনা করে যে গৌরবান্বিত করেছেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু নিজের যোগ্যতার বিষয়ে সন্দিহানও। বিশেষত, এই শিল্পে আমি একজন প্রয়োগকর্মী মাত্র—তাত্ত্বিক বিষয়ে মতামত দেবার পাণ্ডিত্য নেই এ কথা যখন জানি।……তবুও আপনার ইচ্ছানুসারে প্রশ্নাবলীর উত্তর সংক্ষেপে যতদূর সম্ভব দেবার চেষ্টা করেছি। আপনার প্রয়োজন সাধিত হলে বাধিত হবো। আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ—

ইতি—

আপনার প্রীতিমুগ্ধ

প্রদীপ ঘোষ

১. বাংলা আবৃত্তি আজ স্বতন্ত্র একটি প্রয়োগশিল্প হিসেবে সাধারণভাবে স্বীকৃত। যদিও সঠিক আবৃত্তির সংজ্ঞা কি তা নিয়ে আমার নিজের মনে সংশয় আছে। আবৃত্তি কাকে বলে—এর উত্তর কী? কিন্তু আবৃত্তি কেমন ক'রে করতে হয় তার নমুনা পেশ করা যেতে পারে। কোনও প্রয়োগশিল্পের সংজ্ঞা নিয়ে এমন

মতান্তর অনেকক্ষেত্রেই আছে। শ্রোতাসাধারণ এখন আবৃত্তি শুনতে আগ্রহী। আবৃত্তির পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানেও যথেষ্ট সাফল্য। বিশ পঁচিশ বছর আগেও আবৃত্তির এ জনপ্রিয়তা ছিল না। তখনও আবৃত্তি হ'ত। অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য হিসেবে, তাও খুব কমই। স্কুল কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বা কবি-মনীষীর স্মরণ অনুষ্ঠানে। আবৃত্তিকারও ছিলেন প্রধানত অভিনেতারাই। নির্মলেন্দু লাহিড়ি, শিশির ভাদুড়ি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মসূচীতে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্রের আবৃত্তির চাহিদা ছিল। গ্রামে গঞ্জে নানা অনুষ্ঠানে। কিন্তু সম্পূর্ণ আবৃত্তিকার পরিচয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করলেন কাজী সব্যসাচী। ইদানীং আবৃত্তির প্রসারে তাঁর ভূমিকা অগ্রণীর। এখন অনেকেই আবৃত্তি করেন, অনেক আবৃত্তিকার, অনেক আবৃত্তিচর্চা ও শিক্ষা সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গে জেলায়, মহকুমায় এমন কি প্রত্যন্ত পল্লীতেও সারারাত আবৃত্তির অনুষ্ঠানও হয় কখনও বা—সকাল, সন্ধ্যা তো আছেই। কারও কারও রেকর্ড, ক্যাসেটও প্রকাশিত হয়, নিয়মিত। যার বিক্রি অনেক সময় প্রতিষ্ঠিত গানের শিল্পীদের রেকর্ড ক্যাসেটের চেয়ে অনেক বেশি। শ্রোতাদের হৃদয় হরণে আবৃত্তিও অন্যান্য প্রয়োগশিল্পের পাশাপাশি পিছিয়ে নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, অনেক শ্রোতাই আজ কবিতার কাছে আশ্রয় পেয়েছেন আবৃত্তির মাধ্যমেই। কিন্তু অন্যান্য প্রয়োগশিল্পের মত এক্ষেত্রেও চটুলতার মিশেল ঘটেছে—হাল্কা মেজাজের হাওয়া এখানেও মাঝে মাঝেই আসর জাঁকিয়ে বসে, সেই সঙ্গে টিকিটঘরের চাহিদা মেটাতে রূপালী গ্ল্যামারেরও আমদানী। কখনও বিষণ্নমনে ভেবেছি লক্ষ্য কি তবে ভ্রষ্ট হ'ল, হ'ল কি পথ ভুল? দীর্ঘ পথের শ্রমটুকু স্বীকার ক'রে এখন কিন্তু মনে হয় ভুল নয়, ভয় নয়—এ বাহুল্য বাতিল হবেই কালের নিরীখে। আবৃত্তির নিজস্ব জায়গা থাকবেই। পথের শুরুতে যে অবাঞ্ছিত ভিড় হাল্কা হাওয়ার তোড়ে তা ভেসে যাবে, দৃঢ়, সনিষ্ঠ প্রয়াসকে তা টলাতে পারবে না। শ্রোতাও চিনে নেবে তার প্রাণের শিল্পীকে। য়ুরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডার নানা দেশে ঘুরেছি কবিতার ঝুলি নিয়ে, সে সব দেশে আবৃত্তিকার পরিচয়ে বিশেষ কেউ নেই, যাঁরা আছেন তাঁরা বিখ্যাত অভিনেতারাই। আবৃত্তিশিল্প নিয়ে তেমন ধারণাও নেই। আগ্রহ এসেছে শুনে। পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে এক নতুন শিল্পধারার প্রসার ঘটিয়েছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশেও ইদানীং আবৃত্তির বিপুল জনপ্রিয়তা। এখানকার চেয়ে বয়সে কম হলেও আন্তরিকতায় ও প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিতে বরং অনেকটাই এগিয়ে। বাংলাদেশ বেতার ও দূরদর্শনে আবৃত্তির যে মর্যাদা এখানকার বেতার ও দূরদর্শনে তার সামান্যতমও নেই। সর্বসাধারণের মনে জায়গা পেলেও সরকারী নানাবিধ স্বীকৃতিও এখনও অপাঙক্তেয়।

২. হতে পারে, স্থান কাল পাত্রভেদে। যে কবিতা একান্ত অনুভবের, খোলা মণ্ডপে শ্রোতার কাছে তার সমাদর না হতেও পারে। সেখানে যে কবিতা সার্থক—শান্ত প্রেক্ষাগৃহে তা চিৎকৃত মনে হ'তে পারে। আবার সবই অন্য রকম হ'তে পারে,—শুধু কী আবৃত্তি হচ্ছে যেমন, কে আবৃত্তি করছেন তার জন্যও। বেতারে, রেকর্ডে, দূরদর্শনে, ঘেরা বা খোলা অনুষ্ঠান-মঞ্চে পরিবেশ বদলে যায়। মাধ্যমের হেরফেরে একই কবিতার প্রকাশভঙ্গীরও রকমফের হয়। অনুষ্ঠানে শ্রোতার প্রস্তুতি এক রকম। বেতার, দূরদর্শনে বা রেকর্ডে অন্যরকম। অনুষ্ঠানে শ্রোতার পছন্দ, অপছন্দ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সত্ত্বেও অনেক জটিল ও অনিশ্চিত। বেতার ও দূরদর্শনে শ্রোতা তা শোনা বা দেখা অপছন্দ হ'লে বন্ধ করে দিতে পারেন, রেকর্ড তো শ্রোতাকে কষ্টার্জিত অর্থে কিনতে হয়—তা পছন্দের ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট। রুচির বিভিন্নতার কথাও অস্বীকার করা যায় না।

মুখস্থ বলা বা দেখে বলা নিয়ে তর্কে আমার আগ্রহ কম। আমাকে অনেক অনুষ্ঠানেই একটানা এক দেড় ঘণ্টা আবৃত্তি করতে হয়, একক অনুষ্ঠানে তো তিন ঘণ্টার ওপর। আমি দেখে বলা বা মুখস্থ দুইয়েরই সাহায্য নিই। দেখেও যা বলি তার প্রস্তুতি তো নিতে হয় আগেই। তবে আমার অনুষ্ঠানকে কি বলে অভিহিত করব? শ্রোতার যা খুশি—সমালোচকের যেমন ইচ্ছে! আমার কাজ শ্রোতাদের কাছে কবিতার জগতকে সম্পূর্ণ করে মেলে ধরা, যে জগতে শ্রোতার সঙ্গে আমার মিলন—আমার আত্মীয়তা। যখন বেতারে বা রেকর্ডে আবৃত্তি করি তখন তো আমি অদৃশ্য, তখন কী বলব? আর অনেক বিখ্যাত আবৃত্তিকার যখন মুখস্থ বলতে গিয়ে স্মৃতিভ্রমে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দের সঙ্গে নিজের শব্দ মিশিয়ে দায় বাঁচান তার বেলা? আসলে পাঠ ও আবৃত্তির পার্থক্যটা আমার মতে মাত্রার। ছন্দ, যতি, অর্থ, ভাব উচ্চারণ সঠিক রেখে উপস্থাপনাকে যদি পাঠ বলি তবে আবৃত্তিকারের অনুভব—আবেগ প্রকাশভঙ্গীতে পাই আবৃত্তিতে—যেখানে আবৃত্তিকার নিস্পৃহ নন, কবির বলার কথা সেই মুহূর্তে যেন তাঁরও। কবিতার এক সার্থক অনুবাদক হতে পারেন আবৃত্তিকার—ভাষার নয় ভাবের অনুবাদক, কবিতার শ্রোতাকে পাঠকের ভূমিকায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন কবি ও শ্রোতার সেতুবন্ধনের এই কারিগর।

৩. একই প্রশ্নসংখ্যায় অনেক প্রশ্ন।—হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সর্বত্র ইদানীং অনেকগুলি আবৃত্তি শিক্ষণ সংস্থা চালু হয়েছে বলে জানি। কারও কারও নির্দিষ্ট সিলেবাস আছে বলেই শুনেছি, চোখে দেখিনি। শিক্ষণ-শেষে স্বীকৃতি-পত্র দেওয়া হয় বলে শুনেছি কোথাও কোথাও। যতদূর জানি এখানে সরকার এ ব্যাপারে

উদাসীন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মান সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই—তাই সরকারের স্বীকৃতির প্রশ্ন আসবে প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার স্বীকৃতির সঙ্গে। সরকারী সংস্কৃতির ব্যাপারে আমার ভরসা কম, তবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছুই করার আছে এটা বিশ্বাস করি। আসলে আমি যতটুকু বুঝি, সংস্কৃতির চেহারা চরিত্র তার নিজস্ব—দেশজ, লোকায়ত, ঐতিহ্যবাহী, এবং সরকার-নিরপেক্ষ। কিন্তু তার স্বাভাবিক সুস্থ বিকাশ অব্যাহত রাখতে সরকারী সাহায্যেরও প্রয়োজন। আবৃত্তির বেলাতেও তাই। সরকার এই শিল্পচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ না করেও সাহায্য করতে পারেন, যেমন অন্যান্য প্রয়োগশিল্প—সংগীত, নৃত্য ও নাটকের বেলায় করে থাকেন।

৪. ভাব ও ছন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে আবৃত্তিকার একাধারেই কবি বা লেখকের প্রতিনিধি বা প্রচারক এবং নিজস্ব অনুভবের প্রেরণায় নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক স্বাধীন শিল্পী। যেখানে ভাবটা কবির, অনুভব আবৃত্তিকারের। ভাষা কবির, ভঙ্গী আবৃত্তিকারের। কবির রচনা, আবৃত্তিকারের উচ্চারণ। গীতিকার-সুরকারকে সম্মান জানিয়েও গায়ক যেমন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, নাট্যকারের সংলাপ উচ্চারণ করেও স্বকীয় বিশিষ্টতায় যেমন অভিনেতা। কথাশিল্পীর কাহিনী অবলম্বনে যেমন চলচ্চিত্রকার। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়, যেমন সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একই সাজাহান নাটকের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী বা শিশির ভাদুড়ি। কিংবা একই রবীন্দ্র-সংগীতে দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনি একই কবিতার আবৃত্তিতে হয়ত বা প্রায় বিপরীত প্রকাশে শম্ভু মিত্র বা কাজী সব্যসাচী।

৫. আবৃত্তিবিষয়ে বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। যা-ও আছে তা-ও সব ক'টিই তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। পত্রপত্রিকার সংখ্যাও নিয়মিত প্রকাশের ভিত্তিতে চার পাঁচখানির বেশি নয়। বিভিন্ন আবৃত্তি সংগঠন এগুলো প্রকাশ করেন, আর্থিক ও সাংগঠনিক সমস্যা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো এঁদের উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা ও সততা। কয়েকটি এ রকম পত্রপত্রিকার মধ্যে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে ছন্দনীড়, বাল্মীকি, কথক ও সব্যসাচী পত্রিকার কথা। দুর্গাপুর, বহরমপুর ও উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকাও দেখেছি। নাম মনে পড়ছে না। এ সব পত্রিকাতেই বেশ কিছু ভাল লেখা বা সাক্ষাৎকার পড়েছি যা আবৃত্তিবিষয়ে আগ্রহী ও শিক্ষার্থীকে সমানভাবে উপকৃত করবে। অন্যান্য সাময়িক পত্র বা দৈনিক পত্রিকাতেও মাঝে মধ্যে আবৃত্তিবিষয়ক আলোচনা বা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই।

৬. আমি আঞ্চলিক ভাষায় আবৃত্তি করি না, তাই এ বিষয়ে মতামত দেওয়া শোভন নয়। আবৃত্তিচর্চার সামগ্রিক স্বার্থে তার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারেও কিছু জানি না। তবে আমি কেন করি না অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও, তা বলতে পারি। আমি আঞ্চলিক উপভাষা জানি না বলে করি না। কোনও ভাষাকে না জেনে সে ভাষায় কোনও কিছু করা আমার কাছে চমক বা গিমিক বলে মনে হয়। তবে প্রয়োজনে করতে রাজী। যেমন, বেশ কয়েক বছর আগে শিলিগুড়িতে সম্ভবত যুব উৎসবে আদিবাসী দিবসে বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত কয়েক হাজার আদিবাসী শ্রোতার সামনে করেছিলাম। তিনটি সাঁওতালি কবিতার আবৃত্তি। সেজন্য আমাকে আমার সহকর্মী সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের সাহায্য নিতে হয়েছিল নিয়মিত বেশ কয়েক দিন ধ'রে। সেদিন আমার শ্রোতারা আমার সহমর্মী ছিলেন। সাঁওতালী বা আঞ্চলিক ভাষা হলেই আমরা নির্দ্বিধায় 'বোটে' 'কেনে' এমনি সব শব্দ সুর করে বলি, যার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার মিল পাই নি। রবীন্দ্রসদন মঞ্চে কলকাতার বুকে যাঁরা আমাদের আবৃত্তি শুনতে আসেন তাঁদের সঙ্গে কী যোগ এই ভাষার, নিরর্থক ধ্বনিস্পন্দন বা শ্রুতিনন্দন (?) প্রয়াস ছাড়া? রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালী শ্রোতার কাছে ইংরেজী, জর্মান, রুশ, ফরাসীতে শোনানো আমার কাছে তেমনিই অহেতুক। সেই ভাষার লেখকের কাছে, সেই অঞ্চলে অনুষ্ঠান করলেন ঠিক আছে, প্রয়োজন আছে। এখানেও তর্কের খাতিরে কোনও প্রয়োজনকে মানতে হ'লে তা নিতান্তই 'এ্যাকাডেমিক'। আমি যতদূর জানি, এই সব আঞ্চলিক ভাষায় যাঁরা কথা বলেন তাঁরাও আমাদের এই সৌখীন মজদুরিতে বড় একটা খুশি নন। এমনি, সে ভাষার কবিতা বা সাহিত্য বা তার আবৃত্তি-পাঠ যথাযোগ্য মর্যাদায় হলে আমি আগ্রহে তা জানতে, শুনতে, শিখতে রাজী। এবং সেজন্য আমি সাধারণভাবে সেই ভাষায় লেখেন, কথা বলেন এমন কবি বা আবৃত্তিকারেরই মুখাপেক্ষী হ'তে চাই।

৭. অভিনয় শিক্ষার শুরুতে আবৃত্তিকে গুরুত্ব দেন অনেকেই। বিশেষত কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ ও স্বরক্ষেপণ শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই সব নাট্য বা আবৃত্তিশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে পাঠক্রম থাকার কথা এবং তা প্রচলিত পদ্ধতিতেই হওয়া উচিত। এ সংক্রান্ত বইপত্র অবশ্য বাংলায় খুব বেশি না থাকলেও অল্পবিস্তর জানা ভাষা ইংরেজীতে আছে। এ সম্পর্কে সুষ্ঠু কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। আমি নিজে এ ব্যাপারে শিক্ষার্থী হিসেবে একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়ে বিফল মনোরথ হয়েছি। এটা তাঁদের শিক্ষাদানের অনীহা না অক্ষমতা, জানি না। কিন্তু তাঁদের নিজস্ব যোগ্যতা সম্পর্কে আমি শ্রদ্ধাশীল। তাই প্রথাগতভাবে প্রতিষ্ঠানে

এই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করি। কিন্তু সেটুকু যেন প্রয়োগের ক্ষেত্রেই সীমিত থাকে। কেননা আবৃত্তি, আমার মতে ব্যক্তিগত চর্চার শিল্প, মননটা নিজস্ব কিন্তু তার প্রকাশের প্রকরণ অনুশীলনসাপেক্ষ—তাই তা শিক্ষারও। যেমন স্বরক্ষেপণ এবং সেই সঙ্গে ছন্দ, ভাষা, উচ্চারণ। বাংলা উচ্চারণের এখনও পর্যন্ত কোনও সর্বজনসম্মত উচ্চারণবিধি নেই। এমন কি বেতারে বা দূরদর্শনেও নেই যেমন আছে বিশেষ করে লণ্ডনের বি. বি. সি-তে। বাংলাদেশে একটি উচ্চারণ-কোষ প্রকাশের কাজ চলছে, দেখে এলাম সম্প্রতি। বিধিবিধান নিয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে। কিন্তু ঢাকায় যে তার একটা পরিকল্পিত রূপ দেবার চেষ্টা হচ্ছে এটাই ভালো লাগল। এখানেও দু'একটি উচ্চারণ-বিষয়ক বই যে নেই তা নয়, কিন্তু তা নির্ভর করার মত নয়। বহু বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক, বিদগ্ধ পণ্ডিত ভুল উচ্চারণে কথা বলেন এবং সেজন্য লজ্জিতও নন—কেননা এটা মাতৃভাষা ইংরেজী তো নয়! বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার শুরুতেই এ ব্যাপারে নজর দেওয়া দরকার। কেননা বয়স্ক লোকের পক্ষে উচ্চারণের ত্রুটি সংশোধন বেশ আয়াসসাধ্য ব্যাপার।

৮. এই প্রশ্নটি প্রশ্নকর্তার মন্তব্যসহ। এতে উত্তরের ওপর প্রভাব না পড়লেও প্রশ্নটি উদ্দেশ্যমূলক হয়ে পড়ে। যাই হোক, এ ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব স্পষ্ট। শ্রুতিনাটক নামকরণ নিয়ে আমার মনে বেশ খটকা আছে। বিকল্প নাম কী হ'তে পারে তা নিয়েও এ মুহূর্তে নিশ্চিত নই। তবে প্রয়োগশিল্পের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক প্রয়াস হিসেবে স্বাগত জানাতে কুণ্ঠিত নই। বরং আগ্রহ আছে এর যথার্থ রূপায়ণ ও পরিণতি সম্পর্কে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখছি শ্রোতা-সাধারণ এই প্রয়োগশিল্পটি সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহী। নিছক বিনোদনের জন্য না হ'লে এই আঙ্গিকে কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহু মূল্যবান উপস্থাপনা সম্ভব। নাট্য-প্রযোজনার খরচ, প্রস্তুতির বা মঞ্চসজ্জার নানা সমস্যা এতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম। অনেকেই এর ফলে এই শিল্পপ্রকাশে ফাঁকির আশংকা করেন। সমালোচনার অনেকটাই এ কারণে। তবু আমার মনে হয় সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা নিষ্ঠাবান, রুচিশীল ও দায়িত্ব-সচেতন হ'লে আমরা শ্রোতা হিসেবে লাভবানই হব। তবে প্রয়োগশিল্পের এই রূপ যে নতুন বা সাম্প্রতিক, এই দাবী আংশিক সত্য। আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেই অনেক আগের দিনের কথা মনে আসছে। কিন্তু এর জনপ্রিয়তা যে সাম্প্রতিক এটা ঘটনা। মোট কথা এই প্রয়াসকে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি।

এ ব্যাপারে আবৃত্তিকারদের ব্যক্তিগত বা সাংগঠনিকভাবে কি করবার আছে বা কোন্ দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন জানি না। যদি তেমন কিছু থাকেও তবে

আমার মতে বিকল্প কোন উপস্থাপনা, প্রকাশের বিভিন্নতায়, ভিন্নতর রূপায়ণে। অন্য কোনও পন্থায় আমার আস্থা নেই।

৯. একক, দ্বৈত বা সমবেত আবৃত্তি পরিবেশনায় যন্ত্রসংগীত, আলোকসম্পাত এবং দৃশ্যসজ্জার ভূমিকা প্রয়োজনীয় হ'লে আমার কাছে তা কাঙ্ক্ষিতও। আসল কথা প্রয়োজনের ব্যাপারে দ্বিধাহীন হ'তে হবে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে কাজী নজরুল ইসলাম যখন 'রবিহারা' কবিতা লিখে আবৃত্তি করেন, গ্রামোফোন রেকর্ডে তখন শুনি আবহে পরিতোষ শীলের বেহালা। হৃদয় দ্রবীভূত হয়। মন বেহালার মতই গুমরে ওঠে।

আমি কয়েকটি আবৃত্তির রেকর্ডে যন্ত্রসংগীতের সাহায্য নিয়েছি—ভি. বালসারা, কাজী অনিরুদ্ধ, দিলীপ রায় প্রমুখের পরিচালনায়—পরিকল্পনা অবশ্যই আমার। শুধু তা শ্রবণ-বৈচিত্র্যের জন্যই নয়, আবৃত্তিকে আরও মর্মগ্রাহী করতে। একই রেকর্ডের একদিকে নজরুলের 'মানুষ' কবিতার আবৃত্তিতে যন্ত্রসংগীত সহযোগিতা নেই—প্রয়োজন মনে করিনি বলেই। কিন্তু অপর পিঠে 'দোদুল দুল', 'সর্বহারা' ও 'আগুনের ফুলকি ছুটে' আবৃত্তিতে সামান্য সহযোগিতা নিয়েছি ভাবের মর্মস্পর্শী রূপায়ণে। নজরুলের কামালপাশা ও ফরিয়াদ যখন পনেরো ষোলো বছর আগে প্রথম আবৃত্তির রেকর্ড হয়ে প্রকাশিত হ'ল তা ভি. বালসারার সুনিয়ন্ত্রিত সহযোগিতা ছিল নির্দিষ্ট কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে। কেননা শ্রোতার কাছে ফরিয়াদের আর্তি বা কামালপাশার করুণ-রুদ্র রসের সম্প্রচার করতে তার দরকার মনে হয়েছিল। বিশেষত কামালপাশার পরিবেশনার রূপ সম্পর্কে শ্রোতার মনে কোনও সঠিক ধারণা ছিল না তার আগে। তারপর আবার নতুন করে রেকর্ড করে অন্যান্য কবিতার সঙ্গে একটি ক্যাসেটে আবার যখন প্রকাশিত হ'ল ফরিয়াদ ও কামালপাশার আবৃত্তি তখন কোনও যন্ত্রসংগীতের সাহায্য নিই নি। কেননা তার আর প্রয়োজন নেই। আবৃত্তি মূলত বাচিক শিল্প—এবং এতদিনে কামালপাশার বক্তব্য ও তার প্রকাশ-বৈচিত্র্যের সঙ্গে শ্রোতা যথেষ্ট পরিচিত। তবুও এখনও মাঝে মাঝে শ্রোতারা যন্ত্রসংগীত সহযোগিতার অনুরোধ জানান।

কখনও কখনও কবিতার আবৃত্তিতে আমি **mood light**-এর সাহায্য নিয়েছি এদেশে বিদেশে, বিশেষত দীর্ঘ একক অনুষ্ঠানে, শ্রোতাকে আরও নিবিড় অনুভবের সঙ্গী করতে। অভিজ্ঞতা বিরূপ নয় বলতে পারি। আলোকসম্পাতের নির্বিশেষে যথেচ্ছ ব্যবহার আমার কাছে নিষ্প্রয়োজন।

দৃশ্যসজ্জার সাহায্য নিয়েছি কলকাতা, ঢাকা, বোম্বাই ও বিদেশে দূরদর্শনে আবৃত্তি করতে, আবৃত্তি তাতে আরও সার্থকতা পেয়েছে। এটা দর্শকদের মন্তব্য।

এখানেও প্রয়োজন, নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। জীবনানন্দের জীবন ও কবিতার ওপর সম্প্রতি একটি চলচ্চিত্রে জীবনানন্দের অনেক কবিতা-অংশ আবৃত্তি করেছি, প্রাকৃতিক দৃশ্য যেখানে আবৃত্তির পরিপূরক। লণ্ডনে দেখেছি প্রতিদিন মধ্যরাত্রে একটি দূরদর্শন কার্যক্রম শেষ হ'ত কবিতাপাঠ দিয়ে, অনুষঙ্গ কোনও চিত্রকরের শিল্পকর্ম।

আবোল তাবোলের কবিতা আবৃত্তির সময় সত্যজিৎ রায়ের পরামর্শে প্রায় গানের মতই স্বরলিপি করে যন্ত্রানুষঙ্গ রচনার চেষ্টা করেছি দিলীপ রায়ের পরিচালনায়। নৃত্যের সঙ্গেও আবৃত্তি বা আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্য যাই বলি না—তার সার্থকতাও বহুবার প্রমাণিত। রবীন্দ্রনাথই তো এই সম্ভাবনার সূচনা করেছেন। কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রসদনে নেতাজীর জন্মদিনের এক অনুষ্ঠানে আমি পড়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের দেশনায়ক প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ। তার সঙ্গে নৃত্যালেখ্য রচনা করেছিলেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সংযুক্তা পাণিগ্রাহী।

এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সার্থকতা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু তা অপ্রয়োজনীয় বলে এক কথায় বাতিল করার পক্ষে আমি নই। আমার কাজে নানাভাবে বার বার এ কথাটাই বলতে চেয়েছি। গ্রহণ না করি বর্জন করতে কতক্ষণ। শিল্প-সাধনায় তো শেষ কথা বলে কিছু নেই—এতো পরম্পরা, প্রবহমানতা, আর শিল্পী-সময়ের সঙ্গী। সে কালোত্তীর্ণ পরবর্তী ইতিহাসের বিচারে। নিজেকে অতিক্রম করে তার বাঁচা। আমি তো জানি প্রকাশধর্মী বিভিন্ন শিল্পের কোনোখানে আছে কোনো মিল। নয়ত কেন রবিশংকর, বিলায়েৎ, নিখিলের সেতারে, আলি আকবর, আমজাদের সরোদের ঝালায়, মীড়ে, গমকে, মূর্ছনায় আমি পাই মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতার অনুরণন—অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়ের ছবিতে দেখি জীবনানন্দকে! প্রয়াত বিশিষ্ট শিল্পী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার প্রতিবেশী। কথায় কথায় তিনিও আমাকে বলেছিলেন আবৃত্তির সঙ্গে এই বাজনারও কি একটা মিল পাচ্ছ না? বিখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী তো বার বার নজরুলের বিদ্রোহী আর কামালপাশা শুনতে চাইতেন ভাস্কর্যের সঙ্গে মিল অনুভব করে। আমার একটি রেকর্ডে জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সুর-সংযোজনায় সম্মত হয়েছিলেন। আমার সে স্বপ্ন সফল হয়নি বাণিজ্যিক কোম্পানীর শেষ মুহূর্তের অসহযোগিতায় তাই তার বিস্তারিত পরিকল্পনা এখানে বলতে চাই না। এ স্বপ্ন হয়ত এ জীবনে নানা কারণে আর কখনও বাস্তবায়িত হবে না। কিন্তু আমার অন্তরের নিভৃতে ব্যর্থতার ব্যথাক্ষরণের মধ্যেও প্রতিনিয়ত নতুন এক শিল্পসমন্বয় ও সম্ভাবনার জন্মকে স্বাগত জানাই।

প্রশ্ন ১০. স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্প হিসেবে আবৃত্তিচর্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে বলার যোগ্যতা আমার নেই। আমার নিজস্ব পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ ভেবে নয়, বর্তমানেই। একজন নিষ্ঠাবান আবৃত্তিপ্রেমী হিসেবে চটুল তাৎক্ষণিক বিনোদনের মোহ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাই। আমার কাজ আমাকে প্রেরণা দেবে, উদ্বুদ্ধ করবে—দেবে আনন্দ, আবৃত্তিকার পরিচয়কে প্রামাণ্য করবে। মাঝেমধ্যে ভ্রান্তি হয় যদি বা, কিন্তু তা সঠিক পথে ফিরে আসার অন্তরায় নয়। নিজের ওপর এ বিশ্বাস নিয়েই কাজ করতে চাই। এতে বর্তমানে নগদপ্রাপ্তিতে কিঞ্চিৎ ঘাটতি হলেও ভবিষ্যতে হয়ত বঞ্চিত হবো না। আমি এখনও বিশ্বাস করি অগভীর চটকদার কিছু সাময়িক সাফল্য পেতে পারে, হয়ত জনপ্রিয়তাও। শেষ পর্যন্ত কিন্তু শিল্পের চিরায়ত আবেদনের কাছেই ফিরে আসতে হয়, যা অবলম্বন হয় জীবনের। শিল্পের সেই অঙ্গনেই আমার প্রার্থিত জীবনযাপন।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরামর্শ?—তা দেবার আমি কে? আর দিলেও অন্যে কেন তা মানবে? আমার যা বলবার তা আমার কাছে না নিহিত হ'লে তা তো নিষ্কারণ হবে। তবু বলি—আবৃত্তিশিল্পকে যদি সত্যি আমরা ভালবাসি, মর্যাদার আসনে বসাতে চাই, তবে লক্ষ্য স্থির রেখে সনিষ্ঠ ব্রতী হতে হবে। মাঝে মাঝে নিছক বিনোদনের তাগিদে সামান্য বিচ্যুতিকে মেনে নিলেও শিল্পের বৃহত্তর সত্য যে আনন্দের সন্ধানে, তাকে আবিষ্কার করতে হবে। আরও গভীরতর জীবনধর্মী যথার্থ কবিতার কাছে যেতে হবে আমাদের যেখানে সম্ভব করতে হবে দৈনন্দিন টানা-পোড়েনের মধ্যেও শিল্পী ও শ্রোতার নিত্য নিবিড় সাক্ষাৎকার।

॥ চার ॥

(১) আবৃত্তি একটি স্বতন্ত্র প্রয়োগশিল্প বলে মনে করি। কবির ভাবনা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, আবৃত্তিকার কবির সেই অনুভবকে শ্রোতার মাঝে পৌঁছে দেবার গুরুভারটি বহন করেন। কবির মনের সমস্ত অনুভূতি আবৃত্তিকার কণ্ঠে ধারণ ক'রে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের আর কবির মধ্যে সেতুবন্ধের সৃষ্টি করেন। তাই দেশে ভাল কবির সৃষ্টি যেমন হচ্ছে, তেমনি স্বতন্ত্র এই আবৃত্তিশিল্পমাধ্যমের প্রয়োজন। আরো চর্চা এবং ফলশ্রুতিতে আরো ভালো আবৃত্তিকারের।

(২) সাহিত্যকর্মকে পরিপূর্ণ শিল্পবোধ, আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার সাথে শ্রোতা-

দর্শকদের কাছে স্বরযন্ত্রের মাধ্যমে হৃদয়গ্রাহ্য করে দেবার প্রক্রিয়াকে আবৃত্তি বলা হয়। এক্ষেত্রে কবিতা বা সাহিত্য বিষয় অন্তর্ভূক্ত হ'তে পারে। শব্দ ক'রে গল্প পড়াকে পাঠ বলে এবং উচ্চারিত সাহিত্যই আবৃত্তি।

(৩) বাংলাদেশে তেমন কোন স্কুল নেই। যা আছে ব্যক্তি-উদ্যোগে এবং সেখানে প্রশিক্ষণশেষে সনদপত্র দেওয়া হয় তবে professional দিক থেকে তেমন কার্যকরী নয়। সরকারী প্রচেষ্টায় এটাকে আরো উন্নত করা যায়।

(৪) আবৃত্তিকার দর্শক এবং লেখকদের মাঝখানে একটি মধ্যবর্তী চরিত্র হিসাবে উপস্থিত করে।

(৫) তেমন উল্লেখযোগ্য বই নেই। তবে আবৃত্তি বিষয়ক সংকলন ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হলো।

(৬) আঞ্চলিক উপভাষায় আবৃত্তি না করাই ভালো। এতে করে আবৃত্তি ভালো শোনায় না। সঠিক সুস্পষ্ট উচ্চারণ-জ্ঞান ও সচেতনার অভাবে অ—ওএ—অ্যা, র ড় ঢ় ট ঠ বর্গ চন্দ্রবিন্দু ও মহাপ্রাণ বর্ণের বেশ সমস্যা হয়। সৌন্দর্যও ম্লান হয়।

(৭) এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে।

(৮) শ্রুতি-নাটকে যা হচ্ছে তাকে সাধারণ নাট্যপাঠ বলা যায়। আবৃত্তিকারদের এ ব্যাপারে সচেষ্ট হবার প্রয়োজন।

(৯) রুচি প্রকৃতির সাথে যন্ত্রসঙ্গীত আলোকসম্পাত ও দৃশ্যসজ্জায় আরো জীবন্ত রূপ সৃষ্টি করতে পারে।

(১০) এই ক'বছরে দেশে আবৃত্তির যে প্রসার এবং প্রকাশ দেখতে পাই তা সত্যি সুখপ্রদ এবং নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

দর্শনীর বিনিময়ে আবৃত্তির অনেক সার্থক অনুষ্ঠান দেশের সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাজারে আবৃত্তির ক্যাসেট সমাদৃত হচ্ছে। সম্প্রতি দেশে আবৃত্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। সেই সাথে চলছে আবৃত্তির প্রশিক্ষণ এবং চর্চা যার ফলে আবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আবৃত্তির সাথে নাচ হচ্ছে, আবৃত্তির সাথে গান হচ্ছে। অতঃপর ভবিষ্যৎ দিক অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বলা যায়।

আবদুস সবুর খান চৌধুরী
কবিতালাপগোষ্ঠী
খুলনা

॥ পাঁচ ॥

পঞ্চাশ দশকের আবৃত্তিচর্চা

আল মাহমুদ

সম্প্রতি বাংলাদেশের আবৃত্তিকলা কাব্যরসপিপাসুদের মর্মস্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে আধুনিক কবিতার উদ্ভবকাল পঞ্চাশ দশক। পঞ্চাশ দশক থেকেই নাটকীয় আবৃত্তি আধুনিক কবিতার উপমা উৎপেক্ষা ও শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্যকে বিদগ্ধ শ্রোতাদের কাছে আস্বাদনযোগ্য করতে সক্ষম হয়। যদিও এর কিছুকাল পূর্ব থেকেই অর্থাৎ বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলেই বাংলা কবিতার শ্রাব্য রূপটি তিরিশের কোনো কোনো কবি—যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে'র কণ্ঠে ব্যাপকতা লাভ করে। তিরিশের এই তিনজনই অপূর্ব কণ্ঠ-সুষমা ও উচ্চারণ-বৈচিত্র্যের অধিকারী ছিলেন। এঁদের আবৃত্তি শোনার ভাগ্য যাঁদের ঘটেছে তাঁরাই স্বীকার করবেন, এঁদের কবিতার অর্থবহতা যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও সমকালীনতায় সতেজ ছিল তা এঁদের উচ্চারণ-ক্ষমতাকেও বাড়িয়ে দিয়ে আবৃত্তিকলায় এক নতুনত্বের সূচনা করে।

শ্রোতাদের ভয় ছিল তিরিশের সবচেয়ে পঠিত কবি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত নির্জনবাস এবং পংক্তি বুননের অন্তর্নিহিত অনুপ্রাস-গুঞ্জন যদি তাঁর নিজের আবৃত্তিতে ঠিকমত ব্যক্ত না হয় তবে কবির ওপর যে অবিচার হবে সে কথা ভেবে তৎকালীন আধুনিক বাংলা-কাব্যের শ্রোতামাত্রই সন্ত্রস্ত থাকতেন। কিন্তু একবার একটি দুর্লভ সমাবেশে জীবনানন্দ তাঁর সম্বন্ধে এ ধারণা একেবারে উল্টে দেন।

সম্ভবত পঞ্চাশ দশকেরই ঘটনা। এখন ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। কলকাতার সিনেট হলে স্বরচিত কাব্যপাঠের আসরে উৎকণ্ঠিত শ্রোতৃবৃন্দ মাইকের সামনে তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে তাকিয়ে আছে। তখন তাঁর চিত্ররূপময় কবিতার অত্যন্ত উপযোগী উচ্চারণে তিনি কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। শিহরণ আর হাততালিতে সারা হল আনন্দ প্রকাশ করলো। এমন নয় যে পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণের কোনো টান বা ত্রুটি তাঁর গলায় ছিল না। কিন্তু তবুও তাঁর পাঠ ছিল ছন্দের সম্পূর্ণ উপযোগী আবেগে ভরপুর। বিনা দ্বিধায় তিনি আবৃত্তিতে তাঁর নিজস্বতাকে ব্যক্ত করে জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে খাঁটি বাংলার উচ্চারণেরও একটা অপরিহার্য লাবণ্য আছে যা উপেক্ষা করলে আধুনিক বাংলা কবিতার শ্রবণমাধুর্যের ক্ষতিকেই মেনে নেওয়া হবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বাংলাদেশের আবৃত্তিকলা ও আবৃত্তিচর্চাকে বিচার করতে হবে। আমাদের অধিকাংশ উচ্চারণশিল্পী যাঁরা কবিতা আবৃত্তিকে সম্প্রতিকালে এক ধরনের মহিমা দিতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা উচ্চারণ ও শব্দের সন্ধিযোগের ব্যাপারে কলকাতামুখী। আকাশবাণীর উচ্চারণ পদ্ধতিকেই আদর্শ মেনে তাঁরা বাংলাদেশের কবিতা আবৃত্তিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে চান। সন্দেহ নেই কলকাতার আবৃত্তি-শিল্পীরা তুলনাহীন বাগবিভূতির অধিকারী। এবং বহুদিনের চর্চায় এই উচ্চারণ ও আবৃত্তি-ধারাটা পশ্চিমবঙ্গের শ্রোতাসাধারণকে প্রায় বশীভূত করে রেখেছে। এরই প্রভাব পড়েছে ঢাকার আবৃত্তিচর্চা ও কণ্ঠব্যায়ামের সকল ক্ষেত্রে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে কলকাতা বা আকাশবাণীর উচ্চারণ-পদ্ধতির অনুরাগী হলেও সম্প্রতিকালে ঘষে ঘষে নষ্ট হয়ে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠ-আবৃত্তির রেকর্ড শুনে অত্যন্ত দ্বিধার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি। এ যে আমার মত একজন বাংলাদেশের কবির কাছে অত্যন্ত অভাবনীয় ধ্বনি-সম্পর্ক বা আত্মীয়তার কথা ব্যক্ত করছে।

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে—

রবীন্দ্রনাথের এই আবৃত্তি নির্দ্বিধায় বলা যায় রাঢ়ীয় উচ্চারণ বা স্বরক্ষেপের ত্রিসীমার মধ্যেও প্রবেশ করেনি। এ হল এমন এক অনুচ্চ আবৃত্তিধারা যা বাংলা-দেশের ছোটো খাল-বিল ও পাখির গুঞ্জনধ্বনিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। হ্যাঁ, একটু মেয়েলীপনা বলবেন কেউ কেউ। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য উচ্চারণ কি সদাসর্বদা পুরুষকণ্ঠকেই দাবী করে? আহ্বান করে না কি কোন ক্ষীণ কণ্ঠের? কিংবা পুরুষকণ্ঠে কোনরূপ রমণীয় কলরবের?

আমি বলতে চাই বাংলাদেশের কবিতা আবৃত্তিতে একটা নিজস্বতাকে আমাদের যুক্ত করতে হবে। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় বাংলাদেশের কবিগণ যে ধরনের দেশজ উপমা উৎপ্রেক্ষাও বাগভঙ্গী প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গের কবিতা থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। এখানকার আবৃত্তিশিল্পীরা যদি উচ্চারণ ও স্বরক্ষেপের ব্যাপারে এই স্বাতন্ত্র্যকে স্মরণ রেখে আবৃত্তি করেন তবে আমাদের কবিতার উপযোগী পরিপূরক এক নতুন আবৃত্তিস্রোত শ্রোতাসাধারণকে অভিভূত করবে বলে আমি মনে করি।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমাদের দেশে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তিতে মৌলিক উচ্চারণভঙ্গীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন প্রথমত দু'জন কবি—কবি শাহাদাৎ হোসেন ও কবি ফররুখ আহমদ। শাহাদাৎ হোসেনের উচ্চারণ ও আবেগ নির্ঘোষ ছিল পুরোপুরি পশ্চিমবঙ্গীয়। তবে আকাশবাণীর উচ্চারণ বর্তমানে যে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, যেমন —'দেখো' শব্দটি য-ফলা যুক্ত করে 'দ্যাখো' বলার কায়দাটি শাহাদাৎ হোসেনরা

জানতেন না। তাঁর কবিতাও বর্তমান আবৃত্তিধারার উপযোগী ছিল না। তার সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তিগুলো—

বনবিটপীর ঘন বীথিকায়
এলায়েছে বেণী সন্ধ্যা—

তার নিজস্ব আবৃত্তিচর্চার খুবই উপযোগী ছিল। আমরা এখনও সেই কণ্ঠস্বরের কাছে অনুগত হয়ে আছি।

কবিদের মধ্যে আবৃত্তিচর্চার ব্যাপারে এর পরেই কবি ফররুখ আহমদের কৃতিত্বের কথা আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। স্মরণ করি সেই শঙ্খনাদ যা সমুদ্র কল্লোলের মত বেজে উঠত আমাদের কৈশোরে।

ফররুখ আহমদ মূলতঃ আধুনিক রোমান্টিক কবিদেরই সগোত্র ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র। শেলী, কীটস্, বায়রণ ছাড়াও তার অব্যবহিত যুদ্ধোত্তর ইংরাজী কবিগণ ছিলেন ফররুখের কবিতার বিষয়। কলকাতায় কলেজে অধ্যয়নকালে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসুর মত কবিকে। এভাবেই কবি হিসেবে ফররুখের আধুনিক কবির মানসগঠন প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। সম্ভবত সে কারণেই কবিতা আবৃত্তির বেলায় এঁরা অনুসরণ করতেন ইংরেজী আবৃত্তিকলার অতি আধুনিক কায়দাকানুন। গলার মধ্যে যেন লবণাক্ত বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস এসে আছড়ে পড়ত।

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী ?
এখনও তোমার আসমান ভরা মেঘে
সেতারা হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে
তুমি মাস্তলে
আমি দাঁড় টানি ভুলে
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি—

বায়ান্নর ভাষা বিদ্রোহের পর আধুনিক বাংলা কবিতার আবৃত্তিচর্চার ধারাটি আস্তে আস্তে কবিদের হাত থেকে চলে যায় নাট্যশিল্পী ও গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরের অধিকারী কয়েকজন আবৃত্তিকারের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উচ্চারণভঙ্গীর কাছে। এর মানে এ নয় যে পঞ্চাশ দশকের কবি শামসুর রহমান, শহীদ কাদরী বা আরও কেউ কেউ স্বরচিত কবিতার আবৃত্তিতে কম পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। বরং এখনো কোনো কোনো অনুষ্ঠানে এদের আবৃত্তিমহিমাই শ্রোতাদের কাছে বেশী গ্রাহ্য। কারণ একজন কবি যেমন কণ্ঠস্বরেরই অধিকারীই হোন শব্দপ্রক্ষেপের ধারণাটি তাঁর নিজের কবিতা আবৃত্তিতে খানিকটা লাবণ্য মেশাতে পারবেই। কোন্ শব্দটির ওপর আবৃত্তিকালে কতটা জোর দেওয়া দরকার তা তিনি একজন পেশাদার নাট্যশিল্পী বা আবৃত্তিকারের

চেয়ে বেশী হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন। কারণ কবিতাটি তাঁর নিজেরই রচনা এবং চিত্রকল্পগুলো বুননের সাথে জড়িত আছে কবির নিজেরই নানারূপ স্মৃতির ধারাবাহিক চলচ্চিত্র। হয়তো একটি কবিতা আবৃত্তিতে একজন আবৃত্তিশিল্পী একবারও আবেগের কাছে বশীভূত না হয়ে শুধু কণ্ঠমাধুর্যের দ্বারা শ্রোতাদের মধ্যে আবেগ জাগিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু কবির পক্ষে নিজের কবিতা আবৃত্তিকালে আবেগাকুল না হয়ে উপায় নেই।

পঞ্চাশ দশকে আমাদের আবৃত্তিকলায় নিজের অসাধারণ কণ্ঠস্বর, উচ্চারণভঙ্গী ও নাদ-প্রতিভা নিয়ে প্রবেশ করেন অভিনেতা ফতেহ লোহানী। এর আগে পূর্ব-বাংলার রেডিও শ্রোতারা এমন সুন্দর ভরাট গলার আওয়াজের সাথে পরিচিতই ছিলেন না। তিনি যখন চল্লিশের আধুনিক কবি আহসান হাবিব, ফররুখ আহমদ ও এদেরই সমসাময়িক কবিদের কবিতা উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি শুরু করেন ঠিক তখন থেকেই এদেশে সমকালীন কবিদের রচনার শ্রাব্যগুণ শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তখন ফতেহ লোহানীর পাশাপাশি কাফি খান, মজিবুর রহমান খান ও ইকবাল বাহার চৌধুরীর গলা এসে আবৃত্তিচর্চার কেন্দ্র ঢাকা রেডিওকে অভিভূত করে রাখে।

এদের সমসাময়িক হলেও আরও দু'জন অভিনেতা নিজেদের কণ্ঠগরিমা, শারীরিক সৌন্দর্য ও নাটকীয় উচ্চারণপদ্ধতি প্রয়োগ করে কবিতা আবৃত্তিকে অবলীলায় নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসেন। এরা হলেন গোলাম মোস্তফা ও সৈয়দ হাসান ইমাম।

গোলাম মোস্তফার বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর আবৃত্তিকালে অনায়াসে শ্রোতাসাধারণ বুঝতে পারেন রচনাটির সাথে আবৃত্তিকারের অন্তরাত্মা ও কণ্ঠস্বর যুগ্মভাবে কোরাস ধরেছে। মূলকথা হল, গোলাম মোস্তফা শুধু অভিনয়-গুণ আছে বলেই যে আবৃত্তিচর্চায় এসেছেন তা নয়। আধুনিক কবিতার একজন রসজ্ঞ পাঠক হিসেবেই তিনি আবৃত্তিশিল্পে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

সৈয়দ হাসান ইমাম মূলত নিচুস্বরের অত্যন্ত অর্থবহ আবৃত্তিকার। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ তিনি স্পষ্ট রাখতে চান, যাতে কাব্যের গূঢ়ার্থটি শ্রোতার বুদ্ধিবৃত্তিতে সরাসরি স্পর্শ করতে পারে। অবশ্য আধুনিক কবিতার অতি সম্প্রতিকালে রচয়িতাগণ তাঁকে খুব বেশী সুবিধা দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। কারণ অতি সাম্প্রতিক কাব্যধারার মেজাজের সাথে সৈয়দ হাসান ইমামের হার্দ্য বিনয়ী কণ্ঠস্বরের সংগতিপূর্ণ সৌহার্দ্য ঘটবে না। তাঁর গলায় তিরিশের কবিদের কবিতাই ফুটবে ভালো। যদিও গোলাম মোস্তফা ও সৈয়দ হাসান ইমাম উভয়েই রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আবৃত্তিকার।

মোটামুটি এই হল আমাদের সমকালীন আবৃত্তিকারদের একটি রেখাচিত্র ও স্টাইলের যৎসামান্য বর্ণনা। মূলত পঞ্চাশ দশকেই এইসব আবৃত্তিকার বাংলা কবিতা যে অন্তরালে অসাধারণ শ্রবণগুণসম্পন্ন তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এদেশে আধুনিক বাংলা কবিতা যা ঢাকাকে কেন্দ্র করে নতুন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হতে ব্যাকুল তা ঐ সব আবৃত্তিকারের কাছে খানিকটা ঋণ স্বীকার না করে পারবে না। বাংলাদেশে আধুনিক বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার জন্য এঁদের অবদানকে স্মরণ রাখার এবং স্মরণীয় করে তোলার একটা দায়িত্ব আশা করি এই দেশের কবিরাও অস্বীকার করতে পারবেন না।

॥ ছয় ॥

প্রসঙ্গ : কথা

আমিনুর রহমান টুটুল

শিল্প ও শিল্পচর্চা সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিচিত্র এক মাধ্যম। প্রত্যেক মানুষের মাঝে শিল্পিত মন সততই লুক্কায়িত অবস্থায় বিরাজমান। তবে এর কমবেশী অবশ্যই রয়েছে। অনেক আগে মানুষ যখন শুধু মৌলিকত্ব-আশ্রিত ছিল তখনও কিন্তু শিল্প এবং শিল্পচর্চা দুই-ই ছিল। তবে তার প্রকাশভঙ্গি ছিল ভিন্ন। সময়ের বিবর্তনে শিল্প তার আপন গতিতেই চলেছে কিংবা কখনও গতির পরিবর্তন করেছে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে সাথে শিল্পও আমাদের সামনে নতুন আঙ্গিকে এসেছে। আগে যা শিল্প বলে অস্বীকার করা হয়েছে আজ তা শিল্পরূপেই প্রকাশমান। প্রাচীনকালে যখন লেখবার পদ্ধতি আমাদের অজানা ছিল তখন কবিরা কাব্য রচনা করতেন মুখে মুখে এবং সে রচনা যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে ফিরতো আবৃত্তির মাধ্যমে। মানুষ মনের সূক্ষ্ম আবেগের বিশালতা এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের অনেকটুকুই তখন আবৃত্তি ধারণ করে ছিল। এখন আবৃত্তি শিল্প কিনা এ বিষয়ে আলোচনা করার সময় এসেছে।

বাংলাদেশে আবৃত্তিকে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সত্তর দশক থেকে শুরু হলেও আশির দশকে এর চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। 'কথা' আবৃত্তিচর্চা কেন্দ্রের জন্ম সেই সূত্রেই। পঁচাশির জুলাইএ প্রখ্যাত আবৃত্তিকার ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহ্বায়ক করে 'কথা'র প্রথম পদযাত্রা। এরপর নানা চড়াই উৎরাই পার হয়ে আজকের এই অবস্থান। আবৃত্তিচর্চা এবং তৎসঙ্গে আবৃত্তি সংশ্লিষ্ট নানা দিকগুলো সবার কাছে গ্রহণীয় করাই 'কথা'র মূল লক্ষ্য। মূলতঃ দল গঠনের উদ্দেশ্যে পঁচাশির সেপ্টেম্বরে ৪৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়ে 'কথা' প্রথম আবৃত্তি কর্মশালা শুরু করে। পরে তাদের থেকে ১৭ জনকে নিয়ে পরিপূর্ণ দল গঠন করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের টি. এস. সি-তেই সংগঠনের প্রাথমিক কার্যালয় নির্বাচন করা হয়। 'কথা'র সদস্যদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের জন্য চলতে থাকে নিয়মিত অনুশীলন এবং সেই সঙ্গে আবৃত্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পঁচাশির ১৬ই ডিসেম্বর শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে 'কথা' প্রথম নিবেদন করে স্বাধীনতাভিত্তিক কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান "সোচ্চার শব্দাবলী"। এরপর থেকেই কথা নিয়মিতভাবে নিজস্ব অনুষ্ঠান ছাড়াও আমন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে আবৃত্তি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করছে। ছিয়াশির ফেব্রুয়ারী মাসে 'কথা' বেশ কিছু অনুষ্ঠান উপস্থাপন করে—খামার বাড়ী, জাতীয় প্রেসক্লাব,

আবৃত্তিফেডারেশনের অনুষ্ঠান, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অনুষ্ঠান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের অনুষ্ঠান এগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং প্রায় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই সফল অনুষ্ঠান। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ নিয়ে ছবি ও সমালোচনা বের হয়। সাপ্তাহিক সন্ধানী লিখেছিল : "একটি নতুন দল হিসেবে 'কথা'র অনুষ্ঠান চমৎকার ও সঙ্গতিপূর্ণ"।

সুষ্ঠু আবৃত্তিচর্চার লক্ষ্যে 'কথা' আবৃত্তি ও বাচনরীতি উৎকর্ষের জন্য ২য় কর্মশালা আহ্বান করে। দু'মাসব্যাপী এ কর্মশালা শুরু হয় ছিয়াশির জুলাই মাসে। কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন নরেন বিশ্বাস, ওয়াহিদুল হক, গোলাম মোস্তফা, আশরাফুল আলম, আসাদুজ্জামান নূর, ও ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সেপ্টেম্বরে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন কবি শামসুর রাহমান। এ উপলক্ষে কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা ও 'কথা'র সদস্যরা দু'পর্বের অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন।

রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জুলাই '৮৬তে 'কথা' টি. এস. সি-র গেমস্‌রুমে রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান 'ঐক্যতান' পরিবেশন করে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের ছন্দবৃত্ত অনুষ্ঠানে (সেপ্টেম্বর) 'কথা' বৃন্দ-আবৃত্তি পরিবেশন করে। সেপ্টেম্বর ছিয়াশিতে জাতীয় সম্প্রচার একাডেমীতে 'কথা'র সদস্যরা Audio System-এর উপর একদিনের এক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

অক্টোবর ছিয়াশিতে টি. এস. সি-র সেমিনার রুমে 'কথা'র বিশেষ আবৃত্তি-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ মাসেই গঠিত হয় 'কথা'র প্রথম কার্যকরী পরিষদ। এগারো সদস্য বিশিষ্ট এই কার্যকরী পরিষদের সভাপতি হিসেবে ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক পদে এনামুল হক বাবুকে নির্বাচিত করা হয়।

'কথা'র আবৃত্তি বিষয়ক ৩য় কর্মশালা শুরু হয় অক্টোবর '৮৭তে। ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন নরেন বিশ্বাস, আশরাফুল আলম, আতাউর রহমান, তুষার দাস ও ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজয় দিবস '৮৬-তে 'কথা' শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে তাদের বহুল আলোচিত আবৃত্তি অনুষ্ঠান 'নোটনের জন্য শোক' উপস্থাপন করে। এ সম্পর্কে সাপ্তাহিক অর্থনীতিতে লেখা হয়েছিল : "কথা পরিবেশিত 'নোটনের জন্য শোক' কবিতাটির পরিবেশনায় ছিল নতুন ঢং যা দর্শক শ্রোতাদের ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছে।"

ডিসেম্বরে পি. জি. মিলনায়তনে লিও ক্লাবের অনুষ্ঠান ছাড়াও 'কথা' টি. এস. সি-র সড়ক দ্বীপে "মুখোমুখি দাঁড়াবার দিন" শীর্ষক আবৃত্তি অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস '৮৭তে 'কথা' কলাভবন প্রাঙ্গনে আবৃত্তি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করে।

সাতাশির ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মিনারে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের অনুষ্ঠানে এবং টি. এস. সি-র সড়ক দ্বীপে 'কথা' পরিবেশন করে "শেষবার চাই আজ মুক্তি" শীর্ষক আবৃত্তির অনুষ্ঠান।

মে '৮৭-তে 'কথা' তাদের ৪র্থ আবৃত্তি ও বাচন-উৎকর্ষ বিষয়ক দু'মাসব্যাপী কর্মশালা শুরু করেছে।

আবৃত্তি বিষয়ক এক সংকলন "কথা" আবৃত্তিচর্চা কেন্দ্রের একটি বিশেষ প্রকাশনা। আমরা সীমিত, আমাদের কর্মও তেমনি। তবু আমাদের কর্ম নিষিক্ত হয় ভালবাসা আর প্রত্যয় চেতনায়।

সবাইকে সহযাত্রী হওয়ার আমন্ত্রণ রইলো।

॥ সাত ॥

আবৃত্তি অঙ্গনের খবর

আবৃত্তি ফেডারেশন : বেশ কিছুদিন হলো বাংলাদেশের প্রায় ২০টি আবৃত্তি সংগঠন নিয়ে গঠিত হয়েছে আবৃত্তি ফেডারেশন। ফেডারেশনের সভাপতি ওয়াহিদুল হক ও সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী লাকী। ফেডারেশন নিয়মিতভাবে সম্মেলনের আয়োজন ছাড়াও বিভিন্ন দিবস উৎযাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গের নাট্যদল 'নান্দিকার' (রুদ্রপ্রসাদ সেন, স্বাতিলেখা) ও বিশিষ্ট আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষকেও সম্বর্ধনার আয়োজন করে।

স্বরিত : আবৃত্তি অঙ্গনে স্বরিত একটি বিশিষ্ট নাম। বেশ কিছুদিন থেকেই এ দল আবৃত্তিকে সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছে। আয়োজন করেছে আবৃত্তি কর্মশালার। উল্লেখযোগ্য আবৃত্তি পরিবেশনা : প্রসূনের জন্য প্রার্থনা, আমরা তামাটে জাতি, আমরা অনার্য আমরা দ্রাবিড় ইত্যাদি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল : প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ দলটি আবৃত্তিকে জনপ্রিয় করার জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা : বিস্ফোরণের বৃন্দগান, চণ্ডালিকা, একদিন সূর্যের ভোর ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক দলের আমন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গের 'লহরী' আবৃত্তি পরিবেশন করে।

স্বরশ্রুতি : আবৃত্তি অঙ্গনে পরিচিত আরেকটি নাম স্বরশ্রুতি। ৮৬ ও ৮৭তে এ দল দুটো আবৃত্তি উৎসবের আয়োজন করে। আবৃত্তি উৎসবে দেশের বিভিন্ন দল

ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের চন্দনীড়, আবৃত্তি আকাডেমী ও আবৃত্তিকার নিলাদ্রীশেখর বসু অংশগ্রহণ করেন।

কণ্ঠশীলন : আবৃত্তিকে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য এ দলটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ৯টি আবৃত্তি কর্মশালা শেষ করেছে। উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা : রথের রশি, লোক ছড়া আবৃত্তি ইত্যাদি।

মুক্তকণ্ঠ আবৃত্তি একাডেমী : আবৃত্তি অঙ্গনে আরেকটি নাম মুক্তকণ্ঠ। ইতিমধ্যে ৪টি আবৃত্তি কর্মশালা শেষ করেছে। পরিবেশন করেছে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান : জল পড়ে পাতা নড়ে, বিক্ষুব্ধ শব্দাবলী, হৃদয়পানে হৃদয়টানে, ইত্যাদি।

ঢাকায় এ দলগুলো ছাড়া আরো বেশ কিছু দল আবৃত্তিকে জনপ্রিয় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকার বাইরেও কিছু দল এতে সক্রিয়, যেমন রাজশাহীর 'স্বনন', রংপুরের 'হিরণ্ময়', সিলেটের 'কথাকলি', কক্সবাজারের 'শব্দায়ন' ইত্যাদি।

আবৃত্তিকার সংঘ : বাংলা নববর্ষ ১৩৯৪-এর শুরুতেই গঠিত হয়েছে বিশিষ্ট আবৃত্তিকারদের সমন্বয়ে আবৃত্তিকার সংঘ। সংঘের সভাপতি হাসান ইমাম ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম। ইতিমধ্যে সংঘ 'প্রথম দিনের সূর্য', 'আমি তোমাদেরই লোক', 'অফিঁয়াসের বাঁশরী' শীর্ষক আবৃত্তি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেছে।

আবৃত্তির ক্যাসেট : ৮৭-র ফেব্রুয়ারীতে ঢাকায় আবৃত্তির ক্যাসেটের সমাগম সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ও মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, কামরুল হাসান মঞ্জু ও শিমুল মুস্তাফার ক্যাসেট এগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইতিপূর্বে কামাল লোহানী, ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শফি কামাল, কাজী আরিফের ক্যাসেট সহ বেশ কয়েকটি ক্যাসেট বেরিয়েছিল।

জাতীয় কবিতা উৎসবে : দু'দিনব্যাপী জাতীয় কবিতা উৎসবে আবৃত্তি একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল। চর্যাপদ থেকে আধুনিক বাংলা কাব্য এই উৎসবে পাঠ করা হয়। উৎসবে প্রায় ৩০ জন আবৃত্তিকার অংশগ্রহণ করেন।

টেলিভিশনে আবৃত্তি চর্চা (ছন্দবৃত্ত) : বাংলাদেশ টেলিভিশনে তিন প্রান্তিক ধরে প্রচারিত হয় আবৃত্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান ছন্দবৃত্ত। আবৃত্তিকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে এ অনুষ্ঠান একটি সফল কার্যক্রম। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন আবৃত্তি সংগঠনের পরিবেশনায় ছন্দ আবৃত্তি।

●

॥ নির্ঘণ্ট ॥

[এক : লেখক । ব্যক্তি নাম-- বর্ণানুক্রমিক]

নির্ঘণ্ট—২

[গ্রন্থ । রচনা । শিরোনাম—বর্ণানুক্রমিক]

INDEX

1 : Name of authors / persons—alphabetically

INDEX II

2 : Names of Books / articles– alphabetically

অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা

ডক্টর অশোক মিত্র

(প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী : পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

সমাজসংস্থা আশানিরাশা ২৫·০০

ডক্টর অশোক মিত্র/মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মালিনী ভট্টাচার্য

কলকাতা প্রতিদিন ৩০·০০

উপন্যাস

বাণভট্ট/প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

কাদম্বরী ৩৫·০০

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রোফী ১৫·০০

রঙ্গ-ব্যঙ্গ

অরুণোদয় ভট্টাচার্য ও দিগম্বর দাশগুপ্ত

পরিবেশিত

মজারু মজলিশ-কথা ৩৫·০০

গল্প-সংগ্রহ

ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিক ঘটকের গল্প ৩০·০০

আবুল বাশার

মাটি ছেড়ে যায় ২৫·০০

ডি. এইচ. লরেন্স/বাণী বসু

ডি. এইচ. লরেন্সের সেরা গল্প ৩৫·০০

গী দ্য মপাসাঁ/অরুণকুমার চক্রবর্তী ও গীতা গুহ রায় ৩৫·০০

মপাসাঁর সেরা প্রেমের গল্প

আন্তন চেখভ/অসিত সরকার